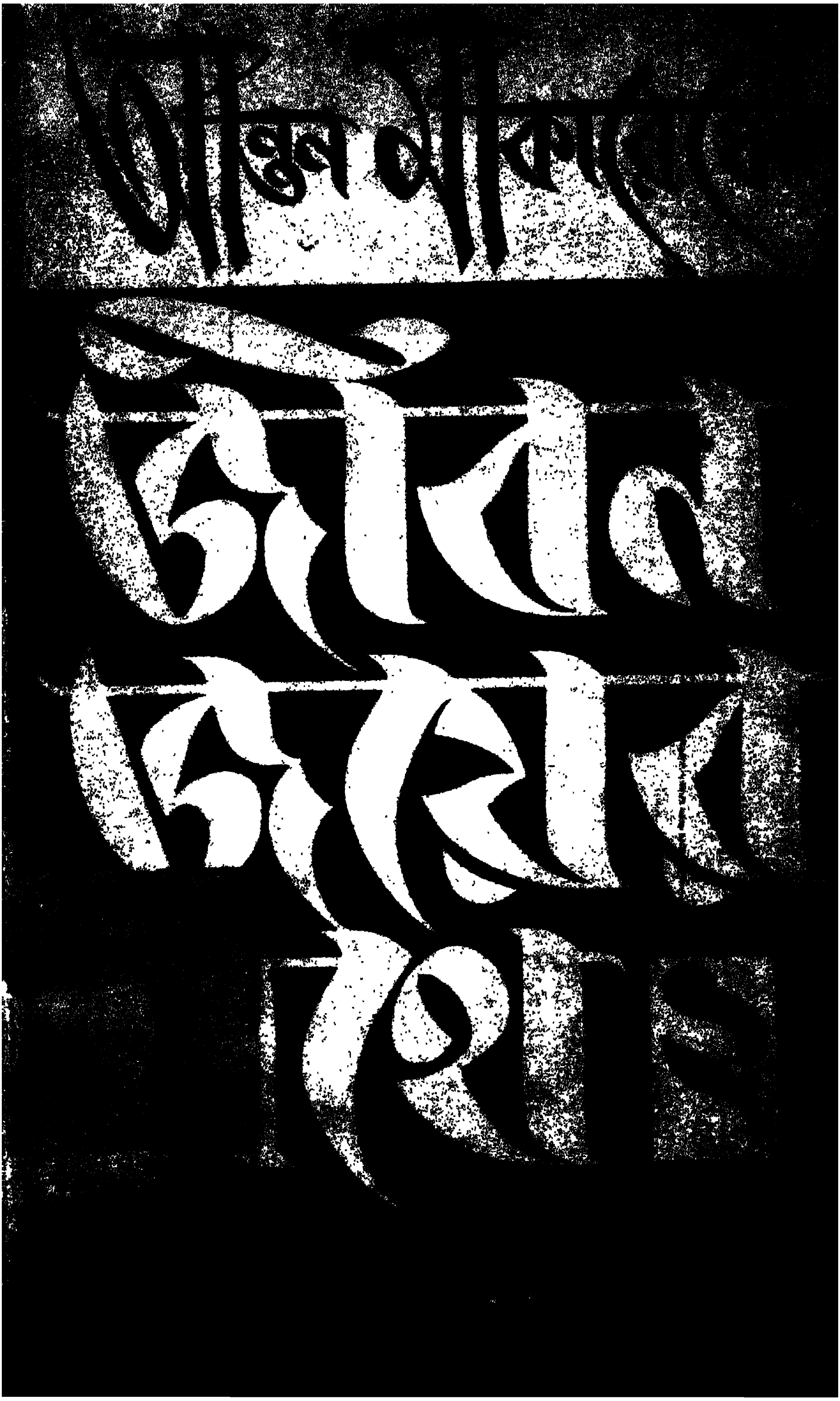


আন্তন মাকারেঙ্কো

জীবনজয়ের পথ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

А. С. Макаренко

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Книга вторая

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

М $\frac{70302-468}{014(01)-77}$ 682—77

সূচি

জীবনজয়ের পথে

দ্বিতীয় খণ্ড

জীবনজয়ের পথে

দ্বিতীয় খণ্ড

১

একপাত্র দুধ

এক চমৎকার গরমির দিনে বাস উঠিয়ে নতুন কলোনিতে চলে এলুম আমরা। গাছে-গাছে পাতার ফ্যাকাশে রঙ্ধরা শুরু হয় নি তখনও, ঘাস তখনও সবুজ — হেমন্তের প্রথম দিনগুলির ছোঁয়া লেগে সতেজ হয়ে উঠে তারা যেন দ্বিতীয় ভরাযৌবনে অধিষ্ঠিত। গোটা নতুন কলোনিকেই তখন তিরিশ বছরের সুন্দরী যুবতীর মতো লাগছিল। তার নিজের রূপের জন্যে তো বটেই এমন কি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণেও রূপসী ঠেকছিল তাকে, আর নিজের মোহিনী মায়া সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যয়ের ফলে সুখী আর প্রশান্ত বলেও মনে হচ্ছিল। প্রায় চতুর্দিকেই কলমাক বাহুবেষ্টনে ঘিরে রেখেছিল কলোনিটাকে, কেবল একদিকে গন্চারোভ্কায় যাতায়াতের সরু একটা পথ ছিল মাত্র। আমাদের তালুকের অন্তর্গত বাগানের গাছগুলোর পাতায়-ভরা হাওয়া-ঝির্ঝির ঝাঁকড়া মাথার একাকার ছাতাটি কলমাকের ওপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঝুঁকে পড়েছিল। আর সেখানে, ছায়া-ঢাকা নদীর ধারে-ধারে, এমন অনেক রহস্যময় লুকনো বাঁক আর আস্তানা ছিল যেখানে ইচ্ছে করলে যে-কেউ মনের সুখে নিভৃতে স্নান সারতে, জলপরীদের সঙ্গলাভের স্বপ্ন দেখতে, মাছ ধরতে, কিংবা অন্ততপক্ষে সমব্যথার ব্যথীর সঙ্গে গোপনে দুটো সুখদুঃখের কথা বলতে পারত। কলোনির প্রধান দালানগুলো ছিল খাড়াই পাড়ের একদম মাথায়, আর নিত্যি নতুন মতলব ঠাওরানোয় দক্ষ, বেহায়া বাচ্চা

ছেলেগুলো তাদের অল্পস্বল্প পরনের জামাকাপড় জানলার তাকে খুলে রেখে জানলা থেকে সোজা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত।

নদীর পাড়ের একটা জায়গায় ঢালু জমিতে পুরনো ফলবাগানটা ছিল সারি-সারি থাককাটা। আর একেবারে শুরু থেকেই তার সবচেয়ে নিচের থাকটা দখল করে নিয়েছিলেন শেরে। জায়গাটা সর্বদা আলোহাওয়ায় ভরে থাকত আর তার নিচ দিয়ে বয়ে যেত কলমাক - বিশেষ করে মৎস্যকন্যার গতিবিধি লক্ষ্য করার, মাছধরার কিংবা কবিতা লেখার উপযোগী জায়গা হোক-বা না-হোক, কলমাক সেখানটায় বয়ে যেত গা-এলিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, ধীরস্থির গতিতে। কবিতার বদলে বাঁধাকপি আর কালো ক্যারাণ্টের ফলন হোত সেখানে খুবই। কলোনির সদস্যরা কড়াকড়িভাবে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিয়ে, কোদাল কিংবা নিড়ানির হাতিয়ার হাতে ওই জমিটায় যেত; কখনও-কখনও কিছু-কিছু ছেলে 'বাজপাখি' কিংবা 'ডাকাতনী'কে লাঙলে জুতে সঙ্গে করে নিয়ে বেশ কষ্ট করেই জায়গাটায় পেঁছত। ওইখানেই নদীর পাড়ে ছিল আমাদের জেটি বা জাহাজঘাটা। জেটি মানে, কলমাকের ঢেউয়ের ওপরে মাথা জাগিয়ে-থাকা, নদীর পাড় থেকে মিটার তিনেক লম্বা পাশাপাশি তিনখানা কাঠের তক্তা।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখা যেত, কলমাক মোড় নিয়ে ঘুরে গেছে পুবমুখো আর খাতির করে আমাদের কলোনির পায়ের কাছে ছেড়ে রেখে গেছে কয়েক হেক্টর ঘন ঘাসে-ভরা মাঠ আর ইতস্তত-ছড়ানো শরবন আর ঝোপঝাড়। আমাদের নতুন ফলবাগান থেকে সোজা এই মাঠটায় নেমে যাওয়া যেত। অবসর পেলেই আমাদের মনে দারুণ প্রলোভন জাগত একছুটে গিয়ে ফলবাগানের কিনার ঘেঁযে সারি-সারি দাঁড়ানো পপ্লারের ছায়ায় এই সবুজ ঘাসে-ছাওয়া ঢালু জমিটায় বসতে, আর একবার চোখ মেলে চারপাশের মাঠ, বন, মাথার ওপরের আকাশ আর দিগন্তের গায়ে খোদাই-করা ছায়া-ছায়া গনচারোভ্কা গাঁ-টাকে দেখতে। জায়গাটা কালিনা ইভানভিচের ভারি প্রিয় ছিল, কখনও-কখনও রবিবারের দুপুরবেলায় আমাকেও সে ধরে নিয়ে যেত ওখানে।

ওখানে বসে কালিনা ইভানভিচের সঙ্গে চাষীদের ব্যাপার-স্যাপার ও আমাদের যতসব মেরামতির কাজ, জীবনের অন্যায় অবিচার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করতে ভালো লাগত। আমাদের সামনে গা এলিয়ে শুয়ে

থাকত মাঠটা, আর এই ঘটনাটা কখনও-কখনও কালিনা ইভানভিচকে তার উচ্চমার্গের দার্শনিক সুভাষিতাবলীর গোলকধাঁধা থেকেও পথভ্রষ্ট করে দিত। যেমন:

'বোঝলা, ইয়ার, আমাগো এই জেবনটা হইল গিয়া মাইয়ালোকের মতন — অগো কারো কাছ থেইক্যাই ন্যায়বিচার আশা করবার পার না। সোন্দর একজোড়া মোচ লইয়া কেউ আসলেই হইল, সে যত ইচ্ছা মাংসের আর সব্জির বড়া, পনির-পিঠা আর এক-পাত্তর ভোদ্‌কা খাইতে পাইব, আর যদি এমন কেউ আসে যার মোচ গজান দূরে থাকুক দাড়ি পর্যন্ত গজায় নাই তাইলে মাগী তারে এমন কি একঢোক জল পর্যন্ত দিব না। আমি যখন ফৌজের ঘোড়সওয়ার ছেলাম... অরে, অ কুত্তির বাচ্চা, তর মাথাটা কোথায় রাইখ্যা আইছস? মুন্ডটা কি খাইয়া বইছস, না বাসায় কুলুপ দিয়ে রাইখ্যা আইছস? অরে অ পরগাছার মরণ, দ্যাখ্ দেখি ঘোড়াটারে লইয়া আইছস কোথায়! অ মরণ, জানস না ওখেনে বান্ধাকফির চারা বোনা হইছে!'

কালিনা ইভানভিচ কথাগুলো শেষ করেছিল সেদিন আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গিয়ে, পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, তামাকের পাইপটা সজোরে নাড়তে-নাড়তে।

অথচ তখন আমাদের কাছ থেকে তিন শো মিটারখানেক দূরে লম্বা ঘাসের মধ্যে একটা বাদামিরঙের ঘোড়ার পাছার দিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র, কিন্তু কোনো 'কুত্তির বাচ্চা'র পাত্তা ছিল না ধারেকাছে। তবে কালিনা ইভানভিচ জানত কার উদ্দেশ্যে সে অমন মধুর বাক্যবাণ বর্ষণ করছিল। আসলে মাঠটা ছিল ব্রাৎচেঙ্কোর এক্তিয়ারে, আর সব সময়েই সে থাকত ওখানে, অদৃশ্যভাবে। কালিনা ইভানভিচের বক্তৃতাটা ছিল তাই একধরনের ভোজবাজির মন্ত্রোচ্চারণের মতো। আরও বার দুই-তিন ওইভাবে কালিনা ইভানভিচের সংক্ষিপ্ত মন্ত্রোচ্চারণের পর ভোজবাজির সেই আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ং ব্রাৎচেঙ্কোর আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন – তবে ঘোড়াটার কাছাকাছি কোথাও নয়, ফলবাগান থেকে বেরিয়ে একেবারে আমাদের পেছনটাতেই।

'কী যা-তা বকতিছেন কালিনা ইভানভিচ? বলি, কনে বাঁধাকপির খ্যাত আর কনে ঘোড়া চরতিছে খেয়াল আছে কিছু?'

অতঃপর এক জটিল বিশেষজ্ঞসুলভ তর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল সেদিন যা থেকে এমন কি আমার মতো অ-বিশেষজ্ঞের কাছেও এটা স্পষ্ট হয়ে

উঠেছিল যে কালিনা ইভানভিচের ধ্যানধারণা ছিল সম্পূর্ণ সাবেক কালের, কলোনির ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার খবরাখবরের সঙ্গে সে আর তাল রেখে চলতে পারছিল না, এবং বাঁধাকপির চারা বোনার জন্যে কোথায় যে জমি পরিষ্কার করা হয়েছিল আসলে সে তা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল।

আসলে কালিনা ইভানভিচকে ছেলেরা এ-সমস্ত ব্যাপার থেকে রেহাই দিয়ে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে দিয়েছিল। এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারের তদারকির ভার পুরোপুরি চলে গিয়েছিল শেরের হাতে। কালিনা ইভানভিচ কেবল খুঁটিনাটি ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি-রকমের সমালোচনার ঝোঁকে কখনও-সখনও কৃষি-ব্যবস্থার এই দুর্ভেদ্য বর্মের ফাঁকফোকর দিয়ে নিজের বুড়োটে নাকটা গলাতে চেষ্টা করত। আর ঠাণ্ডা মাথায়, ভদ্রভাবে ও তামাশার ছলে সেই নাকে কী ভাবে চিমটি কাটতে হয় শেরের তা জানা ছিল ভালো। ফলে সর্বদাই কালিনা ইভানভিচ পালাতে পথ পেত না।

আমাদের সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অবশ্য কালিনা ইভানভিচ ক্রমশ বেশি-বেশি এমন একটা অবস্থানে পেঁছিচ্ছিল, যার তুলনা চলত সেই রাজার সঙ্গে যিনি রাজ্যের অধিপতি হলেও প্রত্যক্ষ শাসনকর্তা নন। আমরা সকলেই তার অর্থনৈতিক রাজ-মহিমা মেনে নিয়েছিলুম এবং সসম্মানে তার আপ্তবাক্যগুলো হজম করতুম, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন উচিত বিবেচনা করতুম চলতুম তেমনভাবেই। কালিনা ইভানভিচ কিন্তু এতে দোষ পর্যন্ত নিত না, কারণ যতই যাই হোক সে মোটেই স্পর্শকাতর লোক ছিল না। তাছাড়া, আসলে তার মাথাব্যথা ছিল আর কিছুতে নয় কেবল দার্শনিক বুকনি আওড়ানো নিয়েই।

দরকার পড়লে একমাত্র গাড়ি হাঁকিয়ে শহরে যাওয়া ছিল কালিনা ইভানভিচের কাজ। এটা দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে এই সময়ে ওই যাত্রার তোড়জোড়ের সঙ্গে কিছুটা আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর জড়িয়ে গিয়েছিল। চিরকালই কালিনা ইভানভিচ ছিল সাবেকী জাঁকজমকের পক্ষপাতী, ছেলেরাও তার নিচের কথাগুলির সঙ্গে ভালোরকম পরিচিত ছিল। ছড়া কেটে সে বলত:

'বাবুর দলে হাঁকায় জুড়ি — উপাসী রয় ঘোড়া, আর গরিবলোকের নধর ঘোড়া, গাড়ির কপাল-পোড়া।'

ছেলেরা তাই মড়া-বওয়া গাড়ির মতো দেখতে আমাদের পুরনো গাড়িখানার মেঝেয় নতুন খড় বিছিয়ে তার ওপর হাতে-বোনা একখানা পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে দিত, তারপর সবচেয়ে মজবুত ঘোড়াটাকে গাড়িতে জুতে রুচিসম্মত প্রথায় গাড়িখানা হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করত কালিনা ইভানভিচের ঘরের সামনে গাড়িবারান্দার নিচে। ইতিমধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক বিভাগের সকল কর্মী ও কর্তৃপক্ষস্থানীয় তাদের করণীয় কাজকর্ম সেরে রাখত। আমাদের সরবরাহ-দপ্তরের সহকারী ম্যানেজার দেনিস কুদ্‌লাতির পকেটে থাকত শহরে গিয়ে কী কী করতে হবে সেই সব কাজের একটা ফর্দ। ভাঁড়ারী আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ প্রয়োজনীয় যতসব বাক্স, টব, দড়ির পাকানো গোল্লা ও বাঁধাছাঁদার জন্যে দরকারি অন্যান্য জিনিস চালান করে দিত গাড়ির মেঝেয় খড়ের নিচে। কালিনা ইভানভিচ গাড়িখানাকে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড় করিয়ে রাখত তিন থেকে চার মিনিট। অতঃপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসত সে ভালোরকম ইস্তিরি-করা পরিষ্কার একটা বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে, আর আগে থেকে তামাক-ঠাসা পাইপটাতে আগুন ধরিয়ে ঘোড়া আর গাড়িখানার দিকে দ্রুত এক-নজর তাকিয়ে নিত। কখন-ও-বা মাতব্বরি চালে দাঁত চেপে হিস্‌হিসিয়ে বলত:

'কতবার তোমাগো কই নাই অমন একখান বদখত টুপি পইর‍্যা শহরে না-যাইতে! আচ্ছা বুদ্ধুগো পাল্লায় পড়ছি দ্যাখতাছি!..'

আর দেনিস যতক্ষণে কোনো এক বন্ধুর সঙ্গে মাথার টুপি বদল করে নিত ততক্ষণে কালিনা ইভানভিচ গাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনে উঠে বসে হুকুম দিত:

'রওনা হও দেখি, তাইলে!'

শহরে পেঁছে কালিনা ইভানভিচ বেশির ভাগ সময়টাই কাটাত খাদ্য-সরবরাহ দপ্তরের কোনো-না-কোনো বড়কর্তার অফিসে। মাথা উঁচু রেখে সেখানে সে প্রয়াস পেত গোর্কি কলোনি নামে এক স্বকল্পিত প্রবলপ্রতাপ, ধনী প্রতিষ্ঠানের মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে। আর সর্বদাই এই লক্ষ্য সামনে থাকায় তার কথাবার্তা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকত উঁচুদরের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে।

যেমন সে জোরগলায় বলত, 'মুজিকরা যা চায় তাই পায়। আমি আপনেরে বলত্যাছি, কথাটা সত্য।'

ধার-করা টুপি-মাথায় দেনিস কুদ্‌লাতি ইতিমধ্যে ওই দপ্তরেরই নিচের

তলার অর্থনৈতিক মহাসাগরে সাঁতার আর ঝাঁপ খাওয়ার কসরতে মেতে থাকত, ফরমায়েশের ফর্দ তৈরি করত, ম্যানেজার আর কেরানিদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া চালিয়ে যেত, তারপর কালিনা ইভানভিচের বসার জায়গাটুকু বাদ দিয়ে গোটা গাড়িখানাই বোঝাই করে ফেলত নানারকম বস্তায় আর থলেতে। এরপর ঘোড়াটাকে দানাপানি দেয়া শেষ করে আপাদমস্তক ময়দা আর কাঠের গুঁড়ো মেখে ভুত সেজে বেলা ঠিক তিনটের সময় গিয়ে ঢুকত অফিস-ঘরখানায়। হাঁক পাড়ত :

'ফেরার সময় হয়ে৷ গ্যাছে, কালিনা ইভানভিচ!'

সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক হাসিতে ভরে উঠত কালিনা ইভানভিচের মুখ। ডিরেক্টরের সঙ্গে করমর্দন সেরে ব্যস্তসমস্তভাবে দেনিসকে শুধোত সে:

'সবকিছু ঠিক-ঠিক গাড়িতে বোঝাই করছ তো?'

কলোনিতে ফিরে আসার পর পরিশ্রান্ত কালিনা ইভানভিচ যেত বিশ্রাম করতে, আর দুপুরের ঠাণ্ডা খাবার কোনোরকমে গলাধঃকরণ করে দেনিস বয়স্কা স্ত্রীলোকের মতো সব ব্যাপারে খুঁতখুঁত করতে-করতে কলোনির অর্থনৈতিক বিভাগের এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াত।

জিনিসের অপচয় ঘটতে দেখলে কুদ্‌লাতি যেন শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করত। গাড়ি থেকে খড়ের আঁটি মাটিতে ছড়িয়ে পড়লে, কেউ দরজার একটা তালা হারালে, গোয়ালের কোনো দরজার কপাট একটা কব্জায় ভর দিয়ে ঝুলে থাকলে সত্যিই কষ্ট হোত তার। যদিও সে হাসত কম, তবু কখনও তাকে রাগারাগি করতেও দেখা যেত না। তার গলার স্বরে অপরকে রাজি করানোর মতো এমন একটা জোরের আর চাপা ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি ঘটত যে অর্থনৈতিক বিচারে মূল্যবান কোনো বস্তুর অপচয় ঘটাত যে-ব্যক্তি তাকে নাছোড়বান্দাভাবে কোণঠাসা করে ফেলত সে। অথচ ওর ওই ভাবটাকে নিছক অনুনাসিক ঘ্যানঘ্যানানি বলা চলত না। যে-সব অসাবধান বাচ্চা অজ্ঞতাবশত মনে করত যে গাছে চড়াটা মানুষের শক্তিক্ষয়ের সবচেয়ে যুক্তিসম্মত পন্থা, তাদের কী করে বাগ মানাতে হয় তা জানত সে। চোখের একটিমাত্র ইঙ্গিতেই দেনিস তাদের গাছ থেকে নেমে আসতে বাধ্য করত। তারপর বলত :

'তুই কি মাথা খাটায়ো চিন্তা করিস, না, না? পেরায় তো বিয়ার বয়স হয়ো গেল দেখি, আর তুই কিনা উইলোগাছের মগডালে চাপ্যো বস্যো আছিস আর

ট্রাউজার্সটার দফারফা করতেছিস। আয় দেখি আমার সাথে, তরে অপর একজোড়া ট্রাউজার্স দেব-নে।'

ভয় পেয়ে গিয়ে বাচ্চাটি তখন হয়তো জিজ্ঞাসা করত:

'আবার কিসির ট্রাউজার্স?'

'গাছে চড়ার কামিজ-পাতলুন আর-কি। নতুন ট্রাউজার্স পরে গাছে উঠতি কে কারে কোনকালে দেখেছে? তুই কারেও দেখিছিস নাকি, ক' দেখি?'

মিতব্যয়িতার মনোভাবে গভীরভাবে আচ্ছন্ন ছিল দেনিস, তাই মানবিক দুর্বলতায় সাড়া জাগত না তার মনে। নতুন ট্রাউজার্স পরতে পেয়ে তারই আনন্দে বিভোর হয়ে বাচ্চা ছেলে যে গাছের মগডালে চেপে বসতে পারে — মানবিক মনস্তত্ত্বের এই সহজ সরল প্রকাশটাই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। ট্রাউজার্স আর গাছ ছিল অন্যদের কাছে কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত, অথচ দেনিসের কাছে ওরা ছিল সম্পূর্ণ অসমঞ্জস দুটো পদার্থ।

কুদ্‌লাতির হিসেব করে চলার এই কঠোর নীতি অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, কেননা আমাদের দারিদ্র্যের কারণে তীব্রতম মিতব্যয়িতার চর্চা ছাড়া অন্য পথ ছিল না। এ-কারণে দলপতি-পরিষদ বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই কুদ্‌লাতিকে সহকারী সরবরাহ ম্যানেজারের পদে মনোনীত করত। ট্রাউজার্স-সম্পর্কিত ব্যাপারে 'অন্যায়'ভাবে শাস্তিদানের প্রসঙ্গ তুলে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ছেলেরা যখন অ-পুরুষোচিত নালিশ জানাত পরিষদ তখনও তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করত। কারাবানভ, বেলুখিন, ভের্‌শ্‌নেভ, বুরুন ও অন্যান্য পুরনো ঝানু ছেলেরা কাজের ব্যাপারে কুদ্‌লাতির এই উৎসাহ-উদ্দীপনাকে অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করত। বসন্তকালে একটি সাধারণ সভায় কুদ্‌লাতি যখন এইমর্মে হুকুম জারি করল যে 'আসচে কালই গুদামঘরে বুটজুতোগুলি ফিরত দিতি লাগবে, গরমির দিনি আমরা দিব্যি খালি পায়ে চলাফেরা করতি পারি', তখন পুরনো কলোনি-বাসিন্দারাও টুঁ-শব্দটি না করে সেই হুকুম মেনে নিল।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসটায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করল দেনিস। যে-সমস্ত দালান ততদিনে পুরোপুরি মেরামত করা গিয়েছিল কলোনির দশটি বাহিনীর ছেলেদের তাতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। পুরনো ইমারত — আমরা যার নাম দিয়েছিলুম 'শ্বেত প্রাসাদ' — তাতে ছিল এজমালি শোবার ঘর ও ক্লাসরুমগুলো, আর তার মধ্যেকার বড় হলঘরটায় ছিল ছুতোরশাল। হলটাকে

আমরা বারান্দা হিসেবে ব্যবহার করতুম। খাবার ঘরটাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল দ্বিতীয় বাড়িখানার মাটির নিচের ঘরে। এই দ্বিতীয় বাড়িতেই ছিল কলোনির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের থাকার জায়গা। খাবার ঘরে একসঙ্গে তিরিশ জনের বেশি লোকের বসার জায়গা ছিল না. তাই তিন দফায় আমাদের খাওয়ার কাজ সারতে হোত। জুতো মেরামতির. গাড়ির চাকা তৈরির ও দর্জির কারখানাগুলোকে এমন সব কোণে-কোণে কোনোরকমে ঠেসে দেয়া হল যে-সব জায়গা দেখতে একেবারেই কারখানা-ঘরের মতো ছিল না। কলোনিতে তখন কি ছাত্রছাত্রী কি শিক্ষক-শিক্ষিকা কারোই বসবাসের মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল না। কেবল ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাব্য স্থায়ী স্মারক হিসেবে মাথা জাগিয়ে ছিল নতুন ফলবাগানের মধ্যে উনিশ শতকী ফরাসি সম্রাটদের আমলের রীতিমাফিক তৈরি দোতলা একখানা বাড়ি। প্রকাণ্ড উঁচু-উঁচু ঘর, জমকালো কারুকার্যওয়ালা প্লাস্টার-করা ঘরের ছাদ এবং ফলবাগানের ওপর ঝুঁকে-আসা চওড়া, খোলা বারান্দাসহ বাড়িখানা অনবরত আমাদের লোভানি দিত। বাড়িখানায় কেবল কাঠের মেঝে, জানলা-দরজা, কয়েকটা সিঁড়ি আর গোটা কয়েক ঘর গরম করার চুল্লী বানিয়ে নেয়ার যা-কিছু ওয়াস্তা ছিল, তাহলেই সেখানা এক শো কুড়ি জনের থাকার মতো চমৎকার কয়েকখানা এজমালি ঘরের সমষ্টি হয়ে উঠতে পারত, আর তাহলেই বাকি দালানগুলো শিক্ষাদান-সংক্রান্ত সবরকম কাজে ব্যবহারের জন্যে পাওয়া যেত। কিন্তু এ-কাজ করার জন্যে যে হাজার ছয়েক রুব্‌লের প্রয়োজন ছিল, আমাদের অভাব ছিল তারই। যা-কিছু আয় তখন হচ্ছিল কলোনির তার সবটুকুই আমাদের প্রাক্তন দারিদ্র্যের নাছোড়বান্দা অবশেষগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে খরচ হয়ে যাচ্ছিল। আর তা না করে উপায়ও ছিল না, কারণ দারিদ্র্যের সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া আমাদের সকলের পক্ষেই অসহনীয় হয়ে উঠত। প্রসঙ্গত বলা চলে যে এই রণাঙ্গনটিতে আমাদের প্রাণপণ লড়াইয়ের ফলে আগেকার সেই সব তুলোভরা কোট, ছেঁড়াখোঁড়া টুপি, ক্যাম্প-খাটিয়া, শেষ রমানভ-রাজবংশের আমল থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া তুলোভরা লেপ আর জুতোর বদলে পায়ে জড়ানোর পট্টির যুগের অবসান ঘটেছিল। ইতিপূর্বেই চুলছাঁটার জন্যে একজন ক্ষৌরকার মাসে দু'বার করে আমাদের কলোনিতে আসতে শুরু করেছিল, এবং যদিও সে ক্লিপ দিয়ে মাথা মুড়িয়ে দেয়ার জন্যে মাথাপিছু দশ কোপেক ও

রীতিমতো চুলকাটার জন্যে বিশ কোপেক করে দাম নিচ্ছিল তবু নানা কায়দায় চুলছাঁটার বিলাসিতাটুকু উপভোগ করার মতো সামর্থ্য আমাদের হয়েছিল। এটা সত্যি যে তখনও পর্যন্ত আমাদের আসবাবপত্র রঙ করার মতো সামর্থ্য হয় নি, তখনও আমরা কাঠের তৈরি স্যুপের চামচ ব্যবহার করছিলুম এবং আমাদের অন্তর্বাসগুলোয় তাপ্পি মেরে চালাতে হচ্ছিল, তবু এ-সবের কারণ ছিল এই যে কলোনির আয়ের বেশির ভাগটাই আমরা কারখানাগুলোর সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ধরনের স্থায়ী মূলধনে পরিণত করে নিচ্ছিলুম।

কিন্তু প্রয়োজনীয় ছ' হাজার রুব্‌ল আমাদের হাতে ছিল না, আর তা পাবারও কোনো সম্ভাবনা দেখছিলুম না। টাকার ওই অংকটার কথা অবশ্য অনবরতই উঠছিল — সাধারণ সভাগুলোয়, দলপতি-পরিষদের বৈঠকে, কম্‌সমোল-সদস্যদের বক্তৃতায়, কিংবা নিতান্তই দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বড় ছেলেদের কথাবার্তায় আর বাচ্চাদের কূজনে-গুঞ্জনে। আর প্রতিবারই টাকার অংকটাকে বিরাটত্বের বিচারে যোগাড় করার পক্ষে নেহাতই অসম্ভব একটা বস্তু বলে মনে করা হচ্ছিল।

ওই সময়ে গোর্কি কলোনি ছিল শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের কর্তৃত্বের অধীন। সম্ভাব্য খরচের হিসেব পেশ করা হলে সে-অনুযায়ী কলোনি কমিশারিয়েতের কাছ থেকে অল্প-অল্প থোকে ভরতুকি সাহায্যও পেত। এই সব সরকারি ভরতুকির পরিমাণ অনুমান করা যাবে এই ঘটনাটি থেকে যে কলোনি-বাসিন্দাদের জামাকাপড় কেনা বাবদ বছরে বরাদ্দ ছিল মাথাপিছু আটাশ রুব্‌ল। কালিনা ইভানভিচ তো টাকা বরাদ্দের এই পরিমাণ দেখে খেপেই গিয়েছিল। বলেছিল:

'এতটা ট্যাকা বরাদ্দ করে যে সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি কে? যদি একবার তার সোনার চাঁদ-বদনখান দ্যাখতে পাইতাম তো দ্যাখতাম কেমন ধারা সে-বস্তুটা! তিন-তিন কুড়িটা বৎসর কাটাইয়া দেলাম, বোঝলা কিনা, কিন্তু রক্তমাংসে-গড়া এমন বস্তুটা তো আগে দেখি নাই কখনও। যত্তো সব রক্তশোষা পরগাছার দল!'

আমিও কখনও এমনধারা মানুষের সন্ধান পাই নি, যদিও প্রায়ই আমাকে শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতে গিয়ে ঢুঁ মারতে হোত। আসলে এই সংখ্যাগুলো কোনো জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল না, এগুলো পাওয়া

গিয়েছিল সারা দেশের সকল নিরাশ্রয় ও পথভ্রষ্ট বাচ্চার জন্যে বরাদ্দ মোট টাকাকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার ফল হিসেবে।

অতএব, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না-থাকায়, ত্রেপ্‌কে তালুকের সেই উনিশ শতকী ফরাসি সাম্রাজ্যের আমলের রীতিমাফিক তৈরি দালানখানাকে (আমরা যার নাম দিয়েছিলুম 'লাল বাড়ি') যেন কোনো এক আসন্ন বলনাচের আসর বানানোর জন্যে ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করে রাখা হচ্ছিল, অথচ সেই নাচের অনুষ্ঠানের তারিখটাই পিছিয়ে যাচ্ছিল অনির্দিষ্টভাবে। এমন কি প্রথম দলের নাচিয়েদের -- বা, ছুতোরমিস্ত্রিদের - পর্যন্ত আমন্ত্রণ করা হচ্ছিল না।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও কলোনি-বাসিন্দারা কিন্তু মোটেই মনখারাপ করে ছিল না। কারাবানভ অবশ্য এই শেষোক্ত ব্যাপারটার কারণ নির্দেশ করে বলেছিল যে শয়তানের অলৌকিক শক্তিতে আমাদের বিশ্বাসই নাকি এর মূল:

'শয়তানই আমাদিগে এই ঝামেলার হাত থেক্যে উদ্ধার করবে-নে, দেখিস! আমাদের বরাতটা সব্বদাই ভালো আমরা ডাইনি-পালা ছেল্যাপিলা কিনা... দেখবি, যদি শয়তান নিজি না করে তো অন্য কোনো ভূত-পেরেত, দৈত্য-দানা আমাদের সাহায্য করবে-নে -- ধর্ কোনো ডাইনি বা আর কেউ... আমার কোনোমতেই পেত্যয় যাতিছে না যে এই দালানডা চেরডা কাল আমাদের চক্ষুশূল হয়্যে থাকবে!'

তাই টেলিগ্রাম মারফত যখন আমরা খবর পেলুম যে ৬ অক্টোবর তারিখে ইউক্রেনের শিশু-সহায়তা কমিটির একজন পরিদর্শক শ্রীমতী বোকভা কলোনিতে আসছেন এবং খার্‌কভের ট্রেন থেকে তাঁকে নামিয়ে কলোনিতে নিয়ে আসার জন্যে স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে হবে তখন কলোনির মান্যগণ্য বাসিন্দাদের কাছে খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠেকল। অনেকেই এই মত প্রকাশ করল যে এবার লাল বাড়ি মেরামতের ব্যাপারে অবিলম্বে হাত দেয়া সম্ভব হবে।

'বুড়ি মেয়্যাছেলাটি আমাদের জন্যি ছয় হাজার রুব্‌ল যোগাড় করি দিতি পারে...'

'মেয়্যাছেলাডা যে বুড়ি তা বোঝলে ক্যামনে?'

'আরে, শিশু-সহায়তা কমিটির লোক সব্বদাই বুড়ি মেয়্যাছেলা হয়।'

কালিনা ইভানভিচ কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করতে ছাড়ল না। বলল:

'দেখবা, শিশু-সহায়তা কমিটি থেইক্যা এক পাইপয়সাও পাবা না। আমি খুব ভালো কইর‍্যাই জানি সেকথা। বরং মাইয়ালোকটি আইস্যা জিগাবে আরও তিনটা পোলারে আমরা লইতে পারি কিনা। আর, তাছাড়া, বোঝলা কিনা, মাইয়ালোক সব্বদাই মাইয়ালোক — ও সব তত্ত্বকথায় মাইয়ালোকেরে সমান অধিকার দেয়া চলে, কিন্তু বাস্তবে...'

অক্টোবরের পাঁচ তারিখে আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কোর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় দু-ঘোড়ার জুড়ি ফিটনগাড়িখানাকে ধোয়ামোছা করা হল, 'লালু' আর 'মেরি'র ঘাড়ের কেশরে বাঁধা হল বিনুনি। রাজধানী থেকে কলোনিতে অতিথির আগমন কালেভদ্রে ঘটত, তাই গভীর সম্ভ্রম নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার বাসনা জাগত আন্তনের। ৬ অক্টোবর তারিখ সকালবেলা আমি নিজে স্টেশনে গেলুম, আর সঙ্গে গেল ব্রাত্‌চেঙ্কো স্বয়ং, কোচোয়ানের আসনে আসীন হয়ে।

স্টেশন-প্রাঙ্গণে পৌঁছে আন্তন আর আমি গাড়িতে বসেই স্টেশন থেকে যে-সমস্ত বৃদ্ধা বেরিয়ে আসছিলেন তাঁদের দিকে সতর্ক নজর রাখলুম। আমরা লক্ষ্য করছিলুম তাঁদের মধ্যে কাউকে জনশিক্ষা-দপ্তরের কর্মচারি বলে মনে হয় কিনা। এমন সময়ে হঠাৎ এমন একজন এসে আমাদের কাছে এমন একটা বিষয়ের খোঁজ করলেন যাঁকে একেবারেই আমাদের 'লাইন'-এর লোক বলে মনে হল না। তিনি জানতে চাইলেন:

'গাড়িটা কোথা থেকে আসছে?'

'নিজিদের কাজে এয়েচি আমরা! ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি ওদিকে দ্যাখেন,' দাঁত চেপে একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দিল আন্তন।

'আপনারা তাহলে গোর্কি কলোনি থেকে আসছেন না?'

পা-দানি থেকে পা দুখানা তুলে নিজের মেরুদণ্ডকে ভিত্তি করে পুরোপুরি বৃত্তাকারে এবার শরীরটাকে ঘোরাল আন্তন। আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠলুম।

আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল এক ভারি তাজ্জব মূর্তি — তার পরনে ডোরাকাটা কাপড়ের হালকা ধূসর রঙের কোট, আর তার নিচে সিল্‌কের মোজায়-মোড়া একজোড়া পা। মুখখানা মসৃণ, গোলাপি, দুই গালে ভারি আশ্চর্য দুটি টোল। চোখ দুটি জ্বলজ্বলে, ভুরু দুটি চমৎকার

সুগঠিত। জালের মতো করে বোনা একখানা স্কার্ফের নিচে থেকে উঁকি দিচ্ছে ঝলমলে সোনালি গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল। মহিলাটির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মুটে, তার হাতে দুনিয়ার সবচেয়ে হালকা মালপত্র – একটা হাতবাক্স ও চমৎকার চামড়ায় তৈরি ভ্রমণসাথী একখানা ব্যাগ।

'আপনি কি কমরেড বোকভা?'

'দেখেছেন! আমি কিন্তু আসামাত্রই আন্দাজ করেছি যে আপনারা গোর্কি কলোনি থেকে আসছেন।'

এতক্ষণে আত্মস্থ হয়ে উঠে আন্তন নিজেকে সংহত করে নিল, তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ধীরেসুস্থে লাগামগাছ নিল গুছিয়ে। ওদিকে বোকভা হালকা লাফে গাড়িতে উঠে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে জমে-থাকা ট্রেন ও স্টেশনের গন্ধ দূর হয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা গন্ধে – মিষ্টি, তাজা একটা সৌরভে। এই অকল্পনীয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বিষম লজ্জা পেয়ে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সিটের এক কোণায় সরে বসলুম।

সারাটা পথ নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে অনর্গল কথা বলে গেলেন কমরেড বোকভা। তিনি নাকি গোর্কি কলোনি সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন আর তাই ব্যাপারটা সত্যি যে কী তা দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

'বুঝলেন, কমরেড মাকারেঙ্কো, এই সব ছেলেপিলে নিয়ে আমাদের যে কী ঝামেলায় — কী যে ঝামেলায় — পড়তে হয়েছে কী বলি। এদের কথা ভেবে আমার ভারি দুঃখ হয়, যে-কোনো ভাবে এদের উপকারে আসতে পারলে ভারি ভালো লাগে আমার। এটি বুঝি আপনার ছেলেদেরই একজন? ভারি মিষ্টি ছেলেটি তো! তা, আপনার এখানে একঘেয়ে লাগে না? আপনি তো জানেনই এই সব শিশু-সদন কী অসম্ভব ক্লান্তিকর! আপনাদের সম্পর্কে কত কথাই না কানে আসে আমাদের। তবে লোকে বলে আপনি নাকি আমাদের পছন্দ করেন না।'

'কাদের পছন্দ করি না?'

'আমাদের — মানে, সামাজিক শিক্ষা সমিতির মেয়েদের।'

'কথাটা ঠিক বুঝলুম না।'

'লোকে বলে আপনি নাকি আমাদের নাম দিয়েছেন -- মহিলাদের সামাজিক শিক্ষা সমিতি।'

বললুম, 'এটা তো আমার কাছেই নতুন খবর! জীবনে কখনও কাউকে

অমন নাম দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না... তবে... সত্যি বলতে কী, নামটা মন্দ নয়।'

কথাটা বলে প্রাণভরে হাসলুম। উপযুক্ত নামকরণে বোকভাও খুশি হলেন।

'বুঝলেন, কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে — সত্যিই, সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়ের ছড়াছড়ি। এদেরই মধ্যে একজন হলুম আমি। কিন্তু আমার কাছ থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞান নিয়ে আপনি কোনো আলোচনা শুনবেন না... কী, খুশি তো?'

কোচোয়ানের বাক্স থেকে আন্তন প্রায়ই পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল আর বড়-বড় চোখ মেলে গম্ভীরভাবে এই অভিনব আগন্তুকটিকে লক্ষ্য করছিল।

দেখে হেসে ফেললেন বোকভা। বললেন, 'ও আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছে! অমন করে তাকাচ্ছে কেন ছেলেটি, বলুন দেখি?'

আন্তন লাল হয়ে উঠল, আর ঘোড়া দুটোকে আরও জোরে চলার জন্যে তাগিদ দিতে গিয়ে গুজগুজ করে কী যেন বলল।

কলোনিতে গিয়ে পেঁছতে বাচ্চা বাসিন্দারা সবাই আর কালিনা ইভানভিচ আমাদের ঘিরে ধরল। দেখা গেল, সবাই দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সেমিওন কারাবানভ মাথা চুলকোতে লাগল, ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল অপ্রস্তুত বোধ করছে ও। এক চোখ কুঁচকে কেবল মৃদু হাসল জাদোরভ।

বোকভাকে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। ভদ্রতা দেখিয়ে ছেলেরা ওঁকে সঙ্গে করে কলোনি দেখাতে নিয়ে গেল। এদিকে আমার জামার হাতায় টান দিয়ে কালিনা ইভানভিচ জিজ্ঞাসা করল:

'ওনারে কী খাইতে দেওন যায়, কও দেখি?'

'ওনারা যে কী খাইয়া থাকেন হেয়া তো আমার জানা নাই,' ওর ভঙ্গি নকল করে জবাব দিলুম।

'আমার মনে লয় কী, ওনারে প্রেচুর দুধ খাইতে দেওন লাগব। না কী কও? অ্যাঁ?'

বললুম, 'না কালিনা ইভানভিচ, দুধের চেয়ে আরও একটু জমাট ঘনপদার্থ ওঁর খাওয়া দরকার।'

'তাইলে কী খাইতে দেই কও দেখি? একটা শুয়র জবাই করা লাগব বোধকরি? কিন্তু এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ তো শুয়র জবাই করতেই দিব না।'

আমাদের মাননীয়া অতিথির খাওয়াদাওয়ার তদারক করতে চলে গেল

২•

কালিনা ইভানভিচ, আর আমি ছুটলুম বোকভার সন্ধানে। দেখা গেল, ছেলেদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। শুনতে পেলুম তিনি বলছেন:

'আমাকে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না বলে ডেকো, কেমন?'

'মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না! বেশ নাম তো!.. তা, দেখেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না – এইটা হল্য গিয়ি আমাদের হট্‌হাউস। নিজির হাতে আমরা বানায়েছি এইটা। আমারে বহুত্‌ খোঁড়াখুঁড়ি করতি হয়্যেছে এখানডায়। দেখেন, হাতে এখনও কেমনধারা ফোস্কা পড়ি আছে।'

বলতে-বলতে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার মুখের সামনে কোদালের মতো মস্ত বড় একখানা হাত মেলে ধরল কারাবানভ।

'অর কথা পেত্যয় যাবেন না, মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না! নৌকা বায়্যে হাতে ও ফোস্কা ফেল্যেছে।'

সোনালি চুলে-ভরা সুন্দর মাথাটি রীতিমতো উৎসাহভরে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগলেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না। ততক্ষণে মাথা থেকে স্কার্ফটি তিনি খুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল, হট্‌হাউস কিংবা আমাদের অন্যান্য কীর্তিকলাপে তাঁর আগ্রহ ছিল যৎসামান্যই।

লাল বাড়িটিও যথাসময়ে দেখানো হল তাঁকে।

'এটার মেরামতি শেষ কর নি কেন?' জিজ্ঞাসা করলেন বোকভা।

'মেরামতি খরচ ছ' হাজার রুব্‌ল লাগবে,' জাদোরভ জবাব দিল।

'আর তোমাদের টাকা নেই, এই তো? আহা, বেচারা!'

'আপনের হেফাজতে আছে নাকি অত টাকা?' সেমিওন গর্জন করে উঠল যেন। 'তাইলে. তাইলে — ব্যাপারডা কী জানেন — আসেন এখেনে এই ঘাসের উপর বসা যাক!'

লাল বাড়ির ঠিক সামনে ঘাসের ওপর লীলায়িত ভঙ্গিতে বসে পড়লেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না। প্রাণবন্ত রঙরেখায় আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়ে গেল ছেলেরা, আর লাল বাড়িটাকে মেরামত করে নিতে পারলে ভবিষ্যৎ যে কীরকম জমকালো আকার ধারণ করবে বিবরণ দিল তারও।

'বোঝলেন, আমাদের কলোনি-সদস্যের সংখ্যা এখন আশি, আর এই বাড়িখান পায়্যে গেলে সদস্যের সংখ্যা বাড়ায়্যে এক শো বিশজনা করা চলব্যে। বোঝলেন কিছু?'

ফলবাগানের দিক থেকে এমন সময় এসে পড়ল কালিনা ইভানভিচ। আর তার পেছন-পেছন এল ওলিয়া ভোরনভা, সঙ্গে করে নিয়ে এল প্রকাণ্ড বড় একটা দুধের জগ, দুটো মাটির তৈরি মগ আর আস্ত আধখানা জইয়ের পাঁউরুটি। মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না উহু-উহু করে উঠলেন। বললেন:

'উহ্‌, কী সুন্দর! সবকিছুই এখানে কত সুন্দর! দাদু-দাদু দেখতে ওই বুড়ো মানুষটি কে বলুন তো? মৌমাছি-পালক নিশ্চয়ই, তাই না?'

'আইজ্ঞা না, আমি মৌমাছি পালি না,' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে কালিনা ইভানভিচ বললে। 'কোনোদিনই মৌমাছি-পালক ছেলাম না, তয় আপনেরে কইতে পারি এই দুধ মধুর থেইক্যাও মেষ্ট। এয়া কোনো ছেমরি গোয়ালিনীর কের্‌দানিতে হয় নাই, এয়া খোদ গোর্কি কলোনির কেরামতি। আপনে জেবনে কোনোদিন এমন দুধ আস্বাদ করেন নাই... এত শেতল, এত মেষ্ট।'

হাততালি দিয়ে উঠে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না এবার ঝুঁকে পড়লেন মগের ওপর, আর যেন কোনো পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছে এমনভাবে কালিনা ইভানভিচ তাতে দুধ ঢালতে লাগল। তাড়াতাড়ি এই মজার ঘটনাটা থেকে যতটা সম্ভব মুনাফা ওঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাদোরভ।

'আপনার তহবিলে ছ' হাজার রুব্‌ল বেকার পড়ে আছে, এদিকে আমরা বাড়ি মেরামত করতে পারছি না। এটা উচিত কাজ হচ্ছে না, বুঝলেন।'

ঠান্ডা দুধ খেয়ে হাঁপাতে লাগলেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না। তারপর আবেশভরে ফিস্‌ফিস করে বললেন:

'আহ্‌, কী দুধ! সত্যি, জীবনে কখনও... সত্যি, এ স্বর্গসুখ!..'

'আর সেই ছ' হাজার রুব্‌লের কী হবে?' বেহায়ার মতো ওঁর মুখের সামনে হাসতে-হাসতে জাদোরভ শুধোল।

চোখ পিটপিট করতে-করতে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না বললেন: 'উঃ, ছেলেটা কীরকম বস্তুবাদী দেখেছ! তা, তুমি তো ছ' হাজার রুব্‌ল চেয়ে খালাস, কিন্তু তার বদলে আমি পাবটা কী?'

হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল জাদোরভ। মনে হল, ছ' হাজার রুব্‌লের বিনিময়ে সে নিজের যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। কারাবানভ কিন্তু চিন্তা করে বৃথা সময় নষ্ট করল না। বলে বসল:

'আপনে যত চান তত অমনধারা স্বগ্গসুখ দিতি পারি আমরা।'

'স্বর্গসুখ? কোন্ স্বর্গসুখ?' একেবারে টকটকে লাল হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না।

'শেতল দুধ আর-কি।'

ঘাসের ওপর সোজা মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে হাসতে লাগলেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না, যতক্ষণ-না তাঁর চোখে জল এসে গেল।

চেঁচিয়ে বললেন, 'উঁহু, না-না, দুধ খাইয়ে আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না! আমি তোমাদের ছ'হাজার রুব্‌ল যোগাড় করে দেব বটে, তবে তার বদলে আমার কাছ থেকে চল্লিশটি বাচ্চাকে নিতে হবে তোমাদের!.. ভারি মিষ্টি সব বাচ্চা, কেবল আপাতত তারা অল্প একটু — বুঝলে কিনা — ঝুলকালি-মাখা, আর কিছু না...'

কলোনি-বাসিন্দারা এবার সত্যি-সত্যিই ভাবনায় পড়ল। কেবল ওলিয়া ভোরনভা হাতের দুধের জগটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোলাতে-দোলাতে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার চোখের গভীরে চাইল।

বলল, 'তাই-বা নয় ক্যানে? চল্লিশডা বাচ্চাই নিব আমরা।'

'ঠিক আছে। এখন কোথায় হাত-মুখ ধোব সেখানে নিয়ে চল দেখি। আমার ঘুমনো দরকার। ছ' হাজার রুব্‌লই তোমাদের যোগাড় করে দেব আমি।'

'আপনে তো আমাদের খ্যাতখামারগুলান দ্যাখেন নাই এখনও।'

'খেতখামারে আসচে কাল যাব, কেমন? ঠিক আছে?'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না আমাদের সঙ্গে তিনদিন কাটালেন। একেবারে প্রথম দিনই সন্ধে লাগাদ কলোনির অনেক সদস্যের নাম তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। ওই দিন অনেক রাত পর্যন্ত পুরনো ফলবাগানের একখানা বেঞ্চিতে বসে ছেলেদের সঙ্গে গল্প করলেন তিনি। ছেলেরা নৌকো বেয়ে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে গেল, প্রকাণ্ড বড় নাগরদোলাটায় চড়াল, দোলনায় বসিয়ে দোল খাওয়াল, কিন্তু আমাদের খেতখামার পরিদর্শন করার মতো সময় হল না তাঁর, এমন কি আমার সঙ্গে বসে চুক্তিপত্র সই করার মতো সময়টুকুও কোনোরকমে পেলেন। যাই হোক, এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল যে ইউক্রেনীয় শিশু-সহায়তা কমিটি লাল বাড়িটি মেরামতের জন্যে আমাদের ছ' হাজার রুব্‌ল দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে এবং তার বিনিময়ে উপরোক্ত মেরামতির কাজ শেষ হলে ইউক্রেনীয় শিশু-সহায়তা কমিটির কাছ থেকে আমরা চল্লিশ জন গৃহহীন অনাথ শিশুকে কলোনিতে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকছি।

কলোনি সম্পর্কে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার উৎসাহের অন্ত ছিল না।

বললেন, 'সত্যিই এটা স্বর্গ! আপনার এখানে আছে ভারি চমৎকার সব — কী বলা যায় ওদের?. '

'দেবশিশু?'

'না — দেবশিশু না! মানুষ!'

ফেরার সময়ে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নাকে স্টেশনে পেঁছিতে আমি আর গেলুম না। ব্রাত্‌চেঙ্কোও কোচবাক্সে গিয়ে বসল না, ঘোড়া দুটোর কেশরেও বিনুনি বাঁধা হল না। পরিবর্তে ব্রাত্‌চেঙ্কো যার হাতে জুড়িগাড়ির ভার দিল সেই কারাবানভ গিয়ে বসল কোচবাক্সে। কারাবানভের কালো চোখ দুটো জ্বলছিল, আর শয়তানি হাসিতে ফাটো-ফাটো হয়ে ছিল ও, মাঝে-মাঝে উঠোনটার এদিক-সেদিক তা ও ছড়িয়ে-ছিটিয়েও দিচ্ছিল।

চাপা গলায় একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আন্তন সেমিওর্নাভিচ, চুক্তি সই হয়োছে তো?'

জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'ঠিক আছে, তাইলে। এখন ওই সোন্দরীরে গাড়িচড়া কারে কয় তা একবার দেখাত্যে লাগবে!'

জাদোরভ মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার সঙ্গে করমর্দন করল।

বলল, 'গরমকালে আবার আসতে ভুলবেন না যেন। মনে আছে তো, আপনি কথা দিয়েছেন।'

'আসব, আসব! থাকার জন্যে এখানে একটা 'ডাচা'* ভাড়া করব তখন।'

'কেন, ডাচা কেন? আপনি আমাদের এখানেই আসতে পারেন...'

ঘুরে-ঘুরে চারিদিকে নিচু হয়ে অভিবাদন জানালেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না। আমাদের সকলের দিকেই সস্নেহ হাসি-হাসি চাউনি নিয়ে তাকালেন।

স্টেশন থেকে ঘুরে আসার পর ঘোড়ার সাজ খোলার সময়ে কারাবানভকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন ঠেকল। জাদোরভও দেখলুম কেমন উদ্বেগের ভাব নিয়ে ওর কথা শুনছে। আমি ওদের কাছে এগিয়ে গেলুম।

* ডাচা — শহরতলীতে বা গ্রামাঞ্চলে ছোট বাগান-বাড়ি। — অনুঃ

শ্নলুম কারাবানভ বলছে, 'ধল্যোছিলাম না. এক ডাইনি আমাদের সাহায্য করব্যে? তা, তাই হল্য দ্যাখতেছি শেষকালে।'

'কিন্তু মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না তো ডাইনি না!'

'আপনারা কি মনে করেন সব ডাইনিই ঝাঁটায় চেপে উড়ে আসে আর তাদের সক্কলের ঈগলের মতো বাঁকা নাক থাকে? মোটেই না! সত্যিকারের ডাইনিরা দেখতে স্নন্দর হয়. ব্ঝলেন!'

২

অত্চেনাশ

বোকভা আমাদের নিরাশ করেন নি . এক সপ্তাহের মধ্যে ছ'হাজার র্ব্লের একটা মনি-অর্ডার পেয়ে গেল্ম। আর নতুন নির্মাণকর্মের জ্বরের তাড়সে ছটফট করতে-করতে সারা কলোনি চষে বেড়াতে শ্র্ করল কালিনা ইভানভিচ। তারানেত্সের অধীন চতুর্থ বাহিনীর ওপর ফরমায়েশ দেয়া হল রোদজল না-খাওয়ানো কাঁচা কাঠ দিয়েই দরজা-জানলার ভালো কাঠামো বানানোর। কাজের চাপে তারাও হাঁসফাঁস করতে লাগল। কালিনা ইভানভিচ অনির্দেশ্য, অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে গালাগালি বর্ষণ করতে লাগল:

'মরার পর অবে য্যান কাচা কাঠের কফিনে ভইর‍্যা থোয়। পরগাছা কোথাকার!..'

ত্রেপ্কের ভগ্নস্ত্প নিয়ে আমাদের চার বছরের লড়াইয়ের শেষ অঙ্ক শ্র্ হল এইভাবে। কালিনা ইভানভিচ থেকে শ্র্ করে শ্র্কা জেভেলি পর্যন্ত আমাদের সকলকেই এই প্রবল ইচ্ছাটা পেয়ে বসল যে বাড়িটার মেরামতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে। যে লক্ষ্যপ্রণের স্বপ্ন দেখে আসছিল্ম আমরা এত কাল ধরে, অবিচলভাবে, আর কালক্ষেপ না করে দ্রত সেই লক্ষ্যে পেশছনো ছাড়া গতি ছিল না আমাদের। যত্রতত্র চুনের ভাটি, জট-পাকানো আগাছার বন, বাগানের মধ্যে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলার পথ, সারা উঠোন জ্ড়ে জঞ্জাল আর ইট-পাথরের স্ত্প সকলের চক্ষ্পীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল।

অথচ আমাদের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র আশি। আমাদের তালুকটা সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যে দলপতি-পরিষদের রবিবারের সভাগুলোয় অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেরের কাছ থেকে দুটো বা তিনটে মিশ্র বাহিনী মাত্র ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব হল। এতে দলপতিরা প্রায়ই শেরের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠত:

'কী আশ্চয্যি, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়্যে যাতিছে না? কোনো ব্যাপারে আমাদের কথার কোনো দাম নাই -- সবই আগি থেক্যে ধরাবাঁধা। এ কেমন কথা?'

জবাবে শেরে ধীরেসুস্থে তাঁর দোমড়ানো-মোচড়ানো নোটবইখানা বের করে ফেলতেন, তারপর শান্তভাবে কিন্তু বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ করতে লেগে যেতেন যে আসল ব্যাপারটা ঠিক এর উলটো, সবকিছুই বরং আগে থেকে অবহেলিত হয়ে আসছে। তাছাড়া পর্বতপ্রমাণ আরও নানা কাজ সামনে পড়ে আছে, আর উঠোনে কাজ করার জন্যে তিনি যে দুটো বাহিনীকে ছেড়ে দিয়েছেন তা নিছক কেবল এই জন্যেই যে তিনিও উঠোন পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি উপলব্ধি করেন। তা না করলে কখনও তিনি বাহিনী দুটোকে ছাড়তেন না, বরং তাদের বীজ বাছাই কিংবা অসময়ে ফল ফলানোর ঘরগুলোর মেরামতির কাজে লাগিয়ে দিতেন।

অসন্তুষ্টভাবে দলপতিরা এরপর আপনমনে বিড়বিড় করত। মনের মধ্যে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অনুভূতির স্থান সংকুলানে অসুবিধে বোধ করত তারা -- এর একটা হল শেরের অনমনীয় মনোভাবে তাদের রাগ, আর আরেকটা তাঁর দৃঢ়তায় তাদের সবিস্ময় মুগ্ধতা।

ওই সময়টায় শেরে তাঁর ছয়-ফসলি পর্যায়ক্রমিক চাষের ব্যবস্থা সংগঠিত করার কাজ সবেমাত্র সম্পূর্ণ করে তুলছিলেন। আর আমাদের চাষবাসের অবস্থা যে কতখানি উন্নত হয়ে উঠেছে তা যেন হঠাৎই সবার চোখে পড়ে গেল বলে মনে হল। কলোনি-বাসিন্দাদের কিছু-কিছু আগাগোড়াই চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, একে তারা ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবেই মেনে নিয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ছিল ওলিয়া ভোরনভা। কিন্তু কারাবানভ, ভোলখভ, বুরুন ও অসাদ্চি-র জমির প্রতি টানটা ছিল প্রায় বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক ধরনের। ব্যক্তিগত লাভালাভের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না-করে তারা খামারের কাজের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল; একবারও পেছন ফিরে না-তাকিয়ে, এই কাজের সঙ্গে তাদের নিজ-নিজ ভবিষ্যৎ কিংবা তাদের অন্যান্য শখ-সাধের

বিন্দুমাত্র সম্পর্ক গড়ে না-তুলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এতে। নিছক এই কাজে ডুবে বেঁচে থাকত তারা এবং জীবনকে উপভোগ করত। প্রতিটি দিনের তীব্র, কঠোর পরিশ্রমকে উপভোগ করত তারা এবং পরের দিনটা যেন ছুটির দিন এইভাবে তার প্রতীক্ষায় থাকত। ওই দিনগুলোর যে পরিণতি ঘটতে চলেছে নিত্যি নতুন ও চমকপ্রদ সব সাফল্যে এ-বিষয়ে তারা ছিল নিশ্চিত, কিন্তু এই সাফল্যগুলো যে কী তা নিয়ে তাদের বড় মাথাব্যথা ছিল না। ওরা সকলেই তৈরি হচ্ছিল 'রাব্‌ফাক'-এ ঢোকার জন্যে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ওদের কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না — কোন বিশেষ ধরনের 'রাব্‌ফাক'-এ যে তারা ঢুকতে চায় তা পর্যন্ত জানত না তারা।

এছাড়া কলোনিতে আরও কিছু ছেলে ছিল, যারা চাষবাসের কাজে অনুরক্ত হলেও এ-ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অপেক্ষাকৃত শাদামাটা বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত। এরা ছিল অপ্রিশ্‌কো ও ফেদরেঙ্কোর মতো ছেলেপিলে। আমাদের ইশ্‌কুলে লেখাপড়া শেখার কোনো ইচ্ছে ছিল না এদের এবং মোটের ওপর জীবনের কাছেই এদের বিশেষ কোনো দাবিদাওয়া ছিল না। খুশিমনে, শাদামাটাভাবে এরা মনে করত যে জমি চাষ করা, ভালোগোছের একখানা কুঁড়ে, একটা ঘোড়া আর একটি স্ত্রী যোগাড় করা, গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাঠে খাটা, শরতে তাদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলা ও নিরাপদে তা মজুত করা, শীতকালে চুপচাপ ঘরে বসে সব্জির বড়া আর বর্‌শচ্‌-স্যুপ, পনিরের পিঠে আর চর্বির টুকরো গলাধঃকরণ করা, আর মাসে বার দুই করে বিয়ে, বাগ্‌দান কিংবা নিজের বা প্রতিবেশী-আত্মীয়বন্ধুর জন্মদিনের উৎসবে ভোজের আসরে যোগ দেয়াই হচ্ছে যে-কোনো মানুষের চমৎকার জীবনযাপনের আদর্শ নমুনা।

ওলিয়া ভোরনভার ব্যাপারটা ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। কম্‌সমোল-সদস্যের মনোযোগী ও চিন্তাকুল দৃষ্টি নিয়ে সে তাকাত আমাদের নিজেদের ও প্রতিবেশীদের খেতের দিকে; তার কাছে খেত ছিল যেমন পনিরের পিঠের তেমনই নানা সমস্যারও আকর।

শেরে যেখানে অমন কঠোর পরিশ্রম করতেন আমাদের সেই ষাট দেসিয়াতিনা জমি কিন্তু তাঁকে ও তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের ট্রাক্টর এবং এক কিলোমিটার লম্বা একেকটা লাঙলের খাতসহ বড় আকারের খামারের স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত না করে বরং উৎসাহিতই করে তুলেছিল। এ-ব্যাপারে কলোনির সদস্যদের কী

ভাবে আগ্রহী করে তুলতে হয় শেরে তা জানতেন, একদল স্থায়ী শ্রোতাই জুটে গিয়েছিল তাঁর। আমাদের নিজেদের লোক ছাড়াও পাভেল পাভ্‌লভিচ ও গন্‌চারোভ্‌কার কম্‌সমোল সংগঠনের সম্পাদক স্পিরিদোন এই দলটির স্থায়ী সদস্য বনে গিয়েছিল।

পাভেল পাভ্‌লভিচ নিকলায়েঙ্কোর বয়স ইতিমধ্যে ছাব্বিশ বছর হওয়া সত্ত্বেও তখনও বিয়ে হয় নি তার। গাঁয়ের প্রথা অনুযায়ী সে ছিল ঝানু আইবড়। তার বাবা বুড়ো নিকলায়েঙ্কো আমাদের চোখের সামনেই দেখতে-দেখতে রীতিমতো বড় এক ধনী চাষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভবঘুরে বাচ্চা ছেলেদের লুকিয়েচুরিয়ে দিনমজুর হিসেবে খাটিয়ে নেয়া ছিল তার অভ্যেস। অথচ ভাব করত এমন যেন সে নিতান্তই হতদরিদ্র চাষী।

হতে পারে হয়তো এই কারণেই পাভেল পাভ্‌লভিচ বাড়িতে থাকা অপছন্দ করত এবং দিনের বেশির ভাগ সময়টাই কলোনিতে কাটাত। শেরে তাকে নিযুক্ত করেছিলেন যে-সব ছেলে চাষ করত তাদের কাজ দেখাশোনার অপেক্ষাকৃত দায়িত্বপূর্ণ পদে। আমাদের ছেলেদের চোখে তাই তার মর্যাদা ছিল প্রায় একজন শিক্ষকের সমান। পাভেল পাভ্‌লভিচ ছিল পড়াশুনো-করা ছেলে, শেরে যখন কথা বলতেন তখন সে বুদ্ধিমানের মতো ও মনোযোগ দিয়ে তা শোনার ক্ষমতা রাখত।

পাভেল পাভ্‌লভিচ ও স্পিরিদোন দু-জনেই যে-কোনো কথাবার্তাকে কৃষকদের চাষবাস-সংক্রান্ত খাতে বইয়ে দিতে ছিল পটু -- বৃহদায়তন খামারকেও তারা ছোট-ছোট খাসখামারের মতো করে দেখত। ওলিয়া ভোরনভা সে-সময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে। বাদামি চোখ দুটো ওর সহানুভূতিতে জ্বলজ্বল করতে থাকত যখন পাভেল পাভ্‌লভিচ আস্তে-আস্তে বলত:

'ব্যাপারডারে আমি দেখি এইভাবে — চারিদিকে মানুষে কাজ আর কাজ করত্যেছে, কিন্তু কেউই ঠিকভাবে তা করত্যেছে না। আর ঠিক-ঠিক কাজ করত্যে হলি, মানুষিরে শিক্ষে দেয়া লাগে। কিন্তু অদেরে শিক্ষেডা দিবে কেডা? মুজিক? ধুত্তেরি, তারেই শিক্ষে দেয়া বলে যথেষ্ট শক্ত! এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ এখেনে সবকিছু হিসাব করি ফেল্যেছেন, আর কী কী করতি লাগবে আমাদের সব তিনি বলি দ্যান। তা, ঠিক আছে! এইভাবেই কাজ করতি লাগে! কিন্তু ওই চাষী-শয়তানগুলান কখনও এভাবে কাজ করব্যে না! অরা চায় শুধু নিজিদের খাসজমিন...'

বুদ্ধিমত্তায়-ভরা, চওড়া হাঁ-মুখটা অল্প একটু ফাঁক করে কথা বলত স্পিরিদোন। পাভেল পাভ্‌লভিচের কথার ফাঁকে এবার সে সাবধানে বলল, 'কিন্তু কলোনি-বাসিন্দারা তো ঠিক-ঠিক কাম করত্যেছে।'

'কলোনি-বাসিন্দারা?' চিন্তিত মুখে মৃদু হাসি ফুটল পাভেল পাভ্‌লভিচের। বলল, 'সেটা হল্য গিয়ি সম্পূন্ন প্রেথক ব্যাপার, বোঝলে না!'

ওলিয়াও হাসল। যেন বাদাম ভাঙছে এমন ভঙ্গিতে দুই হাত জড় করে আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে, পপ্‌লার গাছগুলোর মাথার দিকে দুষ্টু-দুষ্টু চোখে এক-নজর তাকাল। ওর সোনালি চুলের বিনুনি দুটো খসে পড়ল কাঁধের ওপর। ধূসর চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল পাভেল পাভ্‌লভিচ।

'কলোনির ছেল্যারা ভবিষ্যতে চাষবাস করতি চায় না, তবু তারা মাঠের কাজ করতিছে। অথচ চাষীরা তাদের সারাটা জেবন জমির পিছনে ব্যয় করে, তাদের ছেল্যাপিলাও আছে, সবকিছুই আছে...'

ওলিয়ার কথাটা ধরতে না-পেরে স্পিরিদোন বলল, 'তা, এয়াতে হল্য কী?'

'বোঝলে না?' ওলিয়ার গলায় বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগল। 'কমিউনের মধ্যি আল্যে চাষীরা আরও ভালোভাবে কাম করতি পারব্যে।'

'একথা তমার মনে হল্য ক্যানে?' শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল পাভেল পাভ্‌লভিচ।

কড়া চোখে ওলিয়া এবার পাভেল পাভ্‌লভিচের চোখের দিকে তাকাল। আর কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার খসে-পড়া বিনুনির কথা ভুলে একমাত্র সেই কঠিন, প্রায় অ-মেয়েলি দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে রইল পাভেল পাভ্‌লভিচ।

'অন্তত ওয়াদের তাই করা উচিত!' ওলিয়া বলল। ''করা উচিত' বলতি কী বোঝায় তা বোঝেন তো, তাই না? এ তো দুয়ি দুয়ি যেমনধারা চার হয় তেমনই সোজা।'

কারাবানভ আর বুরুন এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এটা ছিল ওদের কাছে নেহাতই তত্ত্বগত আগ্রহের ব্যাপার, যেমন ছিল 'মুজিক' সম্পর্কে যাবতীয় আলাপ-আলোচনা। মুজিকদের কাছ থেকে নিজেদের ওরা চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। কিন্তু এ-সময়ে কথাবার্তার ওই তীব্র মোচড়ে মজা পেয়ে কথার কসরতে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারল না কারাবানভ।

বলল, 'ওলিয়া খাঁটি কথা কয়্যেছে। 'করা উচিত' বলতি বোঝায় অদেরে চালানোর দায়িত্ব নিয়ি কাজ করতি বাধ্য করা...'

'কিন্তু অদেরে বাধ্যডা করত্যেছ কী প্রেকারে?' পাভেল পাভ্‌লভিচ জিজ্ঞাসা করল।

'যে-কোনো প্রেকারে, আবার কী!' আলোচনায় উৎসাহ পেয়ে সেমিওন বলল। 'লোকেরে বাধ্য করে মান্‌ষে ক্যামনে? না, গায়ির জোর খাটায়্যে! একবার ওমার ওই সব কয়ডা মজুরিকরে আমার হাতে তুলি দিয়্যে দ্যাখ না, দ্যাখবে এক হপ্তার ভিত্‌রি অরা ভেড়ার মতন সুড়সুড় করি কাজ করাত শুরু করব্যে আর হপ্তা দুই পরে অদেরে বাধ্য কর্যেছি বল্যে অরাই আমারে সেবা দিবে।'

পাভেল পাভ্‌লভিচের চোখ কুঁচকে উঠল। বলল:

'তা, তমার ওই গায়ের জোরডা কিসির? চোয়ালে একখান ঘুসি ঝাড়ার?'

শুনে হাসতে-হাসতে বেঞ্চিতে লুটিয়ে পড়ল সেমিওন। তবে বুরুন ওর কথাটা ব্যাখ্যা করে বোঝাল। গলায় চাপা বিদ্বেষ ফুটিয়ে বলল:

'চোয়ালে একখান ঘুসি, না তমার মাথা! আসল শক্তিডা হল্য গিয়ি রিভলবারের।'

আস্তে-আস্তে ওর দিকে মুখখানা ফিরিয়ে ধৈর্য ধরে বোঝানোর ভঙ্গিতে ওলিয়া বলল:

'আসলে কথাডা তরাই বুঝিস নাই। লোকের যদি কোনো কাজ 'করা উচিত' হয় তাইলে রিভলবার বাদ দিয়িই তারা সে-কাজ করব্যে। নিজির ইচ্ছায় আপনা থেক্যেই করব্যে তারা। কেবল অদেরে ঠিকমতন কওয়া দরকার, বুঝায়্যে কওয়া দরকার।'

অবাক হয়ে চোখ দুটো বড়-বড় করে বেঞ্চি থেকে এবার মাথা তুলল সেমিওন।

বলল, 'ওলিয়া, ওলিয়া, তুই সবকিছু গুলায়্যে ফেল্যেছিস! 'বুঝায়্যে কওয়া'ই বটে! কথাডা শুন্যেছিস বুরুন? ধুত্তোর! যদি কোনো মান্‌ষে কুলাক হতি চায় তো তারে বুঝায়্যে কিসির ফায়দা ওঠবেডা শুনি?'

'কুলাক হতি চায় আবার কেডা?' চোখ বড়-বড় করে এবার ওলিয়ার চটে ওঠার পালা।

'কেডা আবার? অরা সক্কলেই। একবারে শেষ লোকডা পের্‌যন্ত। স্পিরিদোন, পাভেল পাভ্‌লভিচ, সবাই, সক্কলেই!'

শুনে পাভেল পাভ্‌লভিচ মুখ টিপে হাসল। এই অতর্কিত আক্রমণে স্পিরিদোন কিন্তু নাজেহাল হয়ে পড়ল। তার মুখ থেকে শুধু বেরোল:

'খোশখেয়ালের দৌড় দ্যাখো একবার!'

'খোশখেয়াল, বটে!' কথাটার পুনরুক্তি করে কারাবানভ বলে চলল, 'জমিজিরেত নাই বল্যেই ও এখন কম্‌সমোল-সদস্য। একসাথে অরে বিশ দেসিয়াতিনা জমি, গোরু, এট্টা ভেড়া আর এট্টা ভালোজাতের ঘোড়া দিয়ি দাও — দ্যাখবে-নে অর কী হালডা হয়! তারপর দেখা যাবে অই তরে চালাত্যেছে, ওলিয়া!'

হেসে উঠে বুরুন বেশ বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব করে ওকে সমর্থন করল:

'নিচ্চয়, অও কুলাক হবে, পাভলোও কুলাক হবে তখন!'

মর্মান্তিক আহত হয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল স্পিরিদোন, 'চুলায় যা তরা, বেজম্মা কোথাকার!' হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে আপাদমস্তক লাল হয়ে উঠল ও।

উঁচু করে পা তুলে ধপধপ করে ফেলতে-ফেলতে বাগানের বেঞ্চিটার চারদিকে হাঁটতে লাগল সেমিওন। এটা হল তার চরম আনন্দের অভিব্যক্তি। ও সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে তর্ক করছিল, না এমনিই গ্রাম্য ছেলেদের খেপাচ্ছিল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

বেঞ্চিটার সামনে ঘাসের ওপর বসে ছিল সিলান্তি সেমিওনভিচ অত্‌চেনাশ। ওর মাথাটা ছিল পিপের আকারের, মুখখানা টকটকে লাল, ফ্যাকাশে ছাঁটা গোঁফ এবং পুরোপুরি টাকওয়ালা মাথা। আজকাল এ-ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ ক্বচিৎ মেলে, তবে এককালে সারা রাশিয়া জুড়ে এরকম মানুষ প্রচুর ঘুরে বেড়াত — তারা ছিল মানুষের অধিকার ও ভোদ্‌কার স্বাদ এই দুই ব্যাপারেই অভিজ্ঞ জ্ঞানী সব দার্শনিক।

সিলান্তি বলছিল, 'সেমিওন যা বল্যেছে কথাডা কিন্তু ঠিক। লোকে যারে মিলমিশ কর‍্যে থাকা কয় মুজিকরা মোট্টেও তা জানে না। এট্টা ঘোড়া পাল্যেই সে চাইবে আরেট্টা ঘোড়ার বাচ্চা -- যাতে তার দুডা ঘোড়া হয়। এছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। এই হল্য গে ব্যাপার, বোঝলে!'

মুঠিপাকানো হাত থেকে গাঁটে-ভরা এবড়োখেবড়ো একটা বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে তাই নেড়ে-নেড়ে আর ফ্যাকাশে পাতাওয়ালা চোখ দুটো জ্ঞানীর মতো কুঁচকে কথাগুলো বলল অত্‌চেনাশ।

স্পিরিদোন সক্রোধে শুধোল, 'কী বলতি চাও? এর অর্থ ঘোড়াগুলাই মান্‌ষিরে চালায়, তাই কি?'

'ঠিক ঠিক — ঘোড়াগুলানই মানুষিরে চালায়, ঠিক কথা। ঘোড়া আর গোরু, বোঝলে! আর যদি কারো ঘোড়া-গোরু কিছুই না থাকে তাইলে সে কোনো কম্মেরই হয় না। তার কাজ হয় তখন খালি তরমুজ-খ্যাত পাহারা দেয়া। এই হল্য গে ব্যাপার, বোঝলে!'

আমাদের কমিউনের সকলেই সিলান্তিকে পছন্দ করত। ওলিয়া ভোরনভাও অনুরক্ত ছিল ওর। কথাটা শুনে ওর ওপর সস্নেহে ঝুঁকে পড়ল ওলিয়া। আর, একমুখ হাসি নিয়ে যেন সূর্যের দিকে তাকাচ্ছে এমন ভাব করে ও মুখ ফেরাল ওলিয়ার দিকে। বলল:

'কী হল্য আবার, সোন্দরি?'

'তুমি সেকাল্যে হয়্যে গেছ, সিলান্তি, একদম সেকাল্যে। আর চারদিকি এখন সবকিছু নূতন।'

সিলান্তি সেমিওনভিচ অত্‌চেনাশ যে কোথা থেকে এসে জুটে গিয়েছিল কেউ তা জানত না। প্রচলিত রীতিপ্রথা কিংবা সম্পত্তি তার পায়ে বেড়ি হয়ে ছিল না কোনোদিন, যেন সে মহাশূন্য থেকে সরাসরিই এসে আবির্ভূত হয়েছিল। এল যখন তখন তার পরনে ছিল মোটা পাট-কাপড়ের তৈরি ঢোলা কামিজ আর পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া ট্রাউজার্স। আর তার নিচে একদম খালি পা। এমন কি হাতে তার একগাছা লাঠি পর্যন্ত ছিল না। এই মুক্ত পুরুষটিকে বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দাদের ভারি পছন্দ হয়ে গেল, প্রবল উৎসাহে তারা সিলান্তিকে টেনে নিয়ে এল আমার অফিসে।

'আন্তন সেমিওনভিচ, দ্যাখেন-দ্যাখেন, কে আমাদের কাছে এয়্যেছে!'

কৌতূহল নিয়ে সিলান্তি এক-নজর আমাকে ঠাহর করে দেখল, তারপর যেন ওরা তার কতকালের পুরনো বন্ধু এমনভাবে বাচ্চা ছেলেদের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসল। বলল:

'এনাই বুঝি তমাদের — ওরে কী কয় — তমাদের পের্‌ধান?'

সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে ধরে গেল লোকটিকে।

ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আমাদের কাছে কোনো দরকারে এসেছেন?'

নিজের ভাবভঙ্গি কিছুটা গুছিয়ে নিল সিলান্তি। যেন দেখাতে চাইল — যেমন ও কাজের লোক তেমনই ওর ওপর আস্থা রাখা চলে।

বলল, 'ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে! আমি নিজি মজুর খাটি আর তমার করায়্যে নিবার মতন কাজ আছে। আর কী চাই?..'

'কী কাজ করতে পারেন আপনি?'

'কথা হল্য গে, লোকে বলে, যেখানি পয়সা নাই সেখানি মান্‌ষি যে-কোনো কাজ করতি শেখে।'

বলেই আচমকা দিলখোলা, খুশিভরা হাসিতে ফেটে পড়ল ও। ছেলেরাও ওর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল, আমিও হাসলুম। হঠাৎ সকলেরই মনে হল যে হাসা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই।

'সবরকম কাজ করতে পারেন আপনি?'

'তা, বলতি পার পেরায় সবরকমই... ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে,' এবার একটু বিভ্রান্তভাবে বলল সিলান্তি।

'কিন্তু ঠিক কোন ধরনের কাজ?..'

'তা, ধর ক্যানে, লাঙ্গল চষতি পারি, জমিতি মই দিতি পারি,' একে-একে আঙুল মটকে নিজের সাধ্য কাজের ফিরিস্তি দিতে শুরু করল সিলান্তি। 'তাছাড়া ঘোড়ার তদারকি করতি পারি, গোরু-শোর সবকিছুর দেখাশোনা করতি পারি, আর ·· ওরে কী য্যানো কয় — খুচরা কাজ — হ্যাঁ হ্যাঁ, সব রকম খুচরা কাজও করতি পারি আমি - যেমন ধর, ছুতারের কাজ, কামারশালের কাজ, চুল্লী বানানো। তাছাড়া আমি বাড়ির রঙ্‌মিস্ত্রিরিও বটে, জুতা-সারাইও করতি পারি। ঘর বানানোর দরকার হলি তাও বানাতি পারি, তাছাড়া শোরও কাটতি পারি। একমাত্তর যে-কাজডা আমার আসে না তা হল্য গে বাচ্চারে ধম্মে দীক্ষে দেয়ার সময় তার ধম্মোপিতা হওয়া -- ওই কাজডা আমার দ্বারা কোনোদিন হয়্যে ওঠে না।'

আচমকা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল ও। হাসির দমকে চোখে জল এসে পড়ায় তা মুছতে হল পর্যন্ত।

'আপনার দ্বারা কোনোদিন তা হয়ে ওঠে না, তাই না?'

'মানে, কেউ কোনোদিন আমারে হতি বলে নাই, বোঝলে — ব্যাপারডা হল্য গে এই!'

প্রাণভরে হাসতে লাগল ছেলেরা। তোস্‌কা সলভিয়েভ তো রীতিমতো চিল-চিৎকার জুড়ে দিল। তারপর পা টিপে-টিপে সিলান্তির কাছে ঘেঁষে এসে বললে:

'কেউ কোনোদিন তোমারে হতি বলে নাই ক্যানে? ক্যানে কেউ বলে নাই, শুনি?'

এবার সিলান্তি গম্ভীর হয়ে গেল। এবং রীতিমতো মাস্টারি ঢঙে তোস্‌কাকে বোঝাতে শুরু করল। বলল:

'ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে কিনা ভাই। যখনই কোনো বাচ্চারে ধম্মে দীক্ষে দেয়া হয় অমনে আমি মনে-মনে ভাবি — এই বুঝি অরা আমারে ডাক দেয়! কিন্তু তারপরই দেখা যায় আমার থেক্যে পয়সাওলা আর কাউরে পায়্যে গেছে অরা। তাহল্যেই বোঝ!'

'আপনার সঙ্গে কোনো কাগজপত্র আছে?' জিজ্ঞাসা করলুম।

'কাগজ তো ছেল। এই অল্প কিছুদিন আগেও আমার সাথে — অরে কী কয় — একখান পরিচয়পত্তর ছেল,' ও বলল। 'কিন্তু ব্যাপারডা হল্য গে, বোঝলে কিনা — আমার তো জামার জেব নাই, তা কাগজখান হারায়্যে গেল, বোঝলে। কিন্তু আমি যখন নিজিই সশরীলে এখেনে আসি হাজির হয়্যেছি — একবারে জলজ্যান্ত তমার সামনি আস্যে খাড়া হয়্যে গেছি — তখন ওসব পরিচয়পত্তর-ফত্তর নিয়ি করব্যেডা কী?'

'এর আগে আর কোথায়-কোথায় কাজ করেছেন আপনি?'

'কনে কাজ করয়্যেছি? তা ধর ক্যানে, সব্বত্তর। সব ধরনির মানষির জন্যি। ভালোমন্দ, জন্তুজানোয়ার, সব ধরনির মানষির জন্যি, বোঝলে! তমারে আমি সাফ কথা বলত্যেছি — কিছুই আমার লুকাছাপা করনের নাই — সব ধরনির মানষির জন্যি কাজ করয়্যেছি আমি।'

'আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন তো — কখনও চুরি বিদ্যে অভ্যেস করেছেন?'

'তমারে সাফ কথা বলব — কখনও চুরি করি নাই জেবনে। কখনও করি নাই। সত্য কথা! ব্যাপারডা হল্য গে এই প্রেকার, বোঝলে!'

অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত ভাব করে আমার দিকে তাকাল সিলান্তি। মনে হল ও যেন ভাবছে, আমি ওর কাছ থেকে অন্যরকম উত্তর আশা করেছিলুম।

কাজ করার জন্যে সিলান্তি আমাদের সঙ্গে থেকে গেল। শেরের অধীনে পশুসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ওকে লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলুম আমরা, কিন্তু ওকে 'সংগঠিত' করার এই চেষ্টায় ফল হল না। মানবিক ক্রিয়াকলাপের বিপুল ক্ষেত্রে কোনোরকম বিধিনিষেধ মানতে রাজি ছিল না সিলান্তি। তার প্রশ্ন ছিল — কেন তাকে অমুক কাজটা করতে দেয়া হচ্ছে, অথচ তমুক কাজটা করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না? এর ফলে আমাদের হয়ে কাজ করার সময়ে যে-কাজ সে নিজে প্রয়োজনীয় মনে করত তা-ই করত, এবং যখন

সে নিজে তা প্রয়োজনীয় মনে করত তখনই করত। সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্বকে মৃদু হেসে উড়িয়ে দিত সে, এবং বিদেশী ভাষার বক্তৃতায় লোকে যতখানি কর্ণপাত করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ইত্যাদিকে তার বেশি আমল দিত না। একটা গোটা দিনে সে কাজ করত আস্তাবলে, আবাদে, শুয়োরের খোঁয়াড়ে, খামারের উঠোনে, কামারশালে, তদুপরি যোগ দিত শিক্ষক-পরিষদ ও দলপতি-পরিষদ উভয়েরই সভায়। কলোনির মধ্যে কোনটা যে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা যেন একধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তা আবিষ্কার করে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল সিলান্তির, আর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যেত দায়িত্বশীল ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রাপ্য না-দিয়েও সিলান্তি কিন্তু সর্বদাই নিজের কাজের জবাবদিহি করতে প্রস্তুত ছিল, কিংবা ভুলভ্রান্তি ও ব্যর্থতার জন্যে তীব্র সমালোচনা ও গালাগালি হজম করতেও পিছপা ছিল না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাথার পেছনটা একবার চুলকে নিয়ে হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিত ও।

তারপর স্বীকার করত, 'সবই তালগোল পাকায়্যে ফেল্যেছি আমরা। ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে!'

আমাদের কাছে আসার একেবারে প্রথম দিনটি থেকেই সিলান্তি সেমিওনভিচ অত্‌চেনাশ আমাদের কম্‌সমোলের কাজকর্মে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কম্‌সমোলের সাধারণ সভায় ও তার কার্যনির্বাহী কেন্দ্রের বৈঠকে নিয়মিত বক্তৃতা দেয়ারও কামাই ছিল না তার। পবিত্র ক্রোধে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে-ফুটতে একবার ও আমার কাছে এল। মুঠিপাকানো হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে-নাড়তে বললে:

'দ্যাখ দেখি কাণ্ড, আমি অদের কাছি গেলাম...'

'কাদের কাছে?'

'কাদের কাছি আবার, কম্‌সমোলদের কাছি, বোঝলে না! আর অরা কিনা আমারে ঢুকতি দিল না — ওই অদের এট্টা, বোঝলে না, বন্ধ ঘরের বৈঠকে। তা, আমি অদেরে মিষ্ট করো বোঝায়্যে কলাম — 'বাচ্চারা, আমারে যদি ঢোকতি না দ্যাও তাইলে মিত্যু পের্‌যন্ত তমরা যে কচিকাঁচা থেক্যে যাবে-নে। গাড়ল হয়ি জম্মোছ - মরবাও গাড়ল হয়ি,' এই আর-কি!'

'তারপর কী হল?'

'ব্যাপারডা হল্য গে এইরকম, বোঝলে — হয় অরা ভালো-মন্দ কিছু

বোঝে না আর নয় তো সকলে মাতাল হয়েছে — কিন্তু কই, মাতাল বলি তো মনে হল্য না। তা, আমি অদেরে কলাম, 'কার কাছ থেক্যে ব্যাপারস্যাপার লুকাত্যেছ তমরা? লুকা কি সফ্রোন কি মুসির কাছ থেক্যে যদি লুকাও তো ঠিক আছে। কিন্তু আমারে বাইরি রাখতি চাও ক্যানে? বোধহয় তমরা — অরে কী কয় — আমারে চেনো না, আর নয়তো তমাদের মাথা-ফাতা গোলমাল হয়্যে গ্যাছে।' ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে না — তা, অরা আমার কথা শুনতি চাইল্য না পের্‌যন্ত, খালি হাসতি লাগল, যারে কয় একবারে কচিকাঁচার মতন। তুমি যতই অদের সাথে কাজির কথা কও অরা খালি তমারে নিয়ি হাসিতামশা জুড়ি দিবে। তা এই হল্য গে মোদ্দা কথা।'

আমাদের কম্‌সমোল সংগঠনের সঙ্গে মিলে সিলান্তি এরপর এমন কি ইশ্‌কুল সংগঠন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও সোৎসাহে যোগ দিল।

নিয়মিত কম্‌সমোল-শাসনের প্রথম ফল ফলল এই যে আমাদের ইশ্‌কুলটাকে পায়ের ওপর দাঁড় করানো গেল। তার আগে পর্যন্ত ইশ্‌কুলটা কোনোরকমে তার অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে চলছিল মাত্র, কলোনি-সদস্যদের অনেকের পড়াশুনোর প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে।

তবে এর কারণ বুঝে ওঠা যে মোটেই শক্ত ছিল না তাও স্বীকার করতে হবে। গোর্কি কলোনির প্রথম দিনগুলি ছিল গৃহহীন নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েদের আগেকার দিনগুলির তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে রোগমুক্তির কাল। ওই দিনগুলিতে জুতো বানানোর মুচি কিংবা ছুতোরমিস্ত্রি হওয়ার মতো পরিমিত মাত্রার স্বপ্ন দেখার মধ্যেই তাদের অতি-উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত সুস্থিত করে তোলার উপায় নিহিত ছিল।

আমাদের যৌথ সংগঠনের চোখ-ধাঁধানো অগ্রগতি ও কলমাকের তীরভূমিতে তার সগৌরব অস্তিত্বঘোষণা কলোনির সদস্যদের চোখে তাদের নিজেদের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। তাই জুতো বানানোর মতো নিচু মানের আদর্শের জায়গায় পরে অপর একটি চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী আদর্শের উপস্থাপনায় আমাদের যৎসামান্যই বেগ পেতে হয়েছিল। এই আদর্শের প্রতীক ছিল —

রাব্‌ফাক

শব্দটি।

বর্তমানে এই 'রাব্‌ফাক' কথাটির যা তাৎপর্য, ওই সময়ে তার তাৎপর্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সাধারণ বৃত্তিশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের নাম মাত্র। কিন্তু সেকালে এটি ছিল অন্ধকার ও অজ্ঞতা থেকে শ্রমিক শ্রেণীর তরুণতরুণীদের শৃঙ্খলমুক্তির প্রতীক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের নতুন অর্জিত অধিকারের সগৌরব ঘোষণা। আর আমরা সবাই ওই সময়ে 'রাব্‌ফাক'কে যে-চোখে দেখতুম তাকে একমাত্র সূক্ষ্ম কোমল একধরনের অনুভূতি আখ্যা দেয়া চলতে পারে।

কার্যত ব্যাপারটা পেকে উঠেছিল এইভাবে: ১৯২৩ সালের শরৎকালের মধ্যে 'রাব্‌ফাক'-এ ঢোকার আকাঙ্ক্ষা আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের প্রায় সকলকেই পেয়ে বসেছিল। এই আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা এমন কি সেই সুদূর ১৯২১ সাল থেকেই আমাদের অজ্ঞাতসারে কলোনির মধ্যে চারিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এটা শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকে যখন আমাদের শিক্ষিকারা দুর্ভাগা রাইসাকে 'রাব্‌ফাক'-এ ভরতি হতে রাজি করিয়েছিলেন। ওই সময়ে এঞ্জিন-মেরামতি কারখানার তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে 'রাব্‌ফাক'-এর বহু ছাত্রও মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। তাদের মুখে প্রথম 'রাব্‌ফাক'গুলোর সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ নানা কাহিনী শুনে কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠত, আর মনে এই ঈর্ষার সঞ্চার হওয়ার ফলেই 'রাব্‌ফাক'-এর জন্যে তৈরি হওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রচারে ক্রমশ বেশি-বেশি উৎসাহের সঙ্গে কর্ণপাত করতে শুরু করল তারা। মানুষের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবময় পথ হল 'রাব্‌ফাক'-এ ভরতি হওয়া, এই কথা বলে রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের ইশকুল করা আর লেখাপড়া শেখার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতুম আমরা। কিন্তু কলোনি-বাসিন্দাদের চোখে 'রাব্‌ফাক'-এ ভরতি হওয়ার ব্যাপারটা যুক্ত ছিল এমন একটা অনতিক্রম্য রকমের কঠিন পরীক্ষার সঙ্গে, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে যে-পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব ছিল একমাত্র প্রতিভাধর ছেলেমেয়েদের পক্ষেই। আমাদের ইশ্‌কুলে লেখাপড়া শিখেও যে এই ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষার উপযোগী হয়ে তৈরি হওয়া সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের একথা বিশ্বাস করাতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে 'রাব্‌ফাক'-এ ভরতির উপযোগী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট একটা ভয় এই ইচ্ছাপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে নিজেদের প্রস্তুতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত

হওয়ার জন্যে আরও একটা বছর তারা কলোনিতে থেকে যেতে মনস্থ করেছিল। বুরুন, কারাবানভ, ভেরশ্নেভ আর জাদোরভ ছিল এই দলে। পড়াশুনোয় বিশেষ করে বুরুনের তীব্র আগ্রহ দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলুম। এ-ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দেয়ার পর্যন্ত বিশেষ দরকার পড়ত না। নিঃশব্দে স্থিরসংকল্প নিয়ে সে লড়াই করে যেত পাটিগণিত আর ব্যাকরণের সঙ্গে, এমন কি নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধেও। একেবারে নেহাতই তুচ্ছ একেকটা বিষয় — যেমন, ব্যাকরণের একটা বিশেষ সূত্র কিংবা পাটিগণিতের একটা বিশেষ ধরনের অংক নিয়ে প্রচুর হাঁপাহাঁপি করে গলদ্ঘর্ম হয়ে তাকে প্রাণপণে মাথা ঘামাতে দেখা যেত, কিন্তু কখনও তাকে এজন্যে চটে যেতে বা আত্মপ্রত্যয় হারাতে দেখি নি। সৌভাগ্যক্রমে তার মনে এই ভুল ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল যে জ্ঞান হচ্ছে চরমতম কঠিন ও সবচেয়ে বেশি মাথা-খাটানোর উপযোগী একটা বস্তু এবং তা একমাত্র অসামান্য প্রয়াসেই অর্জন করা সম্ভব। কী যেন এক অলৌকিক কারণে এ-ব্যাপারটা ওর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল যে অন্যেরা ওর মতো অতখানি প্রয়াস ছাড়াই কিন্তু লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন, ইশ্কুলের বাঁধাধরা সময়ের বাইরে একটা মুহূর্তও লেখাপড়ায় ব্যয় করছে না জাদোরভ, কারাবানভ এমন কি পড়াশুনোর সময়ও মাঝে-মাঝে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকছে, বইয়ের পড়ায় বা লেখায় মন না-দিয়ে কলোনির জীবনের তুচ্ছ কোনো ব্যাপার নিয়ে ভেতরে-ভেতরে তোলাপাড়া করছে। এর ফলে অবশেষে এমন একটা সময় এল যখন দেখা গেল বুরুন তার সঙ্গীদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে পড়াশুনোয়, যখন তার পাণ্ডিত্যের দৃঢ় ভিত্তির সঙ্গে তুলনায় অন্যদের জ্ঞানের হঠাৎ-হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো চমককেও তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হতে লাগল। মারুসিয়া লেভ্চেঙ্কো কিন্তু ছিল বুরুনের একেবারে বিপরীত স্বভাবের। মেয়েটি কলোনিতে এসেছিল অসহ্যরকমের ঝগড়াটে স্বভাব, চিৎকার-চেঁচামেচির বাই, সন্দেহ-বাতিক আর চোখের জলের অফুরন্ত বন্যা নিয়ে। ওর জন্যে আমাদের অনেক ভুগতে হয়েছিল। মাতালসুলভ একধরনের বেপরোয়া ভাব আর উদ্বায়ু রোগীর অদম্য প্রচণ্ডতা নিয়ে এক মিনিটের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান যে-কোনো বস্তু — তা সে বন্ধুত্ব, অর্জিত সাফল্য, সুন্দর একটা দিন, ঝলমলে শান্ত একটা সন্ধে, সবচেয়ে কাম্য আর সবথেকে উজ্জ্বল আশাভরসা যা-ই হোক না কেন — তাকে চূর্ণচূর্ণ করে ফেলতে

এতটুকু বাধত না মেয়েটির। এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যখন মনে হয়েছে কয়েক বালতি ঠান্ডা জল এই অসহ্য প্রাণীটির মাথায় নির্মমভাবে ঢেলে দিয়ে এর ভেতরকার চিরস্থায়ী, নির্বোধ ক্রোধের অগ্নি-উদ্গিরণ প্রশমিত করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এ-ব্যাপারে কোমল সহানুভূতি তো দূরস্থান বরং বলা চলে প্রায়শই খানিকটা নিষ্ঠুর ধরনে সারা কলোনির নিয়মিত দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে অবশেষে মারুসিয়া নিজেকে কিছুটা সংযত করতে শিখল, কিন্তু দেখা গেল তার পর থেকে ওই একই রকম অসুস্থ একগুঁয়েমিপনা নিয়ে নিজেকেই ও বিদ্রূপ করতে আর উৎপীড়ন করতে শুরু করেছে। মেয়েটার স্মৃতিশক্তি ছিল চমৎকার, তাছাড়া ও ছিল বুদ্ধিমতী আর ভারি সুশ্রী দেখতে। ঈষৎ শ্যামলা গাল দুটোয় ছিল ওর টুকটুকে লাল আভা, আর নিতান্ত নিরীহ, শান্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধিমত্তায় ভরা ওর সুগঠিত কপালের নিচে বড়-বড় কালো দুটো চোখ থেকে আগুন আর বিদ্যুৎ ঠিকরোচ্ছে বলে মনে হোত। এ-ব্যাপারটা ছিল ভারি আশ্চর্য এক স্ববৈপরীত্যের নমুনা। অথচ মারুসিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, যাকে বলে একেবারে 'ভয়ঙ্করদর্শন', তাছাড়া কিছুই তার মাথায় ঢোকে না আর কোনোদিন কিছু ঢুকবেও না। যে-কোনো সহজতম কাজেও আগে থেকে মনগড়া নানারকম যুক্তি দেখিয়ে সে ওজর-আপত্তি তুলত।

প্রায়ই বলত সে, 'যাই করেন না ক্যানে, এয়াতে কিছু হবার নয়! খালি আমার পিছুপিছু ঘ্যানঘ্যান করত্যেছেন — পড়, পড়! তা আপনের বুরুনরে পড়ান না গিয়ি। আমার আর কী হবে, দাসীবিত্তি ছাড়া? আমি তো কোনো কম্মের যুগ্যি না, তাইলে খামোকা আমারে জ্বালাতন কর্যে লাভডা কী?'

কয়েকদিন মারুসিয়াকে পড়ানোর চেষ্টা করার পর-পরই দেবদূতসুলভ চাউনি আর প্রায়-বিরক্তিকর দেবদূতোপম মেজাজের অধিকারিণী ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণা বেচারা নাতালিয়া মার্কভ্না ওসিপভা চোখের জলে ভেঙে পড়তেন।

বলতেন, 'ওকে আমি ভালোবাসি। সত্যিই ওকে কিছু শেখাতে চাই আমি। কিন্তু ও খালি আমাকে চুলোয় যেতে বলছে আর বলছে ওকে যেভাবে আমি জ্বালাতন করছি তা নাকি লজ্জাকর। ওকে নিয়ে কী করি বলুন তো?'

কী আর করা! অবশেষে মারুসিয়াকে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার অধীন ছাত্রছাত্রীদের দলে বদলি করে দিলুম। এর ফলাফল কী দাঁড়াবে তা ভেবে যদিও আমার নিজেরই আশঙ্কা ছিল, তবু। কারণ, জানতুম লোকের কাছ থেকে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না স্পষ্টভাবে সোজাসুজি কাজ দাবি করেন।

পাঠবর্ষ শুরু হওয়ার তিনদিন বাদেই একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না মারুসিয়াকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে ছাত্রীকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে (দেখলুম, মারুসিয়া রাগে একেবারে ঠকঠক করে কাঁপছে) বললেন:

'আন্তন সেমিওনভিচ! মারুসিয়াকে এনেছি — এখন আপনিই ঠিক করুন ওকে নিয়ে কী করা হবে! জাঁতাকলওয়ালার একজন চাকরানী দরকার। মারুসিয়াও মনে করে চাকরানী ছাড়া আর কিছু হওয়ার যোগ্য নয় ও। তাহলে ওকে কি জাঁতাকলওয়ালার কাছে পাঠাব? কিন্তু এছাড়া আরও একটা বিকল্প আছে: আসচে শরৎকালের মধ্যে আমি ওকে 'রাব্‌ফাক'-এ ভরতির উপযোগী করে তৈরি করে দেয়ার গ্যারান্টি দিতে পারি। মেয়েটা তার রীতিমতো যোগ্য।'

বললুম, 'অবশ্যই 'রাব্‌ফাক'-এর জন্যে তৈরি করুন।'

চেয়ারে বসে মারুসিয়া তখন দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে ছিল একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার শান্ত মুখখানার দিকে।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না বলতে লাগলেন, 'পড়ানোর সময় আমাকে ও অপমান করলে আমি কিন্তু সহ্য করব না বলে দিলুম। নিজে আমি একজন খাটিয়ে লোক, অপমান বরদাস্ত করতে আমি রাজি নই। যদি ও আর কখনও আমাকে 'চুলোয় যাও' বা 'ইডিয়ট' বলে তাহলে কিন্তু আমি ওকে পড়াব না।'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার কথার প্যাঁচটা ধরতে পারলুম। কিন্তু মারুসিয়াকে নিয়ে ইতিপূর্বে সব রকম প্যাঁচেরই পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল. শিক্ষাদান-সংক্রান্ত আমার স্বপ্নকল্পনায় আর বিন্দুমাত্র উৎসাহের আঁচ লাগছিল না। মারুসিয়ার দিকে ক্লান্ত চোখে একবার তাকিয়ে কোনোরকম মারপ্যাঁচের আশ্রয় না-নিয়ে খোলাখুলি বললুম:

'ওতে কিছু ফল হবে না! 'চুলোয় যাও', 'বোকা', 'ইডিয়ট' — এ-সব

কথা ও বলতেই থাকবে। অন্যের প্রতি মারুসিয়ার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি নেই, আর এই মনোভাবের আচমকা পরিবর্তন ঘটারও কোনো আশা নেই...'

আমার কথায় বাধা দিয়ে মারুসিয়া হঠাৎ বললে, 'অন্যেরে আমি ছেদ্দাভক্তি করি বৈকি!'

বললুম, 'না, কারো প্রতিই তোমার কোনো শ্রদ্ধাভক্তি নেই। কিন্তু, একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না, কী করা যাবে বলুন? ও আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। ব্যাপারটাকে আমি এইভাবে বুঝি: আপনি একজন বয়স্ক, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আর মারুসিয়া বদ্‌মেজাজি বাচ্চা মেয়ে। ওর আচরণে আমাদের বিচলিত হলে চলবে না। ওকে ওর যা খুশি বলতে দিন — আপনাকে ও ইডিয়ট বলুক, পশু বলুক (তা-ও তো ও বলেছে, তাই না?) — আপনি কিন্তু কান দেবেন না তাতে। ওটা ওর ক্রমশ কেটে যাবে। কেমন, এতে আপনি রাজি?'

হাসতে-হাসতে মারুসিয়ার দিকে তাকালেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না, তারপর সহজভাবে বললেন:

'ঠিক আছে। ওইভাবেই চলব। আমি রাজি।'

মর্মাহত মারুসিয়ার জলভরা কালো চোখ দুটো এতক্ষণ একদৃষ্টে নিবদ্ধ ছিল আমার দিকে। হঠাৎ একটা রুমালে মুখখানা ঢেকে ফেলে কাঁদতে-কাঁদতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এক সপ্তাহ পরে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নাকে জিজ্ঞাসা করলুম:

'মারুসিয়ার খবর কী?'

'ভালোই। আর মুখখারাপ করছে না। কিন্তু আপনার ওপর ভারি চটে আছে।'

পরের দিন একটু বেশি রাত্রে মারুসিয়াকে সঙ্গে করে সিলান্তি আমার কাছে এল। বলল:

'যারে কয়, অরে টানোটুনো তমার কাছি নিয়ি আলাম। বোঝলে, আন্তন সেমিওনভিচ, মারুসিয়া তমার কথায় ভারি মনঃক্ষুণ্ণ হয়্যে আছে। অর সাথে একবার আলাপ কর দেখি।'

বিনীতভাবে একপাশে সরে দাঁড়াল ও। মারুসিয়ার মাথাটা বুকের ওপর হেঁট হয়ে এল।

'আপনেরে কিছুই বলার নাই আমার,' ও বলল। 'অরা যদি আমারে পাগল ভাবে তো ভাবুক!'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আমার কোন কথায় আবার মনখারাপ হল তোমার?'

'আমারে পাগল ঠাওরালেন ক্যানে?'

'কই, আমি তো তোমাকে পাগল ঠাওরাই নি।'

'তাইলে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নারে অমন কথা কলেন ক্যানে?'

'ও, এই কথা? আমার ভুল হয়েছিল, বুঝলে না? আমি ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় তাঁর সঙ্গে মুখখারাপ করবে।'

মারুসিয়া হাসল। বলল:

'কিন্তু আমি তো আর তাঁরে খিস্তি করি না।'

'কর না? তার মানে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। কেন যেন আমার মনে হয়েছিল তুমি বোধহয় ওঁর সঙ্গে মুখখারাপ করবে।'

মারুসিয়ার অপরূপ মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা অবিশ্বাসে-ভরা, তবু আনন্দে। বলল:

'আপনে তো সব্বদা ওই রকমই — লোকের সম্বন্ধি দুমদাম কথা বলেন...'

এবার এগিয়ে এসে টুপিসুদ্ধ হাতখানা নাড়তে-নাড়তে সিলান্তি বললে:

'ঢের হয়্যেছে, অরে নিয়ি আর পড়তি লাগবে না! তমরা তো আছ গিয়ি, যারে কয়, এক গুষ্টি, আর ও তো একা মানুষি। ও যদি এক-আধটুক ভুল কর্য়েই থাকে, তাতে কী! ওয়ার উপর রাগ করা উচিত হয় না তমাদের।'

হাসিখুশি-ভরা মুখে চকিতে এক-নজর সিলান্তির মুখের দিকে তাকাল মারুসিয়া। রিনরিনে গলায় বলে উঠল:

'বুড়া হইলে কী হয়, সিলান্তি, তুই বিলকুল মোটামাথা!'

বলেই অফিস-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মারুসিয়া।

ওর দিকে টুপিটা একবার নেড়ে সিলান্তি বললে:

'তাইলে, ব্যাপারডা দাঁড়াল্য গিয়ি এই।'

হঠাৎ টুপি দিয়ে হাঁটুতে একটা ঝাপট দিল ও। তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বললে:

'তাইলে, মোদ্দা ব্যাপারডা দাঁড়াল্য গিয়ি এই। বাচ্চাডা আচ্ছা শয়তান তো!..'

৩

প্রধান চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যগুলি

ছুতোরমিস্ত্রিরা লাল বাড়ির জানলা বসানোর কাজ শেষ করব-করব করছে, এর মধ্যে শীত এসে গেল। সে-বছর শীতটা একটু কম নিষ্ঠুর ছিল: নরম-নরম তুষার-পালকে ঢাকা, কোমল কান্ত; অস্বাস্থ্যকর বরফ-গলা জলস্রোত কিংবা প্রচণ্ড তুষারপাত, কিছুই ছিল না। তিন দিন ধরে কুদ্‌লাতি ব্যস্ত রইল কলোনি-বাসিন্দাদের শীতের জামাকাপড় বিলি করায়। ঘোড়ার সহিস আর শুয়োর-পালকদের প্রত্যেককে সে দিল একজোড়া করে 'ভালেন্‌কি',* বাকি সবাই পেল সাধারণ বুটজুতো। নতুনত্বের বিচারে কিংবা ফ্যাশনদুরস্ত জুতো হিসেবে বুটগুলো মোটেই উল্লেখ্য ছিল না, তবে তাদের অন্য অনেক গুণ ছিল। যেমন, জুতোগুলো ছিল শক্তপোক্ত চামড়ায় তৈরি, সুমার্জিত ভাবে তালি-মারা এবং ঈর্ষণীয় রকমের বড়সড়, যার ফলে পর-পর দু'জোড়া পট্টি পায়ে জড়ানো সম্ভব হোত। ওভারকোট কাকে বলে ওই সময়ে আমরা প্রায় তা জানতুমই না বলা চলে। ওভারকোটের বদলে আমরা পরতুম তুলোর গোল্লাভরা ও প্যাড-দেয়া হাতাওয়ালা এক ধরনের জ্যাকেট। বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ওগুলো চালু ছিল আমাদের দেশে। কারো-কারো মাথায় দেখা গেল এমন সব টুপি যেগুলো জার-আমলের সামরিক কমিশারিয়েতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেকে শীতকালেও কাপড়ের টুপি পরতে হোত। ওই সময়ে আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেদের শরীর এর চেয়ে আর ভালোভাবে গরম রাখার সামর্থ্য ছিল না আমাদের। কি শীত কি গ্রীষ্ম তাদের ট্রাউজার্স আর শার্ট ছিল তখন হালকা সুতী কাপড়ে তৈরি। সে-কারণে শীতকালেও ছেলেদের চলাফেরায় এমন একটা অন্যাবশ্যক দ্রুততার সঞ্চার ঘটত যে এমন কি প্রচণ্ড তুষারপাতের সময়েও একেবারে উল্কাবেগে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটোছুটি করে বেড়াতে তাদের অসুবিধে হোত না।

কলোনিতে শীতের সন্ধেগুলো ছিল ভারি মনোরম। সন্ধে পাঁচটা লাগাদ কাজ শেষ হয়ে যেত, তারপর রাতের খাওয়ার আগে হাতে সময় থাকত ঘণ্টা

---

* ভালেন্‌কি — ফেল্‌ট-কাপড়ের তৈরি উঁচু বুটজুতো। — অনুঃ

তিনেক। ইতিমধ্যে এখানে-ওখানে জ্বলে উঠত তেলের বাতি, তবে সত্যিকার প্রাণচঞ্চলতা ও উষ্ণ আরামের উৎস এটা ছিল না। এজমালি শোবার ঘর ও ক্লাসরুমগুলোয় জ্বালিয়ে দেয়া হোত চুল্লীগুলো। আর প্রতিটি চুল্লীর সামনে সর্বদাই জড় হয়ে থাকত দুটো করে ঝাঁক — একটা চুল্লীতে পোড়ানোর কাঠের কুঁদোর, আরেকটা কলোনি-বাসিন্দাদের। মনে হোত, দুটি ঝাঁকই ওখানে জড় হয়ে আছে ঘর গরম করার জন্যে ততটা নয় যতটা সন্ধেবেলার পাঁচ-ইয়ারি কথাবার্তার জন্যে। কাঠের কুঁদোগুলোই শুরু করত প্রথম -- ছেলেদের কেউ চটপট করে সেগুলোকে চুল্লীর মধ্যে গুঁজে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। মজার-মজার সব অ্যাড্ভেঞ্চার, হাসিতামাশা, গুলি-ছোড়াছুড়ি, তাড়া করা, ছেলেমানুষি খোশমেজাজ আর উল্লসিত হৈ-হল্লার কাহিনীতে ঠাসা লম্বা-চওড়া একটা গপ্পো ফেঁদে বসত চেলাকাটগুলো। ছেলেরা তাদের এই বকবকানির সবটুকু অর্থ বুঝতে পারত কিনা সন্দেহ, কারণ গল্প-বলিয়েরা একে অন্যকে মাঝপথে বাধা দিয়ে গলা চড়াত আর মনে হোত গল্পটাকে নিজের মনোমতো দিকে বাঁক ফেরাতে তাদের সকলেরই যেন বিষম তাড়া লেগে গেছে। তবে গল্পটার মূল তাৎপর্য ছেলেদের সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠত আর তাদের মনের মধ্যে তা গভীরভাবে গেঁথেও যেত। সেটা হল এই যে জীবনটাই ভারি মজার আর মন-কাড়া একটা অ্যাড্ভেঞ্চার। আর তারপর আগুনে কাঠ ফাটার ফট্ফট্ আওয়াজ যখন আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেত আর গল্প-বলিয়েরা একে-একে ঢলে পড়ত একাগ্র ঘুমে আর কেবল ক্লান্ত জিভ নেড়ে-নেড়ে ফিস্ফিস করে কী যেন একটা বলতে থাকত, আমাদের ছেলেমেয়েরা তখনই আরম্ভ করত তাদের নিজেদের গল্প।

এই রকম একটা দলে সব সময়েই পাওয়া যেত ভেত্কোভ্স্কিকে। গল্প-বলিয়ে হিসেবে কলোনিতে খ্যাতি ছিল তার। সব সময়েই গল্প শোনার জন্যে তার কাছে বড় একদল শ্রোতা জুটে যেত। ভেত্কোভ্স্কি শুরু করত:

'কতই-না তাজ্জব জিনিস আছে দুনিয়ায়। আমরা সব এক জায়গায় চাপ্যে বস্যে থাকি আর কিছুই দেখি না জেবনে। কিন্তু দুনিয়ায় এমন অনেক ছোঁড়া আছে যারা কোনো জিনিস নিজির চোক্ষি না দেখ্যে ছাড়ে না। এই কিছুদিন আগে অদের একজনার সাথে দেখা হইছিল আমার। সে-ছোঁড়া কাস্পিয়ান সাগরে গেছিল, তারপর সারা ককেশাস ঘুরি বেড়ায়্যেছিল। তা সে কয়্যেল, সেখেনে নাকি এট্টা পাহাড়ি খাদ আরেট্টা পাহাড় পাশাপাশি আছে। জায়গাটার

নাম নাকি 'ঈশ্বর আমারে পার করি দ্যাও!' এর কারণ, খাদটা পার হবার আর কোনো পথ নাই মাত্তর ওই এট্টা পথ ছাড়া। বোঝলে, ওই পাহাড়টা ডিঙ্গানো ছাড়া আর পথ নাই। কিছু-কিছু লোক পাহাড় ডিঙ্গাত্যে পারে, আবার অনেকে পারে না। কারণ কি, পাহাড়ের উঁচা থেক্যে সব্বদাই বড়-বড় পাথর গড়ায়্যে পড়ত্যেছে। যতক্ষণ তমার মাথায় পাথর পড়ত্যেছে না ততক্ষণ ঠিক আছে, কিন্তু যদি একবার মাথায় পাথর পড়ে তাইলে তমারে সিধা খাদের মধ্যি সেঁধোতি হবে-নে, কেউ আর তমার টিকিটি খুঁজি পাবে না।'

ওর কাছে দাঁড়িয়ে সেদিন মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনছিল জাদোরভ, আর একই রকম মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ছিল ভেত্‌কোভ্‌স্কির নীল চোখের গভীরে।

হঠাৎ সে বলল, 'তুই নিজে সেখানে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দ্যাখ-না কেন, কোস্তিয়া? হয়তো ঈশ্বর তোকেও পার করে দেবেন'খন।'

শুনে অন্য ছেলেরা চুল্লীর আগুনের লাল আভা-লাগা তাদের মাথাগুলো জাদোরভের দিকে ঘোরাল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করে কোস্তিয়া বলল:

'তুই কিছু বুঝিস না, শুর্‌কা। সবকিছু নিজির চোক্ষি দেখা ভারি মজাদার ব্যাপার। আমি যার কথা কতিছি সেই ছোঁড়াডা ওখেনে গিয়্যেল...'

স্বভাবসিদ্ধ অদম্য, বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে জাদোরভ বলল:

'আমি হলে ছোঁড়াটাকে ওছাড়া আরও কিছু কথা জিজ্ঞেসা করতাম... এই বাচ্চারা, ধোঁয়া বেরনোর নলের মুখটা বন্ধ করা দরকার।'

'কী তারে জিজ্ঞেসা করতিস তুই, শুনি?' গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে প্রশ্ন করল ভেত্‌কোভ্‌স্কি।

ধোঁয়া বেরনোর নলের মুখে ঢাকাটা ছড়ছড় শব্দে বন্ধ করছিল যে-ছেলেটি ব্যস্তসমস্তভাবে, জাদোরভ তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

বলল, 'আমি তাকে গুণনের নামতা জিজ্ঞেসা করতাম, আবার কী। যতই যাই বলিস, ছোঁড়াটা আসলে বাজে ছেলে। সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, লোকের ঘাড়ে চেপে খাচ্ছে, আর বড় হয়ে উঠছে পাঁড় মুখ্যু হয়ে — ছোঁড়া বোধহয় এমন কি লিখতে-পড়তেও জানে না। 'পার করে দাও', তাই বটে! ওর মতো গাধাদের মাথা পাথর পড়ে ভাঙাই উচিত। ওই পাহাড়টাকে ওদের মাথা ভাঙার জন্যে মতলব করেই ওখানে বসানো হয়েছে!'

ছেলেরা হেসে উঠল। কে একজন পরামর্শ দিল:

'তার থেক্যে তুমি আমাদের সাথে থাক্যেই যাও, কোস্তিয়া! তুমি তো আর গাধা না!'

অপর একটা চুল্লীর সামনে মেঝের ওপর বসে পা দুটো অনেকখানি ফাঁক করে ছড়িয়ে দিয়েছিল সিলান্তি। আগুনের আভায় টেকো মাথাটা ওর জ্বলজ্বল করছিল। ও-ও ফেঁদে বসেছিল এক দীর্ঘ দশগজি গপ্পো।

'...আমরা ভাবলাম বুঝি, যারে কয়, সবকিছু ঠিক আছে। লোকটা কাঁদাকাটি করত্যেছিল আর আমাদেরে চুমো দিতেছিল; কিন্তু যেই নিজির আপিসে গিয়ি সেঁধোল্য অমনে ইতর লোকডা নষ্টামি শুরু কর্যে দিল। সারা শহরে অর কুত্তাগুলানরে লেলায়্যে দিল, এ-ই করল আর-কি। আর পরদিন সকালে কী দ্যাখলাম? — না, ঘোড়সওয়ার পুলিশ ঘোরত্যেছে আর পেত্যেকে কত্যেছে আমাদের নাকি বেতায়্যে লাশ করা হবে। কিন্তু আমাদের পাতলুন খুলি নেয়া হবে আর ওই সব কাণ্ডমাণ্ড করা হবে এইডা আমার ভাইয়ের আর আমার, যারে কয়, ভালো ঠেকল্য না। আমার সাধের ছুঁড়িডার জান্য একবার দুঃখু হল্য. বোঝেন তো ব্যাপারখান কী! তা, আবার মনে-মনে ভাবলাম: 'নাঃ, অরা কি আর মেয়্যাছেলার গায়ে হাত তোলবে...''

সিলান্তির পেছনে মেঝের ওপর খাড়া হয়ে ছিল কালিনা ইভানভিচের 'ভালেন্‌কি'-জোড়া। আর তার ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল কালিনা ইভানভিচের পাইপের ধোঁয়া। পাইপ থেকে ধোঁয়ার স্রোতটা অতঃপর নেমে যাচ্ছিল চুল্লীর দিকে, তবে তার আগে তীব্র একটা বাঁক নিয়ে খুদে একজন ছেলের গোলাকার মাথার দু'দিকে কানের দু'পাশ দিয়ে সাঁড়াশির মতো ভাগ হয়ে যাচ্ছিল দুটো ধারায়। তারপর ব্যগ্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল চুল্লীর উত্তপ্ত ভাপের মধ্যে। সিলান্তিকে মাঝপথে বাধা দিয়ে আমার দিকে চোখ টিপে কালিনা ইভানভিচ হঠাৎ বলে উঠল:

'হি-হি-হি! কও দেখি, সিলান্তি, সত্য কথা কও দেখি — তোমার ঠ্যাঙ দুইটা যেখান থেইক্যা বাইরাইয়াছে রক্তশোষা পরগাছাগুলা সেই জাগাটায় ব্যাত দিছে কিনা। দিছে কি দ্যায় নাই, কও?'

মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিল সিলান্তি, তারপর মেঝেয় প্রায় গড়িয়ে পড়ে হো-হো করে হাসতে লাগল।

'তা যা কয়েলেন কালিনা ইভানভিচ, তা দেছে ঘা-কতক!.. আর তাও কিনা এক ছুঁড়ির জন্যি। চুলায় যাক সে!'

আর এইভাবে গল্পগুজবের গুন্‌গুন্‌নি স্রোতের মতো বয়ে চলল অন্যান্য চুল্লীকেও ঘিরে, ক্লাসরুমগুলোয় এবং অন্যান্য ঘরেও। ভের্‌শ্‌নেভ আর কারাবানভকে যে লিদচ্‌কার ঘরে পাওয়া যাবে, এ আমি নিশ্চিত জানতুম। জানতুম, লিদচ্‌কা তাদের চায়ের সঙ্গে জ্যাম খেতে দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল চা খেতে পাওয়া সত্ত্বেও কারাবানভের ওপর চটে উঠতে ভের্‌শ্‌নেভের বাধা হচ্ছে না।

তুত্‌লে-তুত্‌লে বলছিল ভের্‌শ্‌নেভ, 'ঠি-ঠিক আছে! ঠি-ঠিক আছে! দিন নাই, রাত নাই, ত-তর তো খালি ঠা-ঠাট্টা-তামশা লা-লাগ্যেই আছে, আর কিছু না। ক-কবে থেক্যে তুই ভা-ভা-ভাবনা-চিন্তা শু-শুরু করবি, ক' দেখি?..'

'ক্যানে, চিন্তা করার আবার আছেডা কী? বউ কিংবা একজোড়া বলদ আছে তর? কিংবা তর ভাণ্ডারগুলান মালপত্তরে ঠাসা? তা থাকলি আবার চাই কী? আবার কিসির চিন্তা? খায়্যে-দায়্যে বাঁচ্যে থাক্‌, তাইলেই হল্য!'

'আরে, জে-জেবন সম্পক্কে ভাবনা ক-করতি লাগব্যে না? আচ্ছা ম-মজার ছোঁড়া তো!'

'তুই এট্টা বুদ্ধু, বুঝলি কোল্‌কা? আর কিছু না, তুই হলি গে সেরেফ বুদ্ধু!' এবার চেঁচিয়ে বলল কারাবানভ। 'তর ধারণা, চিন্তা করা মানে, আরামকেদারায় বসি সামনের দিকি হাঁ কর‍্যে থাকায়্যে থাকা। কিন্তু যার মগজে ঘিলু আছে সে-ই চিন্তা করি থাকে, তা সে যে করিই হোক। একমাত্তর তর মতন মানুষিরই চিন্তা শুরু করার আগি মনের ইঞ্জিনি কয়লা দেয়া লাগে...'

'আঃ, নিকলাইকে খেপাচ্ছ কেন?' বাধা দিয়ে এবার লিদচ্‌কা বলল। 'ও যদি ওইভাবে চিন্তা করতে চায় তো করুক না — বলা যায় না, ওভাবেও তো ও কিছু পেয়ে যেতে পারে।'

'কে? কোল্‌কা পায়্যে যাবে? তবেই হয়্যেছে! আপনে জানেন কোল্‌কা কী চিজ? ও একখান বাচ্চা যিশু! ও 'সত্যের সন্ধান' করি ফিরত্যেছে। এমন পাঁড় বুদ্ধু একখান দেখ্যেছেন নি জেবনে? ও নাকি সত্যেরে খুঁজ্যে পেতি চায়! সত্য দিয়ি ও বোধকরি বুটজুতায় কালি লাগাব্যে।'

কিন্তু লিদচ্‌কার ঘর ছেড়ে যখন দু-জনে বেরোল তখন সেমিওন আর কোল্‌কা প্রাণের বন্ধু। গলা ছেড়ে তখন গান ধরেছে সেমিওন, আর পরম

স্নেহে একটা হাত দিয়ে সেমিওনের কোমর জড়িয়ে ধরে কোল্‌কা তখনও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। সোৎসাহে তুত্‌লে-তুত্‌লে বলছে:

'যে-যে-যেহেতু বি-বিপ্লব হয়্যে গেছে আ-আ-আমাদের এখেনে, তাই স-স-সবকিছু ঠিকভাবে ক-করা উচিত, বুঝলি?'

আমার দরিদ্র-কুটিরেও তখন অতিথির সমাগম ঘটত। ওই সময়ে আমার বৃদ্ধা মা আমার কাছে থাকছিলেন। শান্ত, স্বচ্ছ মেঘের ওড়নায় ঢাকা তাঁর জীবনের স্রোত তখন সায়াহ্নের মোহানায় এসে মিলছিল। কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা তাঁকে 'ঠাকমা' বলে ডাকত। মিত্‌কা জেভেলির ছোট ভাই শুর্‌কা জেভেলি তখন প্রায়ই ঠাকমার কাছে আসত। শুর্‌কার ছিল সাংঘাতিক চোখা নাক। অনেকদিন থেকেই কলোনির বাসিন্দা হয়ে ছিল সে, কিন্তু আকারে বাড়ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। তবে তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ক্রমশ চোখা হতে-হতে শেষপর্যন্ত সারা দেহটা বেশ কয়েকটা খাড়াই বিন্দুর সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছিল — নাকটা চোখা, কান দুটো চোখা, থুতনিটা চোখা, এমন কি চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ধারালো।

সব সময়েই শুর্‌কা কোনো-না-কোনো অদ্ভুত ধরনের ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকত। বাগানের বহুদূরের একটা ঝোপের মধ্যে ওর ছিল পাতলা কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো একটা ছোট্ট ঘর, আর তার মধ্যে থাকত একজোড়া খরগোশ। আবার মাটির নিচের কয়লা মজুত করার ঘরে ও পুষত একটা দাঁড়কাকের ছানা। কম্‌সমোল-সদস্যদের সাধারণ সভায় কখনও-কখনও শুর্‌কার নামে এইমর্মে অভিযোগ উঠত যে সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে একটা 'পশুপালন খামার' চালাচ্ছে এবং তার উদ্দেশ্য হল পশুপাখি বিক্রির ব্যাবসা করা। কিন্তু শুর্‌কা প্রবলভাবে এই অভিযোগ খণ্ডন করত, আর তা করতে গিয়ে খুব একটা ভদ্রতারও পরিচয় দিত না।

'ঠিক আছে, আয়, পের্‌মান কর্‌-না দেখি যে আমি কিছু বিক্রিবাটা করেছি! আমাদের কিছু বিক্রি করতি দেখ্যেছিস কোনোদিন?'

'তাইলে তুই ট্যাকা পাস কোথ্যেকে?'

'কিসির ট্যাকা?'

'গতকাল তুই লেবেঞ্চুস কেনার পয়সা পেলি কোথ্যেকে, শুনি?'

'অরে কি পয়সা কয় নাকি? ঠাকমা আমারে বলে দশ কোপেক দিইছিল।'

সাধারণ অধিবেশনে অবশ্য ঠাকমার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার ছিল না।

সব সময়েই দেখা যেত গুটিকয়েক বাচ্চা ছেলে ঘিরে আছে ঠাকমাকে। কখনও-কখনও তাঁর ছোটখাট ফুট্‌ফরমায়েশ খাটতে তারা গন্‌চারোভ্‌কা গাঁয়ে পর্যন্ত দৌড়ত, তবে সে-সব সময়ে আমার চোখ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত তারা। এবং যখন তারা এ-বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হোত যে আমি ব্যস্ত আছি আর খুব শিগ্‌গির ঘরে ফিরছি না, তখন দু-তিনজনের ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা এসে ঠাকমার টেবিলের চারপাশে ভিড় জমাত, চা খেত, কিংবা আমার জন্যে ঠাকমা যে ভাপে-সেদ্ধ ফল তৈরি করে রেখেছেন অথচ আমার তা খাওয়ার সময় হয়ে ওঠে নি তা-ই শেষ করত বসে-বসে। বৃদ্ধ বয়সের দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্যে ঠাকমা এমন কি তাঁর কচি সঙ্গীসাথীদের সকলের নাম পর্যন্ত মনে রাখতে পারতেন না। কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যেও শুর্‌কার নামটি তাঁর ঠিক খেয়াল থাকত, কারণ শুর্‌কা ছিল পুরনো কলোনি-বাসিন্দা এবং ওই ছেলেপিলেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও সবথেকে বাচাল।

যেদিনের কথা বলছি শুর্‌কা সেদিন ঠাকমার কাছে এসেছিল একটা অত্যন্ত বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কারণে।

'সুপ্রভাত!'

'সুপ্রভাত, শুর্‌কা! এ-কয়দিন ছিলি কনে? অসুখবিসুখ করে নাই তো?'

ইতিমধ্যে একখানা টুলের ওপর চেপে বসে তার নতুন সুতী-কাপড়ের ট্রাউজার্সের হাঁটুর ওপরে একদা শাদা ছিল এমন মাথার টুপির কানাত দিয়ে আস্তে-আস্তে চাপড় দিচ্ছিল শুর্‌কা। ওর ছিল শণের রঙের খোঁচা-খোঁচা একমাথা চুল। বোঝা যাচ্ছিল, চুল কাটার সময় অনেকদিন পার হয়ে গেছে। চোখা নাকটা ওপর দিকে তুলে ঘরের নিচু ছাদটা পর্যবেক্ষণ করতে-করতে শুর্‌কা জবাব দিল:

'না, আমার অসুখ হয় নাই। কিন্তু আমার খরগোশডার হয়েছে।'

বিছানার ওপর বসে ঠাকমা তখন তাঁর কাঠের বাক্সটার মধ্যে তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকাংশই থাকত ওই বাক্সের মধ্যে — যেমন, পশমী কাপড়ের টুকরোটাকরা, সুতোর গুলি, পশমের গোল্লা, অর্থাৎ ঠাকুরমাদের সম্পত্তি বলতে যা-কিছু বোঝায় সে-সবই।

'তর খরগোশের অসুখ হয়েছে? আহা, বেচারা! তর তো কষ্ট হবেই!'

'তা, কী আর করা যায় কন', গম্ভীরভাবে শুর্‌কা মন্তব্য করল। ওর কোঁচকানো ডান চোখটায় মনের উদ্বেগ চাপা থাকছিল না।

'তা, চেষ্টা করি অরে ভালো করো তোল্-না ক্যানে?' এবার শুর্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকমা বললেন।

জবাবে ফিস্ফিস করে শুর্কা বলল, 'ভালো করব্য কী দিয়ি? কিছু নাই তো!'

'ঔষধ চাই তর?'

'যদি কিছু মকাইদানা যোগাড় করতি পারতাম -- আধ গেলাস আন্দাজ, তাইলি হোত্য!'

ঠাকমা বললেন, 'চা খাতি চাস, শুর্কা? তাইলে, দ্যাখ দেখি উনানের উপর কেট্লিডা বসান আছে, আর গেলাসগুলান আছে ওদিক। নামা দেখি, আর আমারেও অল্প এট্টু চা দিস।'

টুলের ওপর সাবধানে টুপিটা রেখে উঁচু উনোনের সামনে ডিঙি মেরে-মেরে আনাড়ির মতো চায়ের যোগাড় করতে লাগল শুর্কা। ওদিকে ঠাকমাও কিছুটা কষ্ট করে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকের ওপর থেকে একটা গোলাপিরঙের থলে পাড়লেন। থলেটায় তাঁর ভুট্টাদানার সঞ্চয় থাকত।

কোজিরের আস্তানা, বা গাড়ির চাকা বানানোর কারখানা-ঘরটা ছিল সবচেয়ে আমুদে আর হৈ-হল্লাবাজ ছেলেদের মেলবার জায়গা। ওই ঘরে কাজ করত কোজির, আবার ঘুমোতও। ঘরখানার একটা কোণে ছিল নিচুমতো, আমাদেরই হাতে-তৈরি একটা উনোন, আর উনোনের ওপব চাপানো থাকত একটা কেট্লি। ঘরের আরেক কোণে ছিল মুড়ে রাখার উপযোগী একখানা কল্যাপসিব্ল খাট। খাটখানা ঢাকা থাকত নানা রঙের চিত্রবিচিত্র-করা একখানা লেপ দিয়ে। কোজির নিজে বসত ওই খাটখানায়, আর তার অতিথিরা চেপে বসত যেখানে-সেখানে — জমা-করা কাঠের কুঁদো, কারিগরি কাজের যন্ত্রপাতি, স্তূপাকার চাকার বেড় — সবকিছুর ওপর। সারা জীবন ধরে কোজির ধর্মবিশ্বাসের যে মস্ত পুঁজি জমিয়েছিল নিজের মধ্যে, অতিথিরা সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করত তা থেকে কিছু-কিছু নিঙ্ড়ে বের করতে।

বিষণ্ণভাবে হাসত কোজির। বলত:

'এয়া অন্যায়, খোকারা, এয়া অন্যায় -- ভগমান আমাদিগে ক্ষ্যামা করেন! পরভু রাগ করবেন!..'

কিন্তু 'পরভু' তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করার আগেই কখনও-কখনও কালিনা

ইভানভিচ উঠত চটে। দরজার অন্ধকার ফোকরটা থেকে সে ঘরের আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াত, তারপর তামাকের পাইপটা নাড়তে-নাড়তে উত্তেজিতভাবে বলত:

'বুড়া মানুষিরে লইয়া হাসি-মশ্‌করা জোড়ছ কিসের লেগ্যে? যিশু খ্রীস্টরে লইয়্যা তোমাগো কাজটা কী, শুনি? এমন শিক্ষা দিমু তোমাগোরে যে শুধা যিশু খ্রীস্ট ক্যান সন্ত নিকলাসের পায়ে পইর‍্যাও কূল পাবা না, এই কইয়া দিলাম!'

'বুড়া মানুষিরে বাঁচানোর জন্যি পরভু আপনেরে কির্‌পা করবেন, কালিনা ইভানভিচ!'

'তমারে লইয়্যা ফের এমনধারা মশ্‌করা জোড়লি আমারে গিয়া কইও, বোঝলা? আমারে ছাড়া তুমি এই বাউণ্ডুল্যাগো শায়েস্তা করবার পারবা না — তমার ওই যিশু খ্রীস্টগো উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই!'

ছেলেরা ভাব দেখাত যেন কালিনা ইভানভিচকে দেখে তারা ভয় পেয়েছে। চাকা বানানোর কারখানা-ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে তারা কলোনির কোণে-কোণে ছড়িয়ে পড়ত। ফৌজী ব্যারাক-বাড়ির মতো এজমালি শোবার ঘর আর ব্যবহার করছিলুম না আমরা। আমাদের ছেলেপিলেরা সে-সময়ে ছয় থেকে আট জন করে একেকটা ছোট ঘরে শুচ্ছিল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে ছেলেমেয়েরা তাদের ছোট-ছোট গোষ্ঠীগুলোকে সংহত করে তোলার সুযোগ পেয়েছিল, ফলে প্রতিটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সময়ে আর তাদের সঙ্গে কাজ করাটাও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে আমাদের একাদশতম বাহিনীটি গঠিত হয়। অনেকদিন ধরে গেওর্গিয়েভ্‌স্কির একটানা উপরোধ-অনুরোধের ফলে অপেক্ষাকৃত বাচ্চাদের নিয়ে গড়ে ওঠে এই বাহিনী। আগের মতো গেওর্গিয়েভ্‌স্কি তখনও বাচ্চাদের তদবির-তদারক করত। তাদের পরিচর্যা করত, স্নান করিয়ে দিত, তাদের সঙ্গে খেলত আবার বকাঝকাও করত, মায়ের মতো প্রশ্রয় দিত তাদের। আর এ-কাজে ওর উৎসাহ আর ধৈর্য দেখে অন্য ছেলেদের অপেক্ষাকৃত অ-নমনীয় হৃদয় ভরে উঠত বিস্ময়ে। গেওর্গিয়েভ্‌স্কি যে ইর্‌কুত্‌স্কের শাসনকর্তার ছেলে এই সাধারণ বিশ্বাস থেকে অন্যদের মনে যে-তিক্ততা সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিল, তার এই চমৎকার কাজের ফলে তা অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল।

কলোনিতে ইতিমধ্যে নতুন-নতুন শিক্ষকেরও আমদানি ঘটেছিল। তখনও পর্যন্ত আমি ধৈর্যসহকারে খাঁটি মানুষের সন্ধানে ফিরছিলুম, আর তার ফলে তেমন কিছু বলা-কওয়ার মতো না হলেও শিক্ষা-বিভাগের এ-ধরনের সংরক্ষিত বাহিনীর মধ্যে থেকে কিছু-কিছু পছন্দসই মানুষ ছেঁকে তুলতে সমর্থ হয়েছিলুম। পাভেল ইভানভিচ জুর্বিনকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম শহরতলিতে শিক্ষকদের যৌথ সব্জি-বাগানে; সেখানে পাহারাওলার কাজ করতেন তিনি। রীতিমতো শিক্ষিত, সহৃদয়, নিয়মনিষ্ঠ পাভেল ইভানভিচ ছিলেন সুখেদুঃখে নির্বিকার মানুষ আর একেবারে খাঁটি ভদ্রলোক। তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমার খুবই পছন্দ হোত — তা হল মানুষের চরিত্র অনুধাবনে তাঁর বিশেষজ্ঞসুলভ আনন্দ। নমুনা-সংগ্রাহকের প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে মানবিক মনস্তত্ত্বের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম জটিল সব প্যাঁচ, মানুষের বীরত্বের মহিমা আর নীচতার অতলস্পর্শী অন্ধকার-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় মেতে উঠতেন তিনি। এই সমস্ত বিষয়ে তো প্রচুর ভাবনাচিন্তা তিনি করেই ছিলেন, তদুপরি নতুন যৌথ জীবনের অনুকূল মনোভাবের সাধারণ সূত্রের কোনো লক্ষণ দেখা যায় কিনা তার সন্ধানে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ধৈর্য ধরে তন্নতন্ন করে পর্যবেক্ষণও চালাতেন। যদিও বুঝতুম যে তাঁর অ-পেশাদারসুলভ পল্লবগ্রাহী এই উৎসাহের ফলে শেষপর্যন্ত কিছুই লাভ হবে না, তবু মানুষটির আন্তরিকতা ও শুদ্ধ চরিত্র আমার ভারি পছন্দ ছিল।

আমার অপর একটি আবিষ্কার ছিল জিনোভি ইভানভিচ বুত্সাই। এঁর বয়স ছিল আন্দাজ সাতাশ বছর এবং সবেমাত্র আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছিলেন। শিল্পী হিসেবে সুপারিশ করে কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল এঁকে। আমাদের ইশ্কুল, থিয়েটর হল এবং কম্সমোলের নানা ধরনের কাজের জন্যে একজন শিল্পীর দরকার ছিল।

শারীরিক ও চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের নানা ধরনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ফলে জিনোভি ইভানভিচ আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি ছিলেন অসম্ভব রোগা, অসম্ভব কালো, আর কথা বলতেন এমন অসম্ভব বাজখাঁই হেঁড়ে গলায় যে তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথাবার্তা চালানো শক্ত হয়ে পড়ত। মনে হোত যেন তাঁর গলা থেকে অতিবেগুনি ধ্বনিতরঙ্গ নিঃসৃত হচ্ছে। এছাড়া পরম শান্ত ও নির্বিকার, অবিচল ভাবভঙ্গির জন্যেও বিশিষ্ট ছিলেন জিনোভি ইভানভিচ। এক নভেম্বর মাসের শেষদিকে তিনি আমাদের কলোনিতে এলেন।

কী ধরনের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন তিনি সমৃদ্ধ করে তোলেন তাই দেখার জন্যে সবাই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। কিন্তু হাতে ড্রইং-পেন্সিল তুলে নেবার আগেই তাঁর শিল্পী-স্বভাবের অপর একটি দিকের পরিচয় দিয়ে জিনোভি ইভানভিচ আমাদের রীতিমতো তাজ্জব বানিয়ে দিলেন।

তিনি আসার অল্প কয়েকদিন পরেই ছেলেরা আমায় খবর দিলে যে প্রতিদিন সকালে শুধু ওভারকোটটি কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে কলমাকে স্নান করতে যান। এদিকে নভেম্বরের শেষেই কলমাকের জল জমে যেতে শুরু করেছিল, আর অল্পদিনের মধ্যে তা পরিণত হয়েছিল কলোনির স্কেটিং-চত্বরে। কিন্তু অত্‌চেনাশের সাহায্যে সেই জমাট বরফের মধ্যে একেকটা গর্ত বানিয়ে নিয়ে জিনোভি ইভানভিচ প্রতিদিন তাঁর সেই ভয়ংকর স্নানপর্ব চালিয়ে যেতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাও নিলেন অবশ্য। রোগে ভুগলেন দিন-পনেরো। তারপর যে-মুহূর্তে সুস্থ হয়ে উঠলেন সেই মুহূর্ত থেকে আবার গর্তে সেঁধতে শুরু করলেন। ডিসেম্বর মাসে তাঁকে ব্রঙ্কাইটিসে ধরল, কিছুটা বাড়াবাড়িও হল। পড়ানোর কাজে অনবরত অনুপস্থিত থাকতে আর আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচি উলটেপালটে দিতে লাগলেন বুত্‌সাই। অবশেষে একদিন আর ধৈর্য রাখতে না-পেরে তাঁকে এই অর্থহীন ছেলেখেলা বন্ধ করতে অনুরোধ জানালুম।

শুনে কর্কশ গলায় জবাব দিলেন জিনোভি ইভানভিচ:

'স্নান করার প্রয়োজন আছে মনে করলেই আমি স্নান করতে পারি, সে অধিকার আছে আমার! শ্রম-আইনে এটা তো নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া অসুস্থ হবারও অধিকার আছে আমার, কাজেই কেউ আমার বিরুদ্ধে সরকারিভাবে কোনো অভিযোগ আনতেও পারেন না।'

আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'ভাই জিনোভি ইভানভিচ, আমি মোটেই সরকারিভাবে আপত্তি তুলছি না। আমার বক্তব্য, আপনি শুধু-শুধু নিজেকে পীড়ন করছেন কেন? মানুষ হিসেবেই আমি আপনার কথা ভেবে দুঃখবোধ করছি।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাখ্যা হিসেবে আমি বলতে পারি, আমার স্বাস্থ্য ভালো নয়, ধাত আমার খুবই বাজে। এই ধরনের স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকা সত্যিই বিরক্তিকর, বুঝলেন। তাই আমি এক কঠিন সংকল্প নিয়েছি — হয়

শরীরটাকে শক্তপোক্ত করে তুলব যাতে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি, আর তা না হলে, গোল্লায় যাক শরীর, চুলোয় যাক সব! গত বছর চার-চারবার প্ল্যুরিসি হয়েছিল আমার, আর এ-বছর (এখনই তো ডিসেম্বর মাস এসে গেছে) প্ল্যুরিসিতে ভুগলাম মাত্র একবার। আমার মনে হয় না এ-বছর বার-দুয়েকের বেশি প্ল্যুরিসি হবে। আমি ইচ্ছে করেই কিন্তু আপনাদের এখানে কাজ নিয়েছি, হাতের কাছে এখানে নদী আছে, তাই।'

সিলান্তিকে ডেকে পাঠিয়ে আমি রাগারাগি করতে লাগলুম:

'বলি, এসব আবোলতাবোল কান্ডকারখানার অর্থটা কী? অ্যাঁ? একটা লোকের মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে আর তুমি বেমালুম তার জন্যে বরফে গর্ত খুঁড়ে চলেছ?'

কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সিলান্তি বললে:

'রাগ কর ক্যানে, আন্তন সেমিওনভিচ! আমি করি কী, কও দেখি! এর আগি এমনিধারা আরও একজন লোকির সাথে আমারে মোকাবিলা করতি হয়্যেছেল... লোকটা-না মরতি চাইছিল, বোঝলে। মনে-মনে ঠিক কর্য়েছিল সে যে জলে ডুবি মরব্যে। যে-মুহুত্তে তার দিকি পিছন ফিরি সেই মুহুত্তে সে নদীতে গিয়ি নামে -- সেই গন্দভডা। বারে বারে তারে জল থেক্যে টান্যে তুলতি-তুলতি একবারে, যারে কয়, হিমসিম খায়্যে গ্যালাম। তারপর কী হল্য কও দেখি? — শেষমেষ হতভাগাডা গিয়ি গলায় দড়ি দিল। আর সে যে গলায় দড়ি দিতি পারে, সে-কথাডাই আমার মাথায় আসে নাই। তাইলে বোঝতিছ, ব্যাপারখান কী! তাই আমি আর এ-লোকডার সাথে নিজিরি জড়াত্যে চাই নাই। এই হল্য গে ব্যাপার!'

একেবারে মে মাস পর্যন্ত জিনোভি ইভানভিচ বরফ ফুটো-করা গর্তে স্নান চালিয়ে গেল। ছেলেরা প্রথম-প্রথম এই ক্ষীণজীবী লোকটির অসঙ্গত দুঃসাহস দেখে হাসত। তারপর ক্রমশ তারা ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করতে শুরু করল এবং প্ল্যুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস ও সর্দিজ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকার সময় ধৈর্য ধরে ওঁর সেবাশুশ্রূষাও করতে লাগল।

কিন্তু এর ফাঁকে-ফাঁকে এমন একটানা কয়েক সপ্তাহ করে কাটতে লাগল যখন জিনোভি ইভানভিচের দেহযন্ত্র দৃঢ়ীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জ্বরজারি সঙ্গী হোত না, আর তখন তাঁর যথার্থ শিল্পী-স্বভাব আত্মপ্রকাশ করত। ফলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত একটি শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠল কলোনিতে

এবং গোষ্ঠীর সদস্যরা ছাদের ওপর ছোট একটি ঘরও পেয়ে গেল। ঘরটায় তারা স্টুডিও বানিয়ে নিল।

সামাজিক মেলামেশার পক্ষে অনুকূল শীতের সন্ধেগুলোয় বুত্সাইয়ের স্টুডিওতে কাজকর্ম চলতে লাগল প্রবল উৎসাহে, আর চিলেকোঠার দেয়ালগুলো কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল শিল্পীদের আর মুগ্ধ দর্শকদের সম্মিলিত হাস্যরোলে।

মস্ত বড় একটা তেলের বাতির আলোয় কয়েকজনে মিলে সেদিন প্রকাণ্ড একখানা ছবি আঁকায় ব্যস্ত ছিল। আঁকার তুলির হাতল দিয়ে কালো কুচকুচে মাথাটা চুলকোতে-চুলকোতে জিনোভি ইভানভিচ গাঁক্‌গাঁক্‌ করে বলে উঠলেন (মদ্যপানের হুল্লোড় থেকে সামলে ওঠার পর ঐকতান গায়কদলের মূল গায়েন যেভাবে কথা বলে সেইভাবে):

'ফেদরেঙ্কোর গায়ে কিছু সিপিয়া* চড়াও দেখি! ও হল গিয়ে মুজিক, আর তোমরা ওকে একেবারে ব্যবসাদারের গিন্নি বানিয়ে ছেড়েছ… এই ভান্‌কা, দরকার থাক বা না-থাক, তুই দেখি ক্যাটকেঁটে লাল রঙ খালি লাগাচ্ছিস তো লাগাচ্ছিসই!'

গায়ে ছিটে-দাগওয়ালা, হলুদবর্ণ, চাপা-নাক ভান্‌কা লাপত জিনোভি ইভানভিচের নকল করে একই রকম ফ্যাঁসফেঁসে হেঁড়ে গলায় জবাব দিল:

'সিপিয়ার সবটুক আমি লেশির গায়ি মাখায়্যে খরচ কর‍্যে ফেল্যেছি।'

কোনো-কোনো সন্ধেয় আবার আমার অফিস-ঘরখানাও রীতিমতো হৈ-হল্লার আসর হয়ে দাঁড়াত। ওই সময়ে খার্‌কভ থেকে দুটি ছাত্রী এসে হাজির হয়েছিল কলোনিতে। তাদের হাতে ছিল একখানা কাগজ। তাতে লেখা:

'খার্‌কভের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিট্যুট মাক্সিম গোর্কি কলোনিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা-সংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার জন্যে কমরেড কা. ভার্‌স্কায়া ও কমরেড এর. লান্ড্‌স্‌বের্গকে পাঠাচ্ছে।'

তরুণ, উঠতি শিক্ষককুলের এই দুই প্রতিনিধিকে পরম কৌতূহলের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালুম। কা. ভার্‌স্কায়া ও এর. লান্ড্‌স্‌বের্গ দু-জনেই ছিল

* কালচে বাদামি রঙ। -- অনুঃ

ঈর্ষণীয় রকমের তর‍ুণ, দ‍ু-জনের কারও বয়স কুড়ি বছরের বেশি হবে না। কা. ভার্স্কায়া ছিল মিষ্টি চেহারার, গোলগাল, ফর্সা একটি মেয়ে; আকারে ছোটখাট আর সক্রিয়। তার ম‍ুখে এমন একটা নরম, স‍ূক্ষ্ম রঙের ছোঁয়া লেগে থাকত, একমাত্র জলরঙ ছাড়া যা উপয‍ুক্তভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। অনবরত তার স‍ূক্ষ্ম, প্রায়-অদৃশ্য ভুর‍ুদ‍ুটি ক‍ুঁচকিয়ে তুলে এবং বারবার ঠোঁটে ভেসে-ওঠা হাসিটিকে মনের জোরে চেষ্টা করে দাবিয়ে রেখে মেয়েটি আমাকে রীতিমতো জেরা করা শ‍ুর‍ু করল:

'আপনাদের কি শিশ‍ুচরিত্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষাগার আছে?'

'না। আমাদের শিশ‍ুচরিত্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো পরীক্ষাগার নেই।'

'তাহলে? ব্যক্তিত্ব নিয়ে আপনারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান কী করে?'

'কার ব্যক্তিত্ব? বাচ্চাদের?' যতদ‍ূর সম্ভব গম্ভীরভাবে পালটা প্রশ্ন করল‍ুম।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব।'

'কেন? তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কী দরকার?'

'সে কী? এ ছাড়া আপনারা কাজ করেন কী করে? যে-সমস্ত উপাদান সম্পর্কে কিছ‍ুই জানেন না তা নিয়ে কি কাজ করা সম্ভব?'

রীতিমতো জোর আর আন্তরিক আবেগ মিশিয়ে আর কথায়-কথায় বন্ধ‍ুটির দিকে ফিরে তাকাতে-তাকাতে বাঁশির মতো স‍ুরেলা গলায় জেরা চালিয়ে গেল কা. ভার্স্কায়া। আর শ্যামলা রঙ, উজ্জ্বল কালো চুলের বিন‍ুনি-দোলানো এর. লান্ড্স্বের্গ ধৈর্যশীল প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাকে সংযত করে চোখ নিচু করে বসে রইল।

'আপনার রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন-কোন প্রধান চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য সবচেয়ে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে?' আবার প্রশ্ন করল কা. ভার্স্কায়া। ওর গলায় ফুটল কড়া সংকল্পের স‍ুর।

'কলোনিতে যদি শিশ‍ুচরিত্র অধ্যয়নই না-করা হয়,' এবার বাধা দিয়ে শান্তভাবে বলল এর. লান্ড্স্বের্গ, 'তাহলে প্রধান চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যগ‍ুলো নিয়ে কথা বলে লাভ কী!'

'ব্যাপারটা মোটেই তা নয়,' আমি গম্ভীরভাবে বলল‍ুম। 'প্রধান-প্রধান চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আমি তোমাদের কিছ‍ুটা বলতে পারি। তোমাদের

নিজেদের মধ্যে যে-প্রধান চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যগুলো সবচেয়ে লক্ষণীয় এদের মধ্যেও সেগুলো দেখা যাবে...'

'আমরা কী রকম তা আপনি কী করে জানলেন?' বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল কা. ভারস্কায়া।

'তোমরা কি আমার সামনে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছ না?'

'আচ্ছা? তো তাতে কী হল?'

'হল এই যে আমি তোমাদের একেবারে ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। তোমরা আমার সামনে বসে আছ ঠিক কাচের তৈরি পুতুলের মতো. আর তোমাদের মনের মধ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

কা. ভারস্কায়া হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আর ঠিক এই সময়ে কারাবানভ. ভেরশনেভ, জাদোরভ ও আরও কয়েকজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে।

'আমরা আসতি পারি কি? না. গোপন কোনো কথাবার্তা চলত্যেছে?'

বললুম. 'নিশ্চয়ই আসতে পার! এস. তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই -- এরা আমাদের অতিথি. খারকভের দু-জন ছাত্রী।'

'অতিথি! খুব ভালো কথা! তা. আপনেদের নাম?'

'ক্সেনিয়া রমানভ্না ভারস্কায়া।'

'রাখিল সেমিওনভ্না লান্ড্সবের্গ।'

হাতের চেটো দিয়ে নিজের গালে একটা চড় মেরে ভয়ের ভান করল সেমিওন কারাবানভ। বলল:

'হায় হায়, কনে যাব! তা, অত লম্বা-চওড়া হওয়ার দরকারডা কী? আপনে শুধুই অক্সানা. তাই না?'

'ঠিক আছে!' কা. ভারস্কায়া রাজি হয়ে গেল।

'আর আপনে তো -- রাখিল। অতে চলব্যে?'

'তোমার যেমন খুশি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল এর. ল্যান্ড্স্‌বের্গ।

'ঠিক আছে! তাইলে আমরা এখন আপনেদেরে রাতের খানা দিতি পারি। আপনেরা কি ছাত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'তা. গোড়াতিই সেকথা কন নাই ক্যানে? আপনেদের নিচ্চয়ই খিদা পায়্যেছে -- ওই-যে ভেরশনেভ আর জাদোরভ. অরা যারে কয় — কুত্তার

মতন আর-কি। তা, আমরা বলব — বিড়ালছ্যানার মতন। কেমন, তা বলতি পারি তো?'

অক্সানা হেসে উঠল: 'সত্যি বলতে কী, আমাদের খিদে পেয়েছে বটে। হাত-মুখ ধোয়ার কোনো জায়গা আছে এখানে?'

'আসেন! আপনেদের আমরা মেয়্যাদের হাতে তুলি দিব-নে। আপনেরা যা চান অরা সে-সবের বন্দোবস্ত করি দিবে।'

এইভাবে আমাদের প্রথম পরিচয়-পর্ব চুকল। এরপর প্রতি সন্ধেয় ওরা দু-জন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত বটে, তবে অল্প দু-চার মিনিটের জন্যে। শিশুচরিত্র অনুধাবন-বিষয়ে আগের সেই কথাবার্তা ওরা দ্বিতীয়বার আর জীইয়ে তোলে নি — কারণ অক্সানা আর রাখিলের তখন অত সময় ছিল না। বাচ্চারা ততক্ষণে ওদের দু-জনকে টেনে নিয়েছিল কলোনির কাজকর্ম, আমোদ-আহ্লাদ আর সংঘাতের অকূল সমুদ্রে, পরিচিত করে তুলেছিল বহুবিধ মৌল সমস্যার সঙ্গে। আমাদের ওই যৌথ জীবনে প্রায়-প্রায়ই যে-সমস্ত বড়ছোট ঘূর্ণির আবির্ভাব ঘটত কোনো জ্যান্ত মানুষের পক্ষে তার প্রবল টান এড়িয়ে থাকা শক্ত ছিল; পেছন ফিরে সরে যাওয়ার আগেই মানুষ তার আবর্তে পড়ে ভেসে চলে যেত। কখনও-কখনও এমনও ঘটত যে ওই ঘূর্ণিস্রোত কাউকে-না-কাউকে সোজা আমার অফিসে এনে ফেলত, যেন ছুড়ে ফেলে দিত ডাঙায়।

এইভাবে এক সন্ধেয় একটা মজাদার দল এসে আছড়ে পড়ল সেখানে। দলটাতে ছিল অক্সানা, রাখিল, সিলান্তি আর ব্রাত্চেংকো।

ঘরে ঢোকার সময় অক্সানা সিলান্তির জামার হাতা চেপে ধরে ছিল আর হাসতে-হাসতে বলছিল:

'এস-না, এস। অমন পিছু হটছ কেন বাপু?'

সিলান্তি সত্যিই পিছু হটার চেষ্টায় ছিল।

'লোকটি কলোনির মধ্যে মনোবল নষ্ট করার নীতি চালাচ্ছে, আর আপনি এটা লক্ষ্য করছেন না,' বলল অক্সানা।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী, সিলান্তি?'

চটেমটে নিজের জামার হাতাটা ছাড়িয়ে নিল সিলান্তি, তারপর টেকো মাথার ওপরটায় একবার হাত বুলোল।

বলল, 'ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে। উঠানে শ্লেজগাড়িখান পড়্যে

ছেল। তা, সেমিওন আর এই এনাদের মাথায় পোকা নড়ি ওঠল যে শ্লেজ দৌড় করায়ো বেড়াতি লাগবে। বোঝলে। তা, আন্তন... এই তো ও এখেনেই আছে! ও নিজিই বলুক-না ব্যাপারডা কী হয়েছেল।'

আন্তন বলল, 'ওরা বারবার আমারে পীড়াপীড়ি করতে লাগল — শ্লেজ হাঁকায়ো বেড়াতে যাব! তা, সেমিওনরে জিনের বেল্ট্ দিয়ি কষে এক-ঘা লাগাতে সে তো পালাল। কিন্তু এই এনারা দু-জনা কোনো কথা শুনতি রাজি না, খালি শ্লেজ ধরো টানাটানি জুড়ে দেলেন। তা, ভাবলাম করি কী? জিনের বেল্ট্ ব্যাভার করলি ওনারা তো কান্না জোড়বেন। আর তখন সিলান্তি ওনাদেরে বললে...'

'হ্যাঁ, এইটিই বলতে চাইছিলাম!' মর্মাহত অক্সানা চেঁচিয়ে উঠল। 'সিলান্তি নিজেই বলুক ও কী বলেছে!'

'তা এয়া নিয়ি এত হৈ-হামলার আছেডা কী?' সিলান্তি বলল। 'আমি ওনাদেরে সত্য কথাডা শোনায়ো দেলাম, এই আর-কি। আমি কলাম: 'তোমরা বিয়া করতি চাও, আর তাই শ্লেজগাড়ি ভাঙতি লেগ্যেছ।' ব্যাপারডা বোঝলে তো?..'

'না। ও-ই সব নয়! সব কথা কবুল কর নি তুমি!'

'আর কী কথা? মোটমাট ওই কথাই তো কলাম।'

'মোটেই না। আন্তনকে ও বলেছে: 'ওনারে শ্লেজে জুতি গন্চারোভ্কায় শ্লেজ টান্যো লয়ো যেতি বাধ্য কর দেখি, তাইলে এক লহমায় উনি শান্ত হয়ি যাবে-নে।' বল নি তুমি একথা?'

'কয়েছি তো হয়েছেডা কী! আমি তো আবার বলব — ওনারা সোমত্ত মেয়্যাছেলা, কিন্তু ওনাদের কাজকম্মো কিছু নাই, ইদিকি আমাদের যথেষ্ট ঘোড়া নাই, কাজেই কী করা উচিত বুঝি নেও!'

'উঃ,' খেপে উঠে অক্সানা বলল, 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও বলছি এখান থেকে! দৌড় লাগাও!'

হেসে উঠে আন্তনকে বগলদাবা করে অফিস-ঘর থেকে পালাল সিলান্তি। অক্সানা ঝুপ করে সোফায় বসে পড়ল। সোফাটায় তার আগেই কিছুক্ষণ ধরে ঝিমোচ্ছিল রাখিল।

বললুম, 'সিলান্তি কিন্তু ভারি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিত্ব। তোমার উচিত ওর চরিত্র অধ্যয়ন করা।'

অফিস ছেড়ে এবার দৌড়ে বেরিয়ে গেল অক্‌সানা। তবে যাওয়ার আগে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার কথা হাস্যকরভাবে নকল করে বলে গেল:

'আমি ওর একেবারে ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। ও তো কাচের তৈরি পুতুল!'

এইভাবে আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে দরজা দিয়ে ছুটে বেরোতেই ও গিয়ে পড়ল একঝাঁক কলোনি-বাসিন্দার মধ্যে। একবার ওর রিন্‌রিনে গলা কানে এল আমার, তারপর তা ডুবে গেল কলোনির চিরাচরিত কলগুঞ্জনের ঘূর্ণিপাকে।

বললুম, 'রাখিল, শুতে যাও।'

'কে, আমি? আমার তো ঘুম পায় নি, পেয়েছে কি? আপনার ঘুম পেয়েছে বুঝি?'

'আমি শুতে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, তাহলে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই...'

বাচ্চা মেয়ের মতো হাতের মুঠি দিয়ে বাঁ-চোখটা রগড়ে নিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল ও, তারপর হাতড়াতে-হাতড়াতে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। বেরনোর সময় কাঁধটা ওর দরজার ফ্রেমে গুঁতো খেল একবার।

৪

আমাদের থিয়েটার

আগের পরিচ্ছেদে যা-কিছুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে শীতের সন্ধেগুলো পূর্ণ করে রাখার দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় তা ছিল আমাদের মজাদার কাজকর্মের একটা নিতান্ত সামান্যই অংশ। আজ অতীতের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে ব্যাপারটা কবুল করতে কিছুটা লজ্জাই পাচ্ছি যে তখন আমাদের প্রায় সবটুকু অবসর-সময় ব্যয়িত হোত থিয়েটারের পেছনে।

নতুন কলোনিতে আমরা সত্যিকার একটা থিয়েটার-হলের দখল পেয়ে গিয়েছিলুম। আগেকার কারখানার আটচালাটাকে পুরোপুরি নিজেদের হেফাজতে পেয়ে আমরা যে কী অপার্থিব আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছিলুম এতদিন পর তার বর্ণনা দেয়া শক্ত।

আমাদের থিয়েটরে ছ-শো খানেক লোক বসার মতো জায়গা ছিল — তার মানে, একসঙ্গে কয়েকখানা গাঁয়ের দর্শক ধরে যেত সেখানে। ফলে আমাদের নাটুকে দলটির গুরুত্ব যেমন সাংঘাতিক বেড়ে গেল তেমনই তার কাছে দাবিও বাড়ল সেই অনুপাতে।

এটা অবশ্য সত্যি যে থিয়েটর-হলটির কিছু-কিছু অসুবিধেও ছিল। তার এই অসুবিধেগুলোকে কালিনা ইভানভিচ এত বড় করে দেখছিল যে সে প্রস্তাব করে বসল থিয়েটর-হলটাকে বরং গাড়ি রাখার আস্তাবলে পরিণত করা হোক।

বলল, 'অর মধ্যি যদি গাড়ি রাখ তাইলে ঠান্ডায় সেগুলার কষ্ট হইব না। আর তাইলে ওই চালার মধ্যি চুল্লী না-রাইখলেও চলবে। কিন্তু যাত্রাপালা দ্যাখতে লোক বসলে তোমাগোরে চুল্লী রাখন লাগব।'

'ঠিক আছে। আমরা তাহলে চালার মধ্যে চুল্লীও রাখব।'

'তা রাইখবার পার, তবে কিনা ওয়া ভিক্ষুকের সাথে করমর্দনের সমান হইব। নিজেরাও দ্যাখতে পাইতেছ তো ঘরটার মধ্যি সত্যিকার কোনো ছাদ নাই, আছে একখান লোহার চাল, তার নিচে ছাউনি পর্যন্ত নাই। ওই চালার নিচে চুল্লী জ্বালাইলে ওয়া বাচ্চা আর ধাড়ি দেবদূতগো লেগ্যে স্বর্গরাজ্য গরম করার সমান হইব, দর্শকগোরে গরম করার লেগ্যে নয়। তাবাদে, ওই চালায় কোন জাতের চুল্লী বসান সম্ভব বইল্যা মনে কর? ওখানে তোমাগো লোহার চুল্লী বসান লাগব, কিন্তু ওয়া তোমাগোরে বসাইতে দিব কে? সাধ কইর‍্যা ঘরে আগুন লাগাইতে দিব কে তোমাগোরে? চুল্লী বসাইলে যাত্রাপালা শুরু করার সাথে-সাথে দমকলও ডাইকবার পড়ব, বোঝলা-নি?'

কিন্তু কালিনা ইভানভিচের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমরা একমত হলুম না। বিশেষ করে সিলান্তি যখন বললে, 'ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে। যাত্রাপালা তো মাগনাই দেখান হবে, তাই না? আর তা করলি ঘরে আগুন লাগলিও ঝামেলা হব্যে না, কেউ আমাদেরে গালমন্দ করব্যে না', তখন আমরা মনঃস্থির করে ফেললুম।

আটচালাটার মধ্যে নানা ধরনের কয়েকটা ঢালাই লোহার চুল্লী রাখলুম আমরা। একমাত্র নাটক অভিনয়ের সময়েই সেগুলোতে আগুন জ্বালানো হোত। তবু কখনই সেগুলো থিয়েটর-হলের আবহাওয়াকে গরম করে তুলতে সক্ষম হোত না, কারণ তা থেকে যতটা উত্তাপ বেরোত তার সবটুকুই ওপরদিকে

উঠে লোহার চালের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেত। কাজেই চুল্লীগুলো যদিও আগুনে তেতে সব সময়ে টকটকে লাল হয়ে থাকত, দর্শকরা তবু ওভারকোট পরেই বসা পছন্দ করত। কেবল যারা চুল্লীর ধারে বসত তারা সতর্ক থাকত যাতে তাদের শরীরের চুল্লীর ধারের পাশটা ঝলসে না যায়।

মাত্র একবারই আমাদের থিয়েটর-হলে আগুন লেগেছিল, আর তাও চুল্লীর আগুন থেকে নয়, কেবল স্টেজের ওপর হঠাৎ একটা বাতি উলটে যাওয়ায়। ফলে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল বটে, তবে তাও ছিল একটু অসাধারণ ধরনের। কারণ দর্শকরা স্থির হয়ে সবাই যে-যার জায়গায় বসে ছিল আর কলোনির ছেলেরাই কেবল অকৃত্রিম আনন্দে স্টেজের ওপর লাফিয়ে উঠে এসেছিল। কারাবানভ তখন চেঁচামেচি করে তাড়িয়েছিল তাদের। বলেছিল:

'গাবা কোথাকার, মুখ্খুগুলান জেবনে কোনোদিন আগুন লাগতি দেখিস নাই নাকি?'

সত্যিকার স্টেজ বলতে যা বোঝায় তা-ই বানিয়ে ফেলেছিলুম আমরা — বেশ প্রশস্ত, উঁচু, দুদিকে জটিল ব্যবস্থাওয়ালা উইংস এবং প্রম্‌টারের একটা বাক্সও। স্টেজের পেছনদিকে ছিল একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গা, কিন্তু এই জায়গাটার সদ্‌ব্যবহার করতে পারছিলুম না আমরা। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্যে অপেক্ষাকৃত সহনীয়রকমের কম ঠাণ্ডা একটা জায়গা তৈরির উদ্দেশ্যে এই ফাঁকা জায়গাটার একাংশ ঘিরে ছোটখাটরকমের একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছিলুম। সাময়িক ব্যবহারের জন্যে সেখানে একটা চুল্লী বসিয়ে জায়গাটাকে মেক-আপ আর পোশাক-বদলানোর ঘরে পরিণত করেছিলুম। দরকার অনুযায়ী পালা করে ঘরটাকে ব্যবহার করে আর মেয়ে-পুরুষের আলাদা একটুখানি ব্যবস্থা রেখে কোনোরকমে কাজ চালাতুম আমরা। উইংস আর স্টেজের পেছনে সেই ফাঁকা জায়গাটার বাকি অংশ ঘরের বাইরেকার মতোই ঠাণ্ডা হয়ে থাকত।

অডিটোরিয়মে ছিল সারি-সারি কয়েক ডজন কাঠের তক্তার বেঞ্চি পাতা, অর্থাৎ নাট্যাভিনয় দেখার জন্যে বসার অঢেল জায়গা। বলা যেতে পারে, সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্যে চমৎকার ঢালাও একখানা আবাদ, কেবল তাতে বীজ বোনা আর ফসল তোলার ছিল যা-কিছু ওয়াস্তা।

নতুন কলোনিতে আমাদের নাট্যাভিনয়-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের শ্রীবৃদ্ধি এত দ্রুত ঘটতে লাগল এবং এক মুহূর্তের জন্যেও তার বেগ শিথিল বা

তার ব্যাপ্তি সংকুচিত না-করার ফলে মাত্র তিনটি শীতের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে এমন সর্বময় কর্তৃত্বের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল যে এখন আমি যা লিখছি তা আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রথম বছরের শীতে আমরা প্রায় চল্লিশটি নাটক মঞ্চস্থ করলুম। তবে ক্লাব, আখড়া ইত্যাদিতে প্রচলিত হালকা মজাদার নাটক অভিনয়ের দিকে কখনও নজর না-দিয়ে শুধুই চার কিংবা পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ গুরুগম্ভীর নাটক নামাতুম। এই সব নাটকের বেশির ভাগই রাজধানীর থিয়েটরগুলোয় অভিনীত নাটকের তালিকা থেকে সংগ্রহ করা হোত। এটা হয়তো আমাদের পক্ষে অতুলনীয় ধৃষ্টতারই পরিচায়ক ছিল, তবু আমাদের কাজটা যে নিছক মেঠো, বাজে ধরনের হোত না সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দিনের নাট্যাভিনয়ের পর থেকেই আমাদের থিয়েটরের সুনাম গন্‌চারোভ্‌কা গাঁ ছাড়িয়ে আরও বহুদূর ছড়িয়ে গেল। আমাদের নাটক দেখতে আসত পিরগোভ্‌কা, গ্রাবিলভ্‌কা, বাবিচেভ্‌কা, গন্‌ত্‌সি, ভাত্‌সি ও স্তরজেভোয়ে গাঁয়ের বাসিন্দারা, ভলোভি, চুমাত্‌স্কি ও ওজের্‌স্কি খামারখোলার লোকজন, শহরতলীর বসত্‌গুলো থেকে শ্রমিকরা এবং স্টেশন ও এঞ্জিন-মেরামতি কারখানার রেলশ্রমিকরা। এমন কি অল্প কিছুদিনের মধ্যে শহরের বাসিন্দারাও আমাদের থিয়েটর দেখতে আসা শুরু করল — যেমন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, জনশিক্ষা-দপ্তরের লোকজন, সৈন্যরা, সোভিয়েতের কর্মচারিরা, সমবায়-সংস্থার কর্মচারিরা এবং সরবরাহ-সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত লোকজন। তাছাড়া আসত শহরের অল্পবয়সী সাধারণ ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ আমাদের ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব ও তাদের বন্ধুদের বন্ধুরা। প্রথম বছর শীতের শেষাশেষি থেকেই প্রতি শনিবারে দুপুরের খাওয়ার সময় থেকে আমাদের থিয়েটরের আটচালাটার চারপাশে দূর-দূরান্তর থেকে আসা লোকের রীতিমতো মেলা বসে যেত। ভেড়ার চামড়ায় তৈরি কোট কিংবা ভারি ওভারকোট গায়ে-চড়ানো পাকানো গোঁফওয়ালা লোকজনকে তখন দেখা যেত গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে ঘোড়াগুলোর পিঠে বস্তা আর ঘোড়ার কম্বল চাপা দিচ্ছে, তারপর পাতকুয়োর জল তোলার ডাণ্ডাটার চারপাশে তাদের বালতিগুলোকে এনে ঝন্‌ঝন্‌ করে ফেলছে। ওদিকে তাদের মেয়ে-বউরা ততক্ষণে চোখ দুটো শুধু বার করে রেখে বাকি মুখ আর মাথা পশমী

চাদরে ঢেকে, গাড়ি করে দীর্ঘ পথ আসার ফলে ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া পাগ্লোকে আটচালার সামনে নেচে-নেচে গরম করছে, আর তারপর লোহার নাল-লাগানো উ'চু গোড়ালিওয়ালা জ্তো পায়ে কোন ফাঁকে হেলেদ্লে দৌড়ে গিয়ে আমাদের মেয়েদের শোবার ঘরগ্লোয় ঢুকে পড়ছে আর একই সঙ্গে শরীর গরম করা আর সদ্য গড়ে-ওঠা বন্ধ্ত্ব আরও একবার ঝালিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকছে। মেয়েদের অনেকেই গাড়িতে বিছনো খড়ের তলা থেকে নিজের-নিজের থলে আর প্‌ট্‌লি বের করে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের ঘরে ঢুকত। দ্রান্তরে থিয়েটর-পালা দেখতে আসছে বলে সঙ্গে ওরা, যাকে বলে, একেবারে চালচি'ড়ে বে'ধে নিয়ে আসত — যেমন সঙ্গে করে আনত পিঠে, শাদা ময়দার গোল র্টি, খাঁজ-কাটা ছোট-ছোট চর্বির বরফি আর নানা ধরনের মাংসর স্যসেজ। এই সব খাবারদাবারের একটা বড় অংশই অবশ্য তারা কলোনি-বাসিন্দাদের খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে আসত। শেষে এই উপহারের মাত্রার এত বেশি বাড়াবাড়ি শ্র্ হয়ে গেল যে কলোনির কম্‌সমোল কেন্দ্র আগন্তুক দর্শকদের কাছ থেকে কোনো ধরনের উপহার নেয়াই দিল সরাসরি নিষিদ্ধ করে।

যাতে আমাদের অতিথিরা হাত-পা সে'কে শরীর গরম করতে পারে তার জন্যে শনিবার-শনিবার বেলা দ্'টো থেকে থিয়েটর-হলের চুল্লীগ্লো জ্বালিয়ে দেয়া হোত। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যতই বাড়তে লাগল ততই অতিথিদের মধ্যে কলোনির বাড়িগ্লোতে সে'ধনোর প্রবণতা দেখা যেতে লাগল বেশি-বেশি করে। এমন কি আমাদের খাবার ঘরেও একদল অপেক্ষাকৃত বেশি স্বিধাভোগীকে আনাগোনা করতে দেখা গেল। কলোনিতে এরা ছিল সর্বজনপ্রিয়, তাই খাবার টেবিলেও এদের নেমন্তন্ন করার অধিকার আছে বলে আমাদের মনিটররা মনে করত।

নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করার ফলে কলোনির খরচের মাত্রা খ্ব বেশি বেড়ে গেল। পোশাক-আশাক, পরচুলা আর অন্যান্য আন্ষঙ্গিক বাবদ খরচ হতে লাগল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ র্ব্‌ল। কোনো-না-কোনো ভাবে মাসে সবস্দ্ধ খরচ হতে লাগল প্রায় শ-দ্ই র্ব্‌ল করে। আমাদের পক্ষে এটা বেশ বড় রকমের একটা খরচের বোঝা হয়ে দাঁড়াল, কারণ দর্শনী বাবদ দর্শকদের কাছ থেকে এক পাইপয়সাও নেয়ার মতো নিজেদের খাটো করতে পারি নি কোনোদিন। এ-ব্যবস্থা আমরা করেছিল্ম অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কথা

মনে রেখে, কারণ সে-সময়ে গাঁয়ের অল্পবয়সীদের, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে পকেট-খরচা বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না।

প্রথম-প্রথম থিয়েটর-হলে ঢোকার জন্যে টিকিটেরই বালাই ছিল না। কিন্তু শিগ্‌গির এমন একটা সময় এল যখন নাটক দেখতে যারা আগ্রহী ছিল তাদের সকলকে আটচালাটায় আঁটত না। ফলে আমাদের একধরনের টিকিটের বন্দোবস্ত করতে হল। এই টিকিট গোছা বেঁধে আগে থেকে বিতরণ করা হোত কম্‌সমোল সংগঠনগুলোয়, গ্রাম-সোভিয়েতগুলোয় ও আমাদের নিজস্ব বিশেষ-বিশেষ স্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে।

অবাক হয়ে দেখলুম গ্রামীণ মানুষের মধ্যে থিয়েটর দেখার আগ্রহ অপরিসীম। টিকিটের বিতরণ নিয়ে এ-গ্রাম ও-গ্রামের মধ্যে অনবরত ঝগড়াঝাঁটি আর ভুল-বোঝাবুঝি লেগে থাকতে দেখা যেত। উত্তেজিত সেক্রেটারিরা এসে রীতিমতো ঝগড়া করার সুরে কখনও আমাদের বলত:

'আসচে কালির জন্যি আমাদেরে মাত্তর তিরিশখান টিকিট দেয়া হল্য ক্যানে?'

শুনে টিকিট-ঘরের ম্যানেজার জোর্‌কা ভোল্‌কভ সেক্রেটারির মুখের ওপরই ব্যঙ্গভরে মাথা নাড়তে-নাড়তে বলত:

'আপনেদের জন্যি অত কয়ডাও তো যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট! বললিই হল্য! সরকারি আমলাদের মতন এখেনে বসি আছ আর মনে ভাবত্যেছ আমাদের জন্যি যথেষ্ট কতডা তা তমার জানা আছে! নাকি?'

'হ্যাঁ। এখেনে বস্যে-বস্যেই আমরা টের পাতিছি আমাদের টিকিট নিয়ি পুরোত্যের মেয়্যাগুলান নাটক দেখতি আসে।'

'পুরোত্যের মেয়্যাগুলান? কী বলতিছ তুমি?'

'হ্যাঁ, পুরোত্যের মেয়্যাগুলান বাদে আর কে? লালচুলো মেয়্যাগুলান।'

ভোল্‌কভের বর্ণনার সঙ্গে ওর গাঁয়ের পাদ্রির মেয়েদের বর্ণনা মিলে যাওয়ায় সেক্রেটারিটির গলার সুর খাদে নেমে এল বটে, কিন্তু তবু সে তার জিদ ছাড়ল না। বলল:

'ঠিক আছে — পুরোত্যের দুইডা মেয়্যা না হয় এস্যেছেল। কিন্তু তা বলি তমরা আমাদেরে বিশখান টিকিট কম দিবে? আগি পঞ্চাশখান করি দিতে আর এখন আমরা সর্বসাকুল্যে পাতিছি মাত্তর তিরিশখান।'

'না, আপনেদের উপর আমাদের আর আস্থা নাই।' কঠোরভাবে জবাব দিল জোর্‌কা। 'পুরোত্তোর দুইডা মেয়্যা তো এস্যেছেই, আরও কয়জনা পুরোত্ত-গিন্নি আর দোকানদারের ইস্তিরি যে এস্যেছে তা কেডা খবর রাখে? আপনেদের মধ্যি পচন যে কতখানি ধরেছে তার হিসাব রাখা আমাদের কম্মো না।'

'কিন্তু কোন কুত্তির বাচ্চা আমাদের কথা ফাঁস করি দেছে জানতি পারি কি?'

'কুত্তির বাচ্চাদেরও ফর্দ রাখি না আমরা, বোঝলেন? ওই তিরিশখান টিকিটই আপনেদের পক্ষি যথেষ্ট।'

মর্মাহত সেক্রেটারি তখন গাঁয়ের দিকে দৌড়ত এই নতুন-আবিষ্কৃত পচন সম্পর্কে তত্ত্বতল্লাস করতে। কিন্তু তার শূন্যস্থান দেখতে-দেখতে পূরণ করে দিত অপর কেউ-না-কেউ একজন অসন্তুষ্ট ব্যক্তি। সে হয়তো এসে বলত:

'এ-সকলের মানে কী, কমরেড? আমাদের কম্‌সমোল-সদস্যের সংখ্যা পঞ্চাশ আর আপনেরা কিনা আমাদেরে মাত্তর পনারোখান টিকিট পাঠায়্যেছেন!'

'ও-পি' মিশ্র বাহিনীর রিপোর্ট অনুযায়ী গতবার আপনেদের মাত্তর পনারোজনা সুস্থ স্বাভাবিক কম্‌সমোল-সদস্য এস্যেছিল। আর তাদের মধ্যি চারজনাই ছিল বুড়ি মেয়্যাছেলা। বাকি সব কয়ডাই ছিল মাতাল।'

'মোট্টেও না! যে অদেরে মাতাল কয়েছে সে মিথ্যা কথা কয়েছে। আমাদের সদস্যরা মদ-চোলাইয়ের কারখানায় কাজ করে, আর তাই অদের গায়ি মদের গন্ধ লেগি থাকে...'

'আমরা অদেরে পরীক্ষে করে দেখিছি অদের মুখি ভকভক করো মদের গন্ধ বেরোতেছেল। কারখানার উপর দোষ চাপায়ে পার মিলবে না...'

'আমি অদেরে আপনের কাছি নিয়ি আসব-নে। নিজিই আপনে টের পাবেন সব্বদাই অদের গা থেক্যে মদের গন্ধ ছাড়তেছে। তা না, আপনে মিথ্যামিথ্যি দোষ ধরার চেষ্টা পাতিছেন আর উদ্ভট গপ্পোকথা বানাত্যেছেন। এরে কী ধরনির নীতি কন আপনে?'

'মোট্টেও তা নয়! আমরা সব্বদাই বুঝি কাজির জন্যি কখন অদের গা থেক্যে মদের গন্ধ ছাড়ে, আর কখন মদ খায়্যে মাতাল হয় অরা।'

'আরে, ছাড়ান দ্যান, আরও অন্তত খানপাঁচেক টিকিট দ্যান দেখি — আপনেদের লজ্জা হওয়া উচিত!.. শহরের সব ধরনির মেয়্যাদেরে আপনেরা

টিকিট দিত্যেছেন, ইয়ার-দোস্তদেরে টিকিট দিত্যেছেন, কেবল আমাদের কম্‌সমোল সদস্যদেরে টিকিট দিত্যেছেন সবশেষে...'

আর এইভাবে হঠাৎই একদিন উপলব্ধি করলুম যে থিয়েটর নিছক আমাদের নিজেদের চিত্তবিনোদন বা আমোদপ্রমোদের ব্যাপার নয়, এটা আমাদের কর্তব্যও। এটা অবশ্যম্ভাবী একটা সামাজিক কর্তব্য, যার খাজনা পরিশোধ কোনোক্রমে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

আমাদের কম্‌সমোলের কার্যনির্বাহী কেন্দ্র ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করল। শুধুমাত্র কলোনির নাট্যচক্রের পক্ষে এত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন করা সম্ভব ছিল না। এমন একটা শনিবারের কথা তখন চিন্তা করা যেত না যে-শনিবার একটা-না-একটা নাটকের অনুষ্ঠান না হোত। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহেই নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতুম আমরা। কেননা একাধিক সপ্তাহে একই নাটকের পুনরাবৃত্তি আমাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে হানিকর হয়ে দাঁড়াত, এবং আমাদের থিয়েটরের নিয়মিত দর্শনার্থী নিকটতম প্রতিবেশীদের কাছে তার ফলে সেই পুনঃপ্রদর্শনের সন্ধ্যাটি যেত মাটি হয়ে। ফলে নাট্যচক্রের মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা দেখা দিতে লাগল।

এমন কি কারাবানভও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পরিত্রাণ চাইল।

বলল, 'আমি কি মাল-বওয়া ঘোড়া নাকি, কও দেখি? গত হপ্তায় আমারে সাজতি হল্য বড় পুরোত, এ হপ্তায় ফৌজের জেনারেল, আর এখন তুমি হতি বলত্যেছ গেরিলা যোদ্ধা। তা, কী মনে ভাবো আমারে? আমি কি লোহা দিয়ি তৈয়েরি? প্রেতি রাতে দুইডা পর্যন্ত মহড়া দিতি লাগবে, তারপর শনিবার-শনিবার টেবিল-চেয়ার টানাটানি করতি আর থিয়েটরের সিন সরাতি লাগবে...'

টেবিলের ওপর হাতের মুঠো দুটো চেপে ধরে মুঠোয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কভাল চেঁচিয়ে বলল:

'তুই চাসডা কী, শুনি? নাশপাতি গাছির নিচি একখান কৌচ পাতি তরে বিশ্রাম করতি দিতি লাগবে? কাজ তো করতি হবেই, নাকি!'

'কাজ যদি করতিই হয় তাইলি এমনভাবে তারে সংগঠিত করা লাগবে যাতে সব্বলেই কাজ করে।'

'নিচ্চয়। আমরা কাজডারে সংগঠিত করব্য।'

'ঠিক আছে, তাইলি তাই করেন!'

'তাহলি দলপতি-পরিষদের সভা ডাক্!'

দলপতি-পরিষদের সভায় কার্যনির্বাহী কেন্দ্র এইমর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করল: আর পৃথক নাট্যচক্র নয়, এবার সকলকেই থিয়েটরের কাজে যোগ দিতে হবে, কাজে ওজর-আপত্তি আর চলবে না!

পরিষদের সভায় নির্দেশনামা জারি করার মধ্যে দিয়ে ছেলেরা আলোচ্য যে-কোনো বিষয়কে সূত্রবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিল। থিয়েটর-সম্পর্কিত ব্যাপারটাকেও তারা সূত্রবদ্ধ করল এইভাবে চিহ্নিত করে:

॥ ৫ ॥

দলপতি-পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী স্থির হল যে প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানের প্রস্তুতি-সম্পর্কিত কাজকর্মকে কলোনির প্রত্যেক বাসিন্দার পক্ষে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করা হবে। অতএব 'অস্তিত্বহীন উপজাতির অ্যাড্‌ভেঞ্চার' নাটকের অভিনয়-সম্পর্কিত কাজের দায়িত্ব দেয়া হল অমুক-অমুক কয়েকটি মিশ্র বাহিনীর ওপর...

অতঃপর প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হল সেই মিশ্র বাহিনীগুলির নামের একটি তালিকা। ভাবখানা ছিল এইরকম যেন ব্যাপারটা উচ্চস্তরের শিল্প নিয়ে নয়, বরং বীটখেতের আগাছা নিড়নো কিংবা আলুখেতে মাটির আল বাঁধা নিয়ে। শিল্পের পবিত্র বিধানের লঙ্ঘন শুরু হল আগেকার নাট্যচক্রের পরিবর্তে মিশ্র বাহিনী ৬-'অ' গঠনের মধ্যে দিয়ে। ভের্‌শ্‌নেভের নেতৃত্বে আটাশ জনের এই বাহিনীর ওপর ভার পড়ল... পরবর্তী বিশেষ নাটকটিতে অভিনয় করার।

আর এই মিশ্র বাহিনী নিয়োগের অর্থই দাঁড়াল কাজে বাধ্যতামূলক ও ঠিক-ঠিক সময়মাফিক উপস্থিতি, সন্ধেবেলার রিপোর্টে সর্বসমক্ষে নিয়মভঙ্গকারীদের নামের উল্লেখ, দলপতিদের হুকুম শোনা ও স্যালুটসহ সেই পরিচিত 'ঠিক হ্যায়' কথাটি বলা। এ-সব ব্যাপারে কর্তব্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও কলোনির শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হোত এবং ব্যাপারটা দলপতি-পরিষদের কিংবা কলোনির সাধারণ সভায় আলোচিত হোত। আর এর পরিণতি দোষীদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো যা হতে পারত তা হল আমার কাছ থেকে কিছু সদুপদেশ শোনা ও কয়েকটা বাড়তি কাজ করা কিংবা একটা বিনা-কাজের দিনে ঘরে আটক হয়ে থাকার শাস্তি।

থিয়েটর পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যাপারটা ছিল সত্যিকার একটা সংস্কারসাধন। যতই যাই হোক, আগেকার নাট্যচক্রটি ছিল একটি ঐচ্ছিক সংগঠনমাত্র। ফলে সর্বদাই একটু বেশি 'গণতন্ত্রীপনা'র দিকে ঝোঁক ছিল সংগঠনটির এবং এর সদস্যসংখ্যায়ও প্রায়-প্রায়ই হেরফের ঘটতে দেখা যেত। তদুপরি, ব্যক্তিগত রুচি আর দাবি নিয়ে লড়াইয়ের একটা ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল চক্রটি। বিশেষ করে এটা প্রকট হোত নাটক বাছাই আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ভূমিকা বিতরণের সময়। আমাদের নাট্যচক্রের মধ্যে ক্রমশ ব্যক্তিস্বার্থের টানাপোড়েনও অনুভূত হতে শুরু করেছিল।

কিন্তু কম্‌সমোলের কার্যনির্বাহী কেন্দ্র ও দলপতি-পরিষদের পূর্বোক্ত প্রস্তাবকে সব ব্যাপারেরই সন্দেহাতীত রকমের সু-মীমাংসিত একটা পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করা হল। আর তাই কলোনির থিয়েটরকেও আবাদের কাজ, আলুক মেরামতি আর ঘরের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার মতো একই স্তরের কাজ বলে গণ্য করা হতে লাগল। অমুক বা তমুক কলোনি-বাসিন্দা একটি বিশেষ নাটকের অভিনয়ে কোন ভূমিকা গ্রহণ করল কলোনির সামগ্রিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে তা হয়ে দাঁড়াল গৌণ বিষয়। আসল কথা ছিল, কলোনি যৌথভাবে যা চাইছে প্রত্যেককে সেই দাবি মেটাতে হবে।

দলপতি-পরিষদের রবিবারের সভায় পরের শনিবার কোন নাটক অভিনীত হবে তার নাম এবং কলোনি-বাসিন্দারা কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে তার তালিকা ঘোষণা করতুম আমি। এটাই ছিল নিয়ম। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে ৬-'অ' মিশ্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তাদের মধ্যে থেকে

একজন দলপতিও নির্বাচিত হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। এছাড়া কলোনির বাকি বাসিন্দাদের ভাগাভাগি করে থিয়েটর-সংক্রান্ত অন্যান্য মিশ্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হোত। এই সব কটি মিশ্ররই সূচকসংখ্যা হোত ৬ এবং এরা সকলেই ওই নির্দিষ্ট নাটকের অভিনয় শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যেত। এই মিশ্র বাহিনীগুলো ছিল যথাক্রমে —

ছয়-'অ', অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাহিনী।

ছয়-'দ', অর্থাৎ দর্শক-বাহিনী।

ছয়-'প', অর্থাৎ পোশাক-আশাক সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

ছয়-'গ', অর্থাৎ ঘর গরম করার ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

ছয়-'দৃ', অর্থাৎ দৃশ্যপট বা সিনারি পরিবর্তনের ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

ছয়-'স', অর্থাৎ নাটক-সংক্রান্ত সম্পত্তি-সংগ্রাহক বাহিনী।

ছয়-'আসা', অর্থাৎ আলো ও মঞ্চের সাজসরঞ্জামের ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

ছয়-'প', অর্থাৎ থিয়েটর হল ও মঞ্চ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

ছয়-'শস', অর্থাৎ শব্দ-সংযোজনার ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

ছয়-'য', অর্থাৎ যবনিকা বা মঞ্চের প্রধান পর্দার ভারপ্রাপ্ত বাহিনী।

এটা যদি স্মরণ থাকে যে ওই সময়েও আমাদের কলোনির সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র আশি, তাহলে এ-কথাটাও বুঝতে কোনো কষ্ট হবে না যে একটিও কলোনি-বাসিন্দা আমাদের এই প্রয়াসের বাইরে থাকত না। আর মনোনীত নাটকটিতে যদি বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটত তাহলে আমাদের কাজের লোকের রীতিমতো ঘাটতি পড়ে যেত। মিশ্র বাহিনীগুলি তৈরি করার সময়ে দলপতি-পরিষদ ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছে আর বিশেষ প্রবণতাকে হিসেবের মধ্যে ধরতে যে প্রাণপণ প্রয়াস পেত একথা বলাই বাহুল্য, তবু এ-ও ঠিক যে সর্বক্ষেত্রে সকলের সব দাবি মেটানো সম্ভব হয়ে উঠত না। প্রায়ই এমনটা ঘটতে দেখা যেত যে কোনো একজন কলোনি-বাসিন্দা এসে হয়তো জিজ্ঞাসা করছে:

'আমারে ক্যানে ৬-এর 'অ'তে ভর্তি করো দেছেন? জেবনে আমি বলে কখনও পালায় অভিনয় করি নাই।'

আর তখন তাকে সাফ জবাব দেয়া হোত, 'তুমি তো দেখছি মুজিকের মতো কথা বলছ। আগে কখনও অভিনয় কর নি তো কী হয়েছে? প্রত্যেককেই তো কোনো-না-কোনো দিন জীবনে প্রথমবার অভিনয় করতে হয়, নাকি?'

সারা সপ্তাহ জুড়ে এই সব ক'টা মিশ্র বাহিনীকে, বিশেষ করে তাদের দলপতিদের, অবসর-সময়ের সবটুকু কলোনির মধ্যে, এমন কি শহরেও, পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ি করে কাটাতে হোত। অজুহাত বা কৈফিয়ত, তা সে যতই লাগসই হোক, তা দেখিয়ে আমাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না কারও, কৈফিয়তে কান দেয়া রীতিই ছিল না আমাদের। ফলে আমাদের মিশ্র বাহিনীগুলির দলপতিদের প্রায়ই মুশকিলে পড়তে হোত। এটা অবশ্য সত্যি যে শহরে আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব ছিল, আর তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের আদর্শের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। ফলত, উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, প্রায় সব সময়েই আমরা যে-কোনো নাটক অভিনয়ের উপযোগী পোশাক-আশাক সংগ্রহ করতে সমর্থ হতুম। আর যখন এটা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত তখন আমাদের ছয়-'প' মিশ্র জানত কলোনির মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করা নানা আজগবি ধরনের টুকিটাকি কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে কী করে যে-কোনো ঐতিহাসিক যুগের উপযোগী পোশাক যে-কোনো সংখ্যায় তৈরি করে নিতে হয়। তদুপরি এটাও মনে করা হোত যে কলোনির যে-কোনো সম্পত্তির শুধু নয় কলোনির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীদের যে-কোনো ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের ওপরও আমাদের থিয়েটার-সংক্রান্ত বাহিনীগুলির পুরো এক্তিয়ার আছে। যেমন, ছয়-'স' মিশ্র এ-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত ছিল যে কলোনির পরিচালকবৃন্দের সম্পত্তি ঢুঁড়ে জিনিসপত্র সংগ্রহ করার জন্যেই তাদের নাম সম্পত্তি-সংগ্রাহক বাহিনী দেয়া হয়েছে। অবশ্য আমাদের নাট্যপ্রয়াস বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার-সংক্রান্ত স্থায়ী সম্পত্তি কিছু পরিমাণে কলোনিতেই জমে উঠতে শুরু করল। যেহেতু আমাদের নাটকগুলোতে প্রায়ই নানারকম সামরিক ব্যাপারস্যাপার থাকত এবং অভিনয়ের সময় গুলিগোলা ছোড়ার দরকার পড়ত, সেইহেতু রীতিমতো একটা অস্ত্রাগারের মালমশলা সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল আমাদের, আর সেইসঙ্গে যোগাড় হয়েছিল নানা ধরনের ফৌজী ইউনিফর্ম, কাঁধের পটি আর ক্রসবেল্ট আর বহুতর পদক। ক্রমশ কলোনির যৌথ সমাজে কেবল অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়

অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করল। এইভাবে আমাদের মধ্যে চমৎকার সব মেশিনগান-চালিয়ের উদ্ভব ঘটতে দেখা গেল। এরা নিজেরাই মাথা খাটিয়ে এমন সব কল বানাল যা থেকে সত্যিকার মেশিনগানের গুলির আওয়াজ বেরোত। এছাড়া তৈরি হল 'ইলিয়া' (দৈববাণী-ঘোষক) কামানের এমন সব গোলন্দাজ যারা স্টেজের ওপর কামানের রীতিমতো বিশ্বাসযোগ্য বজ্রনির্ঘোষ শোনানোর আর আগুনের ঝলক দেখিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখত।

পার্ট মুখস্থ করার জন্যে সময় পাওয়া যেত এক সপ্তাহ। প্রথম-প্রথম কাজটা আমরা যথাযথভাবে করার চেষ্টা করতুম — অর্থাৎ অভিনেতাদের পার্টগুলো আলাদা-আলাদা ভাবে লিখে দেয়া হোত এবং তারা সেগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করত। কিন্তু শিগ্গিরই এ-রেওয়াজ ত্যাগ করলুম আমরা। প্রতি সপ্তাহে এইভাবে পার্ট লেখা আর তা মুখস্থ করার সময় ছিল না আমাদের, কারণ যতই যাই হোক কলোনিতে আমাদের নিত্যকর্ম ছিল বহুবিধ, তাছাড়া ছিল ইশ্কুলের ক্লাস করা। ইশ্কুলের পড়া তৈরি করার কাজটা ছেলেমেয়েদের করতে হোত সর্বাগ্রে। থিয়েটরের সবকিছু রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে অবশেষে তাই পুরোপুরি প্রম্টারের ওপর নির্ভর করে অভিনয়ের রীতি চালু করা গেল। বলা বাহুল্য, এটার প্রচলন করে আমরা ভালো কাজই করেছিলুম। প্রম্টিং শুনে অভিনয় করার ব্যাপারে কলোনি-বাসিন্দারা রীতিমতো পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। অভিনয়ের পার্টের মধ্যে নিজের কথা জুড়ে দেয়া এবং স্টেজের ওপর নানাজাতীয় স্বাধীনতা নেয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার বিলাসিতাটুকু উপভোগ করাও বাদ গেল না আমাদের মধ্যে। তবে বিনা ঝামেলায় নাটকের অভিনয় যাতে শেষ হয় সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে প্রযোজকের দায়িত্ব ছাড়াও আমার পক্ষে প্রম্টারের দায়িত্ব নেয়া দরকার হয়ে পড়ল। প্রম্টারের কর্তব্য অবশ্য নিছক প্রম্টিঙেই শেষ হোত না, স্টেজের ওপর যা-কিছু হচ্ছে সে-সবের নির্দেশ দেয়া ও পরিচালনার কাজটাও করতে হোত একই সঙ্গে — দেখতে হোত, সঠিকভাবে ও নিজ-নিজ জায়গায় সবকিছু ও সবাই যেন হাজির থাকে স্টেজের ওপর, তাছাড়া গুলিগোলা ছোড়া, আলিঙ্গন ও মৃত্যুর ঠিকঠিক সময় বাতলে দেয়া, ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেয়া, এ-সবেরও তদারকি করতে হোত।

আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব হয় নি কোনোদিন। কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যেই বহু শক্তিশালী অভিনেতা ছিল। আমাদের সেরা শিল্পীদের

মধ্যে ছিল পিওত্র ইভানভিচ গরোভিচ, কারাবানভ, ভেত্কোভ্স্কি, বুত্সাই, ভের্শ্নেভ, জাদোরভ, মারুসিয়া লেভ্চেঙ্কো, কুদ্লাতি, কভাল, গ্লেইসের ও লাপত।

এমন সব নাটক আমরা বাছতে চেষ্টা করতুম যাতে বহু পাত্রপাত্রী আছে। কারণ, কলোনির বহু ছেলেমেয়েই অভিনয় করতে চাইত, তাছাড়া স্টেজের ওপর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা ও আচরণ করতে সমর্থ এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা যাতে ক্রমশ বেড়ে চলে সে-ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যথাও ছিল খুব। থিয়েটরে অভিনয় করার ওপর আমি খুবই গুরুত্ব দিচ্ছিলুম, কারণ এর মধ্যে দিয়ে বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দাদের উচ্চারণ ও কথাবার্তা যেমন খুব দ্রুত চমৎকারভাবে মার্জিত হয়ে উঠেছিল, তেমনই তাদের ভাবনাচিন্তার পরিধিও বিস্তৃত হয়ে চলেছিল। কখনও-কখনও অবশ্য যথেষ্টসংখ্যক অভিনেতা জুটত না বলে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও অন্যান্য কর্মীদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানাতুম। একবার এমন কি সিলান্তিকেও স্টেজে উঠতে বাধ্য করেছিলুম। নাটকের মহলার সময় দেখা গেল ও বিশেষ কিছু অভিনয়ই করতে পারছে না, কিন্তু যেহেতু স্টেজে উঠে তার মাত্র একটি বাক্যই উচ্চারণ করার কথা ছিল তাই মনে হয়েছিল এর ফলে তেমন কিছু ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে না। বাক্যটা ছিল এই: 'ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট হবে'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে আমাদের ধারণা অনেকখানি পালটে দিল সিলান্তি।

ঠিক সময়েই সে স্টেজে ঢুকল। মনে হল সবকিছু বুঝি ঠিকমতো উতরে যাবে। কিন্তু ও যখন মুখ খুলল তখন যে বাক্যস্রোত বেরোল তা হচ্ছে এই:

'এই ইয়ে ট্রেনখান, বোঝলে কিনা, এয়া তিন ঘণ্টা লেট হব্যে। ব্যাপারডা হলো গে এই।'

ব্যস, আর যায় কোথায়! ওর এই বাক্যটা দর্শকদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন জাগাল। কিন্তু তুলনায় সে তো কিছুই না। স্টেজের ওপর স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত একদল উদ্বাস্তু শরণার্থীর মধ্যে কথাটা যে-আলোড়ন তুলল তা আর কহতব্য নয়। একান্ত অসহায়ভাবে সারা স্টেজ লুটোপুটি খেয়ে বেড়াতে লাগল তারা। প্রম্টারের বাক্স থেকে আমি যত ইঙ্গিত-ইশারা করি তা কে কার কথা শোনে! এটা আরও বেশি হল এই জন্যে যে কথাটা শুনে গোড়ায় আমিও নিজেকে সামলাতে পারি নি। কয়েক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে

এই সব কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করল সিলান্তি, তারপর আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। বলল:

'আরে অই হাবাগবারা, তদেরে কলাম-না! এই ইয়ে টেরেনখান তিন ঘণ্টা লেট হব্যো... — তা এতি এত হাসার কী আছে?'

দারুণ মজা পেয়ে সিলান্তির কথাগুলো শেষপর্যন্ত শুনল শরণার্থীরা, তারপর দিশেহারা হয়ে দুড়দাড় করে স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নিজেকে সামলিয়ে আমি ফিস্‌ফিস করে বললুম:

'শিগ্‌গির, শিগ্‌গির, স্টেজ ছেড়ে চলে যাও সিলান্তি। যেখানে খুশি যাও, গোল্লায় যাও!'

'আচ্ছা, দ্যাখো ক্যানে!..'

তাড়াতাড়ি হাতের বইখানাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিলুম। এটা ছিল স্টেজে পর্দা ফেলে দেয়ার ইঙ্গিত।

আমাদের থিয়েটরের জন্যে অভিনেত্রী পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছিল। লেভ্‌চেঙ্কো আর নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়া তবু যাহোক একরকম অভিনয় করতে পারত কিন্তু শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে একমাত্র লিদচ্‌কা ছাড়া অভিনয়ের জন্যে আর কাউকে পাওয়া গেল না। এমন কি উপরোক্ত যাদের পাওয়া গেল দেখা গেল তারাও ঠিক স্টেজে অভিনয় করার জন্যে জন্মায় নি। এতই লাজুক তারা যে নাটকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও স্টেজের ওপর আলিঙ্গন বা চুম্বন করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল। অথচ প্রেমের দৃশ্য বা প্রেমিকযুগল বাদ দিয়ে নাটকের অভিনয়ই বা চলে কী করে? ফলে উপযুক্ত অভিনেত্রীর সন্ধানে আমাদের শিক্ষক ও কর্মীদের স্ত্রী, বোন, মাসি খুড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়াদের এবং গম-ভাঙাই কলের মেয়েশ্রমিকদের অনেককে পরখ করে দেখা গেল। এমন কি শহরে যেখানে যার যা বান্ধবী ছিল তাদেরও আমাদের সাহায্য করার জন্যে রাজি করানো গেল, কিন্তু কিছুতেই আমাদের মনোমতো অভিনেত্রী যোগাড় হল না। আর তাই অক্‌সানা আর রাখিল কলোনিতে এসে হাজির হওয়ার পরদিনই তাদের নাটকের মহড়ায় নামিয়ে দেয়া হল। আর বিন্দুমাত্র লজ্জা না-পেয়ে চুমো খাওয়ার লক্ষণীয় দক্ষতা দেখিয়ে তারা আমাদের প্রশংসা অর্জন করল।

দৈবাৎ নাটক দেখতে-আসা একটি মেয়েকে একবার আমরা জপালুম। মেয়েটি গম-ভাঙাই কলের কোনো একজন কর্মীর পরিবারের বন্ধু না কী

ছিল যেন। শহর থেকে এই কর্মীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল মেয়েটি। দেখা গেল, মেয়েটি রীতিমতো একটি মূল্যবান রত্নবিশেষ -- একটি বিপ্লবাত্মক নাটকে নষ্টচরিত্র এক অভিজাত মহিলার চরিত্র অভিনয়ের জন্যে যা-কিছু থাকা দরকার তার সবকিছুই আছে তার — যেমন, রূপ, মিষ্টি গভীর গলা, চোখের চাউনির রঙ্গভঙ্গি, হাঁটাচলার কায়দা, সবকিছু। মহলা চলার সময় মেয়েটির অভিনয় দেখে আমরা তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা। আশায়-আশায় থাকলুম অভিনয়ের প্রথম রাত্রে নিশ্চয়ই দারুণ হৈচৈ পড়ে যাবে। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে নাটক তো শুরু হল চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে, কিন্তু প্রথম অংক শেষ হতেই বিরতির সময়ে আমাদের রত্নটির স্বামী রেলওয়ের একজন টেলিগ্রাফ অপারেটর স্টেজের পেছনদিকে এসে গোটা অভিনেতৃদলের সামনেই স্ত্রীকে ডেকে বললে:

'বাড়ি চল দিকি! এ-নাটকে তোমারে অভিনয় করতি দিতি পারব্য না!'

স্ত্রী-রত্নটি মুহ্যমান হয়ে পড়ে চাপাগলায় বললে:

'তা কী করো্য হয়? তাইলি নাটকের কী হবে?'

'নাটকের কী হব্যে তা আমার দেখার কথা না। চল্যে এস! স্টেজের উপরি যে-কেউ এসি আমার ইস্তিরিরে জড়ায়ো ধরব্যে আর টানাটানি করব্যে এ আমি কিছুতি হতি দিতি পারি নে!'

'কিন্তু... ওনারে আমরাও কিছুতি ছাড়তি পারি নে!'

'শুধুমাত্তর প্রেথম দৃশ্যেই তোমারে দশ-দশবার চুমা খায়্যেছে। না, এ অসহ্যি!'

ব্যাপার দেখে প্রথমটা তো আমরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তারপর অবশ্য ঈর্ষাকাতর স্বামীকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করা গেল।

কারাবানভ বলল, 'কিন্তু, কমরেড, স্টেজের উপর চুমা খাওয়ার কোনো মানে নাই।'

'মানে আছে কি নাই তা বোঝার মতন দিষ্টি আছে আমার, বোঝলে? ভাব্যো কী, আমি অন্ধ নাকি? আমি এতক্ষণ প্রেথম সারিতি বস্যে ছেলাম তা জানো?..'

লাপতকে আমি আড়ালে ডেকে বললুম:

'তোমার তো খুব বুদ্ধি আছে। দ্যাখো-না, বুঝিয়েসুঝিয়ে কোনোরকমে লোকটিকে রাজি করাতে পার কিনা!'

অতঃপর যেমন তার অভ্যাস সেই অনুযায়ী চরম নিখুঁতভাবে কাজ শুরু করল লাপত। ঈর্ষাকাতর স্বামীটিকে কোটের বোতাম ধরে টেনে একটা বেঞ্চির ওপর তাকে বসিয়ে দিল সে, তারপর ফিস্‌ফিস করে তার কানে অবিশ্রান্ত গদ্‌গদ বাক্যস্রোত ঢালতে শুরু করল:

'আরে, আপনে তো দেখি ভারি মজার লোক! এমন এট্টা দরকারি, সাংস্কৃতিক ব্যাপার নিয়ি এমন কাণ্ড করতিছেন যে কী বলি! আপনের ইস্তিরি এমন এট্টা মহৎ উদ্দেশ্যে যদি কারেও চুমা দ্যান তাইলি তাতে ভালো ছাড়া মন্দ হবার নয়, বোঝলেন!'

'ওয়া অন্যির পক্ষি ভালো হতি পারে, কিন্তু আমার পক্ষি এক কানাকড়িও ভালো নয়,' টেলিগ্রাফ-অপারেটর তবু তার জিদ ছাড়তে রাজি নয়।

'তা ক্যানে? সক্কলের পক্ষেই এয়া মঙ্গলজনক!'

'তাইলি, তোমার মতে, যে-কেউ আমার ইস্তিরিরে চুমা দিতি পারে?'

'আচ্ছা মজার লোক তো আপনে! মাত্তর একজনায় চুমা দেয়ার থেকো এয়া ভালো নয় কি?'

'কোন একজনা?'

'আরে এমনডা তো মাঝি-মাঝি হয়... আর তা হলি? ব্যাপারডা চিন্তা করেন একবার! এখেনে সক্কলের চোখির সামনি ব্যাপারডা ঘটতিছে, আপনেও নিজির চোক্ষি দেখতিছেন সবকিছু। কিন্তু এইসব কাণ্ডমাণ্ড যদি ঝোপঝাড়ির আড়ালি হত্য আর আপনে যদি এয়ার বিন্দুবিসগ্গ জানতি না পারত্যেন, তাইলি ব্যাপারডা আরও অনেক খারাপ দাঁড়াত্য নাকি?'

'আমার ইস্তিরি কখনও অমন খারাপ কাজ করত্য না!'

'কে কয়েল্য করত্য না? ওনি এমন চমৎকার চুমা দিতি পারেন, তা আপনে কি মনে করেন এমন একখান ক্ষ্যামতা ওনি শুধা-শুধা নষ্ট হতি দিতেন? কাজেই, স্টেজের উপর চুমা দিতি দেয়াটা বেশি ভালো নয় কি?..'

লাপতের এহেন যুক্তিতর্ক শুনে অনেক কষ্টে তবে স্বামীপুঙ্গবটি কোনোরকমে নিমরাজি হল। তারপর, চুমোগুলো কিছুতেই যেন 'সত্যিকার' চুমো না হয় এই একটিমাত্র শর্তে, দাঁতে দাঁত চেপে তবেই স্ত্রীকে নাটকের অভিনয় শেষ করার অনুমতি দিল। অত্যন্ত অসন্তুষ্টভাবেই আমাদের অব্যাহতি দিয়ে সে ফের ফিরে গেল হলে। ফলে স্ত্রী-রত্নটি তো ভারি বিচলিত হয়ে পড়ল। আমাদেরও ভয় ধরে গেল, নাটকটা বুঝি একেবারে মাটি হয়ে যায়।

ওদিকে স্বামীটি গিয়ে বসে রইল দর্শকদের একেবারে প্রথম সারিতে, আর প্রকাণ্ড অজগরের মতো চোখের দৃষ্টি দিয়ে সকলকে অবশ করে ফেলতে লাগল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় চলল একেবারে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের আবহাওয়ার মধ্যে. কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক শুরু হতে-না-হতে দেখা গেল স্বামীপুঙ্গবটি আর দর্শকদের প্রথম সারিতে বসে নেই। ফলে আমরা সকলেই দারুণ খুশি হয়ে উঠলুম। তবে লোকটার হল কী তা ঠিক বুঝলুম না। নাটকের অভিনয় শেষ হবার পর অবশ্য ব্যাপারটার রহস্য পরিষ্কার হল। ভালোমানুষের মতো মুখ করে কারাবানভ জানাল:

'আমি ওরে ওখান থেক্যে চলে যেতে বললাম। প্রথমে লোকটা কথা শুনতি চাচ্ছিল না, তা পরে রাজি হয়ে গেল।'

'কিন্তু রাজি করালে কী ভাবে?'

কারাবানভের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। লোকটির সঙ্গে যেভাবে ও কথা বলেছিল তার অনুকরণে বীভৎসরকম মুখবিকৃতি করা হিস্‌হিসিয়ে বললে:

'শোনেন! এট্টা বোঝাপড়ায় আসা যাক, কী বলেন! আজ সবকিছু ঠিকমতন চলবে, কোনো গণ্ডগোল হবে না। তবে আপনে যদি এখ্‌খনি না চলে যান, তাইলি আমি আপনেরে আমাদের কলোনি-বাসিন্দাদের হক কথা বলে রাখতেছি, আপনের ইস্তিরিরে আমরা নষ্টভ্রষ্ট করবই। আমাদের এখেনে এমন-এমন সব যোয়ান ছেল্যা আছে যে আপনের ইস্তিরি তাদের ঠেকায়ে রাখতি পারবে না!'

'তারপর? তারপর কী হল?' অভিনেতারা দারুণ খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'কী আবার? লোকটা খালি বলল: 'দেখো, তমাদের জবান য্যানে ঠিক থাকে'। তারপর একবারে পিছনের বেঞ্চিতে চলে গেল।'

প্রতিদিন আমাদের রিহার্সাল হোত, আর প্রতিদিনই পুরো নাটকটা আগাগোড়া ঝালিয়ে নেয়া হোত। ফলে যথেষ্ট ঘুম না-হওয়া আমাদের একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কথাটা মনে রাখা দরকার যে আমাদের অভিনেতাদের অনেকেই তখনও পর্যন্ত স্টেজের ওপর ঠিকমতো হাঁটাচলায় বা এদিক-ওদিক করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। আর তাই হাতপায়ের প্রতিটি নাড়াচাড়া, মাথা ঘোরানোর প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি

ঘুরে দাঁড়ানোর পদ্ধতি থেকে শুরু করে গোটা নাটকের সমস্ত ভাবভঙ্গিই তাদের মুখস্থ করাতে হোত। নাটক অভিনয়ের এই দিকটাতেই আমি সমস্ত দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছিলুম, আর ভরসা রেখেছিলুম যে অভিনয়ের সময় পার্টের কথা যে-কোনো প্রকারে যুগিয়ে দেবে প্রম্‌টার। এইভাবে চলার পর শনিবার সন্ধের মধ্যে নাটকটি মঞ্চস্থ করার উপযোগী হয়েছে বলে ধরে নেয়া হোত।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের অভিনয় নেহাত মন্দ হোত না। বহু শহুরে লোকও আমাদের নাট্যাভিনয় দেখে তখন খুশি হয়েছিল। আমরা অভিনয় করার চেষ্টা করতুম শিল্পসম্মতভাবে - বেশি বাড়াবাড়ি, সাধারণের স্থূলরুচিকে প্রশ্রয়দান কিংবা সহজে বাজিমাতের ধারেকাছে ঘেঁষতুম না। সাধারণত ইউক্রেনীয় ও রুশ নাটক মঞ্চস্থ করতুম আমরা।

শনিবার-শনিবার দুপুর দুটো থেকেই থিয়েটর-হলকে ঘিরে কর্মচঞ্চলতা জেগে উঠত। যেদিনকার নাটকে অনেক পাত্রপাত্রী থাকত সেদিন দুপুরের খাওয়ার পরই বুত্‌সাই পিওত্‌র ইভানভিচকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রপাত্রীদের মেক-আপ শুরু করে দিতেন। দুপুর দুটো থেকে সন্ধে আটটার মধ্যে ষাটজনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীর মেক-আপ শেষ করে ফেলতেন তাঁরা, তারপর নিজেদের মেক-আপের কাজ সাঙ্গ করতেন।

অভিনয়ের প্রয়োজনে যখন আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস সংগ্রহের দরকার পড়ত, কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা তখন তৎপর হয়ে উঠত একেবারে বন্য জন্তুর মতো। ধরুন, যদি স্টেজের ওপর নীল ঢাকনাওয়ালা টেবল-ল্যাম্পের দরকার পড়ত তাহলে তারা যে শুধু কলোনির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের ঘরেই হানা দিত তা নয়, শহরে তাদের চেনা-পরিচিত, বন্ধুবান্ধবের ঘরে-ঘরেও হানা দিত তারা, আর শেষপর্যন্ত দেখা যেত নীল ঢাকনাওয়ালা ল্যাম্প ঠিক যোগাড় হয়ে গেছে। স্টেজে যদি রাত্রের খাওয়া দেখানোর দৃশ্য থাকত, তাহলে খাবারটা একেবারে সত্যিকার হতে হোত, তাতে কোনো ফাঁকি থাকলে চলত না। ছয়-'স' মিশ্র বাহিনীর নিখুঁত, পরিপাটি কাজের ফলেই যে এটা ঘটত তাই নয়, আমাদের ঐতিহ্যেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এটা। কারণ, স্টেজের ওপর নকল খানা সাজিয়ে দেয়াটাকে আমাদের অভিনেতারা কলোনির অযোগ্য কাজ বিবেচনা করত। ফলে কখনও-কখনও আমাদের রান্নাঘরকে

রীতিমতো কঠিন কাজের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিতে হোত — যেমন, চাটনি আর চানাচুরের মতো মুখরোচক খাবার, পিঠে বা কেক, ইত্যাদি বানানো। এছাড়া মদের বদলে আমরা ব্যবহার করতুম যে-কোনো ফলের রসের মতো হালকা পানীয়।

নাটকে খাওয়ার দৃশ্য থাকলেই প্রম্‌টারের বাক্সে বসে আমাকে সদাসতর্ক হয়ে থাকতে হোত। ওই সব দৃশ্যে অভিনেতারা তাদের নিজ-নিজ ভূমিকাপালনে এতই তন্ময় হয়ে থাকত যে তারা প্রম্‌টারের কথা কানে তুলত না, আর যতক্ষণ-না খাওয়ার পাত্রগুলো একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ দৃশ্যটাকে টেনে লম্বা করে নিত। দৃশ্যটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করার জন্যে আমাকে তখন প্রায়ই এই ধরনের মন্তব্য করতে হোত:

'হয়েছে, হয়েছে, ওতেই চলবে... শুনতে পাচ্ছ? আরে, খাওয়া বন্ধ কর-না, আ মলো যা!'

অভিনেতারা তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাত, কখনও-বা টেবিলের ওপরকার আধ-খাওয়া হাঁসটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে দেখাত, আর টেবিল ছেড়ে উঠত একমাত্র তখনই যখন রাগে ফুসতে-ফুসতে আমি হিস্‌হিসিয়ে বলতুম:

'কারাবানভ শিগ্‌গির টেবিল ছেড়ে ওঠ্‌ বলছি! ওরে বাঁদর, ওরে সেমিওন, বল্‌: 'আমি চললাম!' '

অবশেষে মুখের মধ্যেকার অর্ধেক-চিবনো হাঁসের মাংসর গ্রাসটা কোনোরকমে গিলে তখন কারাবানভ বলত:

'আমি চললাম!'

আর তারপর দুই অঙ্কের ফাঁকে বিরতির সময়ে উইংসের মধ্যে সে আমায় অনুযোগ করে বলত:

'আন্তন সেমিওনভিচ, প্রাণে ধরে করতি পারলেন কাজটা? জীবনে এমন একখান হাঁস খাতি পাওয়ার সুযোগ জোটে ক'বার, বলেন দেখি? আর আপনি কিনা আমাদের হাঁসটা শেষ করতিই দিলেন না!'

তবে এরকম ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে কুশীলবরা যে স্টেজের ওপর বেশিক্ষণ থাকতে চাইত তা নয়। কেননা স্টেজের ভেতরটা একেবারে বাইরের মতোই কনকনে ঠান্ডা হতে থাকত।

'যন্ত্র-উৎসব' নাটকে কারাবানভকে কেবল লেঙ্‌টিমাত্র সার করে পুরো

একটি ঘণ্টা স্টেজে থাকতে হয়েছিল। নাটকটা অভিনীত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে, এবং আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে থার্মোমিটরের পারা তখন কখনও-কখনও হিমাঙ্কেরও তিরিশ ডিগ্রি নিচে* নেমে যাচ্ছিল। অভিনয়ের আগে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না বারবার দাবি জানাচ্ছিলেন নাটকটা বাতিল করার জন্যে, বলছিলেন তা না করলে সেমিওন নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাবে। কিন্তু দেখা গেল সবই ভালোয়-ভালোয় উতরে গেছে কেবল সেমিওনের পায়ের আঙুলগুলো গেছে জমে। সেদিন নাটকের ওই অঙ্কটির অভিনয়ের পরে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না কী-যেন একটা ওষুধ দিয়ে সেমিওনের পায়ের আঙুলগুলো মালিশ করে ফের গরম করে তুলেছিলেন।

তবে ঠাণ্ডাটা কখনও-কখনও আমাদের শিল্পগত শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধা হয়েও দাঁড়াত। তখন 'কমরেড সেমিভ্জ্ভোদ্নি' নামে একটা নাটক মঞ্চস্থ করছিলুম আমরা। নাটকটির দৃশ্যপট ছিল কোনো এক জমিদারের বাগান, আর সেখানে পাথরের একটা মূর্তি থাকার কথা। আমাদের ছয়-'স' মিশ্র শহরের সব ক'টা কবরখানা চুঁড়ে বেড়ানো সত্ত্বেও পাথরের মূর্তি যোগাড় করতে পারল না। অগত্যা তারা ঠিক করল যে মূর্তি ছাড়াই কাজ চালিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু অভিনয়ের দিন যখন মঞ্চে যবনিকা উঠল তখন অবাক হয়ে দেখি স্টেজে একটা মূর্তি রয়েছে আসলে শেলাপুতিনকে ঘন করে খড়িমাটির গুঁড়ো মাখিয়ে আর একখানা চাদরে পাকিয়ে মূর্তি বানানো হয়েছিল। কাপড়ে-ঢাকা একখানা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পিট্‌পিট করে সে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলিয়ে দিয়ে 'পাথরের মূর্তি'টাকে তাড়া করে স্টেজ থেকে সরালুম। এতে ছয়-'স' মিশ্র অবশ্য খুবই মর্মাহত হল।

ছয়-'শস' (শব্দ-সংযোজনার ভারপ্রাপ্ত) মিশ্র-র এসব ব্যাপারে আবার মাথা খুলত ভারি আশ্চর্য ধাঁচে। সবরকমের শব্দ একেবারে যথাযথ হতে হবে, এ-ই ছিল তাদের আন্তরিক বাসনা ও প্রয়াস। আমরা সে-সময়ে 'আজেফ' নাটক মঞ্চস্থ করছি। নাটকে সাজোনভের একটা বোমা ছোড়ার কথা প্লেভের দিকে।

* সেল্‌সিয়াস বা সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটর অনুসারী। ফারেনহাইট থার্মোমিটর অনুযায়ী এই উত্তাপ + ২২°র সমান। — অনুঃ

বোমাটা আবার স্টেজের ওপরই ফাটার দরকার ছিল। ছয়-'শস' মিশ্র-র দলনেতা অসাদ্‌চি ঘোষণা করল:

'আমরা এট্টা সাত্যিকার বিস্ফোরণ ঘটাব।'

যেহেতু প্লেভের ভূমিকায় স্বয়ং আমার অভিনয় করার কথা, তাই অন্য সকলের চেয়ে আমিই এ-ব্যাপারটায় বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, ''সাত্যিকার বিস্ফোরণ' বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

'এমন এট্টা বিস্ফোরণ যাতে থিয়েটারের নামডাক চারদিকি ছড়াবে-নে।'

সতর্কভাবে বললুম, 'কিন্তু ব্যাপারটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে নাকি?'

'না-না, সব ঠিক হব্যে-নে,' অসাদ্‌চি আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। 'দ্যাখবেন, শেষে ও-সব ঠিক হয়্যে যাবে-নে।'

বিস্ফোরণের দৃশ্যটি অনুষ্ঠিত হবার আগে অসাদ্‌চি আমাকে তার যোগাড়যন্ত্রগুলো দেখাল। দেখলুম, একদিকে উইংসের আড়ালে কয়েকটা খালি বালতি রাখা রয়েছে আর প্রতিটি বালতির পাশে দোনলা বন্দুক হাতে একজন করে কলোনির ছেলে দাঁড় করানো। বন্দুকগুলোতে এতটা করে বারুদ ভরা যা দিয়ে অন্ততপক্ষে একটা হাতি মারা চলে। এছাড়া স্টেজের অপর দিকে মেঝের ওপর কিছু কাচের টুকরো ছড়ানো আর প্রতিটি কাচের টুকরোর পাশে একখানা করে ইট হাতে একজন করে কলোনি-বাসিন্দা দাঁড়ানো। কিন্তু এই-ই সব নয়। তৃতীয় আরেকটা দিকে, স্টেজে ঢোকার মুখটার বিপরীত দিকে, দেখলুম আন্দাজ আধ-ডজনটাক ছেলে দাঁড় করানো। জ্বলন্ত মোমবাতি সামনে রেখে তাদের প্রত্যেকে কী-যেন একটা তরল পদার্থে ভরা বোতল হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে আছে।

শেষোক্ত ছেলেদের দেখিয়ে বললুম, 'তা, এই শবযাত্রার ব্যবস্থাটা কী জন্যে?'

'বোঝলেন না? ওইটাই হল্য গিয়ে আসল ব্যাপার। ওই বোতলগুলোয় প্যারাফিন-তেল আছে। বিস্ফোরণের সময় আলি ছোঁড়ারা ওই তেল মুখে পুরি মোমবাতির আগুনের উপর ফুঁ দেবে-নে। তারপর যা চমৎকার একখান দৃশ্য হবে যে কী বলি!'

'আ মলো যা!.. থিয়েটরে আগুন লাগবে যে!'

'কিস্‌স্যুটি ভাববোন না, কেবল সাবধান থাকবোন চোখে যেন প্যারাফিন-তেল না যায়। আর আগুন যদি লাগেই, সে আমরা নিবায়ো দেব-নে।'

এই বলে আঙুল দিয়ে আরেক সার ছেলেকে দেখিয়ে দিল ও। দেখলুম, ওদের পায়ের কাছে জলভরা কতগুলো বালতি রয়েছে।

তিনদিক থেকে এই ধরনের রণসাজের প্রস্তুতি দেখে নাটকের চরিত্র সেই হতভাগ্য মন্ত্রীটির আসন্ন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা সত্যি-সত্যি আমারও মনে সঞ্চারিত হল। বেশ একটু দুর্ভাবনা নিয়েই নিজেকে বোঝালুম যে প্লেভের সকল অপরাধের জন্যে জবাবদিহি করতে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেহেতু বাধ্য নই, সেইহেতু যদি গুরুতর কোনো ব্যাপার ঘটে তাহলে অডিটোরিয়মের মধ্যে দিয়ে পালাবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। তবু আরও একবার অসাদ্‌চির অতিরিক্ত উৎসাহের আগুনে জল ঢালার প্রয়াস পেলুম।

শুধোলুম, 'কিন্তু প্যারাফিনের আগুন কি জলে নিবনো সম্ভব?'

কিন্তু অসাদ্‌চিকে কাবু করা অসম্ভব ছিল। এ-সব ব্যাপারের খুঁটিনাটি ছিল ওর নখদর্পণে, আর অত্যন্ত পণ্ডিতি চালে তার ব্যাখ্যাও দিতে পারত সে।

অসাদচি বোঝাতে লাগল, 'প্যারাফিন-তেল যখন ফু দিয়ি মোমবাতির আগুনে ছোড়া হয় তখন তা পরিণত হয়ো যায় গ্যাসে, আর তখন তারে নিবানোর দরকার পড়ে না। তবে তখন অন্য সব জিনিসপত্তর নিবানোর দরকার পড়তি পারে...'

'যেমন, আমাকে? নাকি?'

'আপনেরে আমরা পের্‌থমেই বার করি দেব-নে।'

অগত্যা ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হল। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম যে যদি জীবন্ত দগ্ধ হয়ে না-ও মরি তাহলেও আমার গায়ে অন্তত ঠান্ডা জল ঢালতে হবে, আর তা-ও কিনা হিমাঙ্কের বিশ ডিগ্রি নিচের ঠান্ডা আবহাওয়ায়! কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে যারা অতখানি শক্তিব্যয় করে আর মাথা খাটিয়ে অমন একটা ব্যবস্থা খাড়া করেছিল সেই গোটা ছয়-'শস' মিশ্র'র সামনে দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দেয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না মোটেই।

সাজোনভ যখন বোমাটা ছুড়ল তখন আরও একবার সত্যিকার প্লেভে বনে

যাওয়ার সুযোগ ঘটল আমার এবং তার অবস্থাটা বিশেষ ঈর্ষণীয় ঠেকল না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে শিকারের রাইফেলগুলো ছোড়া হল খালি বালতিগুলো তাক করে আর বালতিগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝন করে। ফলে বালতিগুলোর জোড়ের মুখগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের পর্দাও যেন গেল ফেটে। সঙ্গে সঙ্গে ইটগুলোও প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল কাচের ভাঙা টুকরোগুলোর ওপর, আর অল্পবয়সী ছেলেদের ফুসফুসে যত জোর আছে ততখানি জোরে পাঁচ-ছটা মুখ থেকে প্যারাফিন-তেল ঝড়ের বেগে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোমবাতিগুলোর আগুনের শিখায়। ফলে, একেবারেই আচমকা গোটা স্টেজটা পরিণত হল দম-আটকানো একটা অগ্নিকুণ্ডে। কাজেই ইচ্ছে করলেও আমার মৃত্যুর অভিনয় দায়সারাভাবে সারার আর উপায় রইল না। বলতে গেলে প্রায় জ্ঞানহারা হয়েই লুটিয়ে পড়লুম আমি। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল কানে তালা-ধরানো হাততালি আর ছয়-'শস' মিশ্র-র ছেলেদের প্রবল উৎসাহজ্ঞাপক চিৎকার উঠল রে-রে করে। ওপর থেকে কালো, তেলচিটে প্যারাফিনের একগাদা ছাইও এসে পড়ল আমার গায়ে। অতঃপর পর্দা পড়ে গেল আর আমার দুই বগলে হাত দিয়ে আসাদুচি টেনে তুলল আমাকে। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল :

'আপনের শরীলের কোথাও পুড়্যে যায় নাই তো?'

শরীরে নয়, আগুন ধরে গিয়েছিল আমার মনে। কিন্তু সে-কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলুম না। মনে-মনে ভয় ছিল – কে জানে ছয়-'শস' মিশ্র তারও কোনো একটা প্রতিষেধক তৈরি করে রেখেছে কিনা! আর তা প্রয়োগ করলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে আর-কি!

ওই পদ্ধতিতে আরও একবার একখানা স্টিমার উড়িয়ে দিলুম আমরা। বেচারা স্টিমারখানা দুর্ভাগ্যক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী সমুদ্রতটে এসে ভিড়েছিল। এই ব্যাপারটার যোগাড়যন্ত্র অবশ্য আগের চেয়ে আরও জটিল ধরনের ছিল। কেননা, এ-ব্যাপারের ব্যবস্থাপকদের কাছে শুধু-যে স্টিমারখানার প্রতিটি পোর্টহোল থেকে আগুনের ঝলক বেরনোর দরকার ছিল তাই নয়, বিস্ফোরণের ফলে স্টিমারখানা-যে সত্যি-সত্যিই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে সেটাও নাকি দেখানোর বিশেষ দরকার ছিল। এই উদ্দেশ্যে কলোনির কিছু ছেলে স্টিমারখানার আড়ালে অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা কাঠের তক্তা, চেয়ার, টুল, এ-সমস্ত

ওপর দিকে ছুড়তে শুরু করল। যাই হোক, তারা নিজেরা কোনোরকমে ওইসব বস্তু থেকে নিজেদের মাথা বাঁচাতে সক্ষম হলেও জাহাজের ক্যাপ্টেন পিওত্র ইভানভিচ গরোভিচের ভাগ্য অতটা ভালো ছিল না। তার জামার হাতায়-লাগানো কাগজের তৈরি সোনালি লেস-এ আগুন লেগে গিয়েছিল. তাছাড়া পড়ন্ত আসবাবপত্রের ঘায়ে সে জখমও হয়েছিল ভালোরকম। কিন্তু এ নিয়ে সে যে কিছু অনুযোগ-অভিযোগ করল না তা-ই নয়. উলটে তার দমফাটা হাসি থামা পর্যন্ত আধ-ঘণ্টাটাক আমাদের অপেক্ষাই করতে হল। অতঃপর ভালোরকম পরীক্ষা করে তবে আমরা নিশ্চিত হলুম যে আমাদের ক্যাপ্টেন-সাহেবের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব যথাস্থানে আছে।

কিছু-কিছু ভূমিকায় অভিনয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত। যেমন ছিল গুলি খেয়ে মরার অভিনয় করা। কেননা কলোনি-বাসিন্দারা 'স্টেজের বাইরে থেকে' গুলির আওয়াজ করার ব্যাপারে একদম রাজি হোত না। তাদের বক্তব্য ছিল, স্টেজের ওপর যদি কাউকে গুলি করতে হয় তাহলে গুলি খেয়ে রীতিমতো কষ্ট পাওয়ার জন্যে লোকটিকে তৈরি থাকতে হবে বৈকি। গুলি করে মারার জন্যে সাধারণত মামুলি ধরনের রিভলবার ব্যবহার করা হোত, তবে কার্তুজ থেকে বুলেট-অংশটা বের করে নিয়ে তার জায়গায় ভরে দেয়া হোত শণ আর তুলোর গোল্লা। তারপর আসল মুহূর্তে উদ্দিষ্ট লোকটির দিকে দমাদ্দম গুলি চালানো হোত, আর এই মজার খেলায় আততায়ী প্রায়শই এত আত্মহারা হয়ে পড়ত যে সে অপর লোকটির একেবারে চোখ লক্ষ্য করে গুলি চালাতেও পিছ-পা হোত না। একসঙ্গে যদি বেশ কয়েকবার গুলি চালানোর দরকার পড়ত তাহলে ওই একই রকম নারকীয় পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্যে রিভলবারের পুরো নলটাই কার্তুজে ভরতি করে নেয়া হোত।

থিয়েটর-হলের দর্শকদের অবস্থা অবশ্য আমাদের চেয়ে ভালো ছিল। গরম ওভারকোট গায়ে দিয়ে বসে থাকতে পারত তারা, তাছাড়া ঘরের এখানে-সেখানে চুল্লী তো বসানো থাকতই। তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা ছিল সূর্যমুখীর বিচি খেয়ে যত্রতত্র খোসা ছড়ানোয় আর মাতাল হয়ে থিয়েটর দেখতে আসায়। আমাদের পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করার পর কারো গায়ে এতটুকু মদের গন্ধ পেলেই তাকে মাতাল বলে গণ্য করা হোত। কলোনির বাসিন্দা ছেলেরা কয়েক শো দর্শকের মধ্যে কার গা

6*

থেকে যে এই গন্ধ কিংবা তার ছিটেফোঁটাও বেরচ্ছে তা ঠিক টের পেয়ে যেত, আর তার চেয়েও ওস্তাদ ছিল তারা সেই সব লোককে জবরদস্তি বেঞ্চি থেকে টেনে তুলে অপমান করে থিয়েটর হল থেকে বের করে দিতে। এমন কি আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত আপত্তি দেখিয়ে যখন কেউ বলত, 'মাইরি, বলত্যেছি, সেই কোন সক্কালবেলা একমগ বিয়ার খায়্যেছি তারপর আর কিচ্ছুটি খাই নাই,' তখনও তারা নির্মমভাবে সে-কথায় কান দিত না।

নাটকের প্রযোজক হিসেবে আমাকে যন্ত্রণাভোগ করতে হোত সবার চেয়ে বেশি করে — তা কি অভিনয়ের সময়ে কি তার আগে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, কোনো বিশেষ নাটকে বিশেষ একটি বাক্য উচ্চারণের সময় কুদ্‌লাতি প্রতিবার হাস্যকরভাবে শব্দগুলো তালগোল পাকিয়ে ফেলছিল। আবার আরেকবার গোগলের 'ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল' নাটকের অভিনয়ের সময় ছেলেরা আগাগোড়া চমৎকার অভিনয় করে যাওয়ার পর নাটকের একেবারে শেষদিকে পৌঁছে আমাকে হঠাৎ একেবারে খেপিয়ে তুলেছিল। নাটকটিতে আমি গভর্নর আন্তন আন্তনভিচের ভূমিকায় অভিনয় করছিলুম। একেবারে শেষ অঙ্কে অন্য অভিনেতারা হঠাৎ আমাকে যখন আন্তন সেমিওনভিচ বলে সম্বোধন করতে শুরু করল তখন এমন কি আমার পোড়-খাওয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষেও তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। দৃশ্যটাকে তারা চালিয়ে নিয়ে গেল এইভাবে:

আমোস ফিওদরোভিচ। কথাটা কি ঠিক, আন্তন সেমিওনভিচ? সত্যিই কি আপনার এমন আশ্চর্য সৌভাগ্য ঘটেছে?

আর্তেমি ফিলিপ্পোভিচ। আন্তন সেমিওনভিচকে তাঁর এই অসামান্য সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন জানাতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি। কথাটা যখন কানে এল তখনই আন্তরিক খুশি হয়েছিলুম। আন্না আন্দ্রেয়েভ্‌না! মারিয়া আন্তনভ্‌না! শুনুন, শুনুন!

রাস্তাকোভ্‌স্কি। অভিনন্দন জানাচ্ছি, আন্তন সেমিওনভিচ! ঈশ্বরের কৃপায় আপনার এবং তরুণ দম্পতির দীর্ঘ জীবন, অসংখ্য সন্তানসন্ততি, নাতিনাতনি আর নাতির পুতি লাভ হোক। আন্না আন্দ্রেয়েভ্‌না! মারিয়া আন্তনভ্‌না! শুনুন, শুনুন!

করোব্‌কিন। আন্তন সেমিওনভিচকে অভিনন্দন জানাতে পেরে কৃতার্থ হচ্ছি!

ব্যাপারটা আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে স্টেজের ওপর গভর্নরের উর্দি গায়ে চাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল বলে আমার পক্ষে ওই শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করা সম্ভব হচ্ছিল না। একমাত্র সবশেষের মূকাভিনয়-সম্পর্কিত দৃশ্যটির পর উইংসের ভেতরে এসে তবেই সম্ভব হল মেজাজ দেখানো:

'আ মলো যা, এ-সবের মানে কী? আমাকে বোকা বানাচ্ছিলে নাকি? ইচ্ছে করেই কাণ্ডটা করছিলে সবাই, তাই না?'

শুনে অবাক চোখ মেলে সকলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পোস্টমাস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করছিল জাদোরভ। সে শুধোল:

'ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে বলুন তো? সবকিছুই তো ভারি চমৎকার উতরে গেছে!'

'তোমরা আমাকে আন্তন সেমিওর্নাভিচ বলে ডাকছিলে কেন?'

'তাহলে? কী বলে ডাকা উচিত ছিল?.. ওহো, তাই তো!.. ধুত্তোরি!.. গভর্নরের নাম ছিল তো আন্তন আন্তনভিচ, তাই তো বটে!'

'কিন্তু রিহার্সালের সময় তোমরা তো আমায় ঠিক নামেই ডাকছিলে।'

'কী কেলেঙ্কারি... তবে বুঝলেন কিনা, রিহার্সাল হল গিয়ে রিহার্সাল, আর স্টেজে উঠলে কেন যেন মাথার ঠিক থাকে না...'

৫

কুলাকসুলভ শিক্ষা

২৬ মার্চ তারিখে আ. ম. গোর্কির জন্মদিবসের উৎসব উদ্‌যাপন করলুম আমরা। এছাড়া অন্যান্য স্মৃতিদিবসও আমরা উদ্‌যাপন করতুম, তবে তাদের কথায় পরে আসছি। উৎসবগুলোয় যাতে জনসমাগম ভালো হয় আর টেবিলগুলোয় রকমারি খাবারদাবারের বাহার খোলে তার জন্যে চেষ্টা চালাতুম আমরা। তাছাড়া এটাও বলতে হয় যে কলোনির বাসিন্দারা উৎসবের অনুষ্ঠান করতে, বিশেষ করে উৎসবের প্রস্তুতির কাজ চালাতে ভারি ভালোবাসত। তবে গোর্কির জন্মদিবসের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমাদের কাছে। ওইদিন নবীন বসন্তকেও আমরা অভ্যর্থনা জানাতুম। এটাও

ওইদিনের একটা ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কখন-কখনও এমনও হোত যে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে যাতে ভোজে যোগ দিতে পারি তার জন্যে ছেলেরা ভোজের টেবিলগুলো পাতত   বলা বাহুল্য, ঘরের বাইরে খোলা জায়গায়, আর এমন সময়ে পুব দিক থেকে বলা-নেই-কওয়া-নেই একেবারে আচমকা একটা ঝড়ের ঝাপট আসত আর প্রচণ্ড জোরে নামত অকরুণ তুষারবৃষ্টি। তারপর দেখতে-দেখতে উঠোনের নিচু জায়গাগুলোয় জমাট-বাঁধা জলে কুঞ্চনরেখা দেখা দিত, আর উৎসব উপলক্ষে পতাকা অভিবাদনের জন্যে ব্যবহার্য উঠোনে বের-করে-রাখা ড্রামগুলো জলে ভিজে ঢ্যাবঢ্যাব করতে থাকত। তবু, এতসব সত্ত্বেও, দূর পুবের দিকে তেরছা চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে হয়তো কোনো কলোনি-বাসিন্দা বলত:

'আহ্, বসন্তের কেমন সুবাস পাওয়া যাচ্ছিছে!'

গোর্কি-সম্পর্কিত আমাদের এই বাৎসরিক উৎসবের এমন একটি বিশেষত্ব ছিল আমরা নিজেরাই ছিলুম যার আবিষ্কর্তা এবং যার সম্বন্ধে আমরা ছিলুম যেমন অত্যধিক গর্বিত তেমনই আসক্তও। অনেক আগে থেকেই কলোনি-বাসিন্দারা স্থির করেছিল যে ওই দিনটিকে উদ্‌যাপন করব আমরা 'সর্বশক্তি দিয়ে', তবে এ-উপলক্ষে বাইরের একজনকেও আমন্ত্রণ জানাব না। বাইরের কেউ যদি মতলব করে ওইদিন এসেও হাজির হয় তাহলে সে নিজে উদ্যোগ নিয়ে এসে পড়েছে বলে আমাদের বাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে গণ্য হবে এইমাত্র, তবে গোটা ব্যাপারটা হবে আমাদের পারিবারিক উৎসব, বাইরের কারও সে-উৎসবে কোনো অংশ থাকবে না। আর সত্যিই সবকিছু অনুষ্ঠিত হোত সেদিন অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে, ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার আবহাওয়ায় এবং গোর্কিপন্থীরা হয়ে উঠত পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ। তবে উৎসব উদ্‌যাপনের ধরনে অবশ্য ঘরোয়া আনাড়িপনার স্থান থাকত না। উৎসব শুরু করতুম আমরা কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে, আর পতাকাটিকে বের করে আনতুম আনুষ্ঠানিকভাবে; এরপর কয়েকটি বক্তৃতা হোত আর অনুষ্ঠিত হোত গোর্কির প্রতিকৃতির সামনে শ্রদ্ধাপ্রদর্শক গাম্ভীর্যপূর্ণ কুচকাওয়াজ। অতঃপর টেবিলের চারপাশে বসতুম আমরা আর (মিথ্যে বিনয় করব না!) গোর্কির উদ্দেশ্যে 'স্বাস্থ্যপান' না করলেও আমরা খেতুম বটে -- একখানা ভোজের মতো ভোজ যাকে বলে! আর তখন, খেতে-খেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে কালিনা ইভানভিচ বলত:

'এখন আমি বোঝতে পারত্যাছি যে বুর্জোয়ারে, রক্তশোষাগুলারে মিথ্যামিথ্যি দোষারোপ করছি আমরা! এমন একখান জব্বর ভোজের পরে, বোঝলা কিনা, জ্যান্ত মানুষি দূরে থাক অবোলা জীবগুলা পের্যন্ত কাজ করতে নারাজ হইব...'

সেদিন আমাদের খাদ্যতালিকা হোত এইরকম: বর্শ্চ, তবে সাধারণ বর্শ্চ নয় — পরিবারের কর্তার নামকরণ হয়েছে যে-সন্তের নামানুসারে তাঁর তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাড়ির কর্ত্রী একমাত্র যে-জাতীয় বর্শ্চ বানান তা-ই। তাছাড়া মাংস, বাঁধাকপি, ভাত, পনির, আলু, বাজরা ইত্যাদির পুর-দেয়া পিঠে — আর প্রত্যেকখানা পিঠের আকার এত বড় যে কলোনি-বাসিন্দাদের পকেটে পর্যন্ত তা ধরত না। পিঠের পর আসত আগুনে-ঝলসানো শুয়োরের মাংস — বাজার থেকে কেনা যেমন-তেমন শুয়োর নয়, বিশেষ করে গোর্কি জন্মোৎসব উপলক্ষেই জবাই করার উদ্দেশ্যে তার আগের হেমন্তকাল থেকে আমাদের দশম বাহিনীর তত্ত্বাবধানে লালিত আমাদের নিজেদের শুয়োরের পাল থেকে বাছাই-করা শুয়োর। কী করে শুয়োরের পালের তত্ত্বাবধান করতে হয় কলোনির ছেলেরা তা জানত, কিন্তু শুয়োর জবাই করতে রাজি হোত না কেউই — এমন কি দশম বাহিনীর দলনেতা স্তুপিত্‌সিন পর্যন্ত বেঁকে বসল সেবার। বলল:

'আমি মারতি পারব না! ওডার জন্যি আমার দুঃখ্যু লাগে না বুঝি? ক্লিওপাত্রা বলে এত ভালো এট্টা মাদী শোর!'

অবশ্য শেষপর্যন্ত ক্লিওপাত্রাকে জবাই করা হল। কাজটা করল সিলান্তি অত্‌চেনাশ। আর নিজের কাজের জবাবদিহি করল সে এইভাবে:

'আমাদের শত্তুরগুলান মরা শোর খাউক — আমরা, যারে কয়, জ্যান্ত ভালো শোর জবাই কর‍্যে খাব-নে! ব্যাপারডা হল্য গে এই!'

যাই হোক, ক্লিওপাত্রাকে গলাধঃকরণ করার পর অবশেষে আমাদের পক্ষে পেটকে বিরতি দেয়া চলতে পারত, কিন্তু তার পরিবর্তে এবার টেবিলে এসে হাজির হয়ে গেল ঘন, টক মাঠায় ভর্‌তি বড়-ছোট নানা আকারের সব বাটি আর তাদের পাশাপাশি ডিশে বোঝাই-করা ভাজা পনির-পিঠে। আর দেখা গেল কলোনির একজনও বাসিন্দা তখন বিশ্রাম নেবার জন্যে ব্যস্ত নয়, বরং উলটো, ভাজা পিঠে আর টক মাঠায় তাদের মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়েছে। পিঠের পর এল ফলের জেলি, আর তা পরিবেশন করা হল

ভদ্দরলোকদের সমাজে যেমন ছোট পিরিচে দেয়া হয় সেভাবে নয় বড়-বড় স্যুপ-প্লেটে করে। আর, বলা বাহুল্য, কোনো কলোনি-বাসিন্দাকে আমি কোনোদিন পাঁউরুটি কিংবা পিঠেয় না-মাখিয়ে শুধুমুখে জেলি খেতে দেখি নি। একমাত্র এই শেষোক্ত পদটি খাওয়ার পরেই ভোজনপর্ব সমাধা হল বলে গণ্য করা হল। আর তারপর টেবিল ছেড়ে ওঠার সময়ে প্রত্যেককে একেকটা ছোট থলিতে করে কিছু মিষ্টি আর মধু-মাখানো বিস্কুট সিধে হিসেবে দেয়া হল। এ-উপলক্ষেও কালিনা ইভানভিচ একটা খাঁটি কথা বলে ফেলেছিল। তা হল এই :

'আহা, গোর্কির মতন লোকেরা যদি আরও ঘনঘন জম্মো লইতেন!'

ভোজের পর কলোনি-বাসিন্দারা কিন্তু বিশ্রাম নিতে গেল না, মিশ্র-ছয় বাহিনীর সদস্য হিসেবে তারা তখন 'নিচের মহল' নাটক অভিনয়ের যোগাড়যন্ত্র শুরু করল। এই নাটকটির অভিনয়ই ছিল আমাদের নাটকের মরশুমের শেষ পালা। দেখা গেল, নাটকটির অভিনয়ের ব্যাপারে কালিনা ইভানভিচের কৌতূহল প্রবল। ও খালি বলছিল :

'দেখা যাউক, দেখা যাউক, কেমনধারা নাটক এইটা। এই সব মহল-টহল লইয়া কত যে ব্যাখ্যান শুনছি-না, কিন্তু কখনও এসব নিজের চোক্ষে দেখি নাই। আর কেন য্যান নাটকটা পড়ার সুযোগ পের্যন্ত পাই নাই।'

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে অন্তত এক্ষেত্রে কালিনা ইভানভিচ তার দুর্ভাগ্যের এই আকস্মিকতার ব্যাপারটাকে বড়ই বেশিরকম বাড়িয়ে দেখছিল। কারণ, বাস্তবে বইয়ের রহস্যভেদে সে বিশেষ সমর্থ ছিল কিনা সন্দেহ। যাই হোক, কালিনা ইভানভিচ সেদিন দারুণ খোশমেজাজে ছিল, তাই তার সামর্থ্যের প্রশ্ন নিয়ে বাজে ওজর-আপত্তি তুললে তা রীতিমতো লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

গোর্কি-জন্মদিবস উদ্‌যাপনের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল ওই বছর। কম্‌সমোল সংগঠনের পরামর্শে সেবার 'কলোনি-বাসিন্দা' খেতাবটির প্রথম প্রচলন ঘটানো হল। তার আগে কলোনি-বাসিন্দারা আর শিক্ষকমণ্ডলী এই নতুন উদ্ভাবনার ব্যাপারটি নিয়ে দীর্ঘদিন বেশ গুরুত্বসহকারে নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর তবেই এটিকে ভালো মতলব ঠাহর করে একমত হয়। 'কলোনি-বাসিন্দা' খেতাব সেবার দেয়া হল একমাত্র তাদেরই যারা সত্যিই কলোনির মূল্য বুঝত ও তার উন্নতি ঘটানোর জন্যে কাজ করত। কিন্তু বাকি যারা তখনও পিছিয়ে ছিল, যারা ওজর-আপত্তি তুলত, কাজ করতে বললে গজগজ করত কিংবা কাজে ফাঁকি দিত, তারা তখনও নিছক 'রক্ষণাধীন' ছেলেমেয়ের

দলেই রয়ে গেল। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে এই শেষোক্ত দলে খুব বেশি ছেলেমেয়ে ছিল না -- সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা ছিল জনা বিশেকের মতো। পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরনোরাও এই 'কলোনি-বাসিন্দা' খেতাব পেলেন। তবে ঠিক হল যে শেষোক্তদের মধ্যে প্রথম বছর কাজ করার সময়ে যাঁরা এই খেতাব পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না তাঁদের কলোনি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

প্রতিটি 'কলোনি-বাসিন্দা' ওইদিন আমাদের বিশেষ ফরমায়েশ অনুযায়ী খারকভের একটি ফ্যাক্টরি থেকে তৈরি একখানা করে নিকেল-করা ব্যাজ পেল। ব্যাজগুলো ছিল জাহাজের লাইফবেল্টের আকারে তৈরি আর তার মধ্যে 'ম. গো.'* এই হরফ দুটি ও তার ওপরে ছোট্ট একটি লাল তারা ছিল খোদাই করা।

ওইদিন কুচকাওয়াজের সময় কালিনা ইভানভিচকেও একখানি ব্যাজ দেয়া হল। ব্যাজ পেয়ে সে তো মহা খুশি, আনন্দ গোপন করার চেষ্টা পর্যন্ত করল না সে। বলল:

'নিকলাই আলেকসান্দ্রভিচের** অধীনে তো বহুত্ দিনই কাম করলাম, তো তার বদলি পাইলাম কী? না, আমারে 'হুজার' ঘোড়সওয়ার সিপাই করা হইল মাত্তর। আর এই ভবঘুর‍্যাগুলা, এই অপদাত্থগুলা আমারে কিনা একখান পদক উপহার দিয়া বইল! তা কী আর করা! তয়, বোঝলা কিনা, এ ভারি আনন্দের ব্যাপার হইল! অরা যখন হাতে রাষ্ট্রক্ষ্যামতা পায় তখন যে অরা কতদূর কী কইরবার পাবে তা দেখলা তো! আপনেরা ন্যাংটা হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যেরে অরা পদক উপহার দেয়!'

কিন্তু আকস্মিকভাবে মারিয়া কনদ্রাতিয়েভ্না বোকভা কলোনিতে এসে উপস্থিত হওয়ায় কালিনা ইভানভিচের আনন্দপ্রকাশে কিছুটা ভাঁটা পড়ে গেল সেদিন। এর এক মাস আগে মারিয়া কনদ্রাতিয়েভ্না আমাদের সামাজিক শিক্ষা-বিভাগের জেলা দপ্তরে বদলি হয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের ভারপ্রাপ্ত অব্যবহিত বিভাগীয় কর্ত্রী না-হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছু পরিমাণে আমাদের হালচালের ওপর নজর রাখছিলেন।

* ম. গো. — মাক্সিম গোর্কি। — অনুঃ

** নিকলাই আলেকসান্দ্রভিচ — জার দ্বিতীয় নিকলাস। — অনুঃ

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে-নামতে অবাক হয়ে সেদিন তিনি আমাদের ভোজের টেবিলগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। টেবিলগুলোয় যাদের খাবার দেয়া হয়েছিল সেইসব কলানি-বাসিন্দা তখন ভোজনপর্ব সাঙ্গ করছিল। আগন্তুক মহিলার এই তাজ্জব বনে-যাওয়ার ও অন্যমনস্কতার সুযোগটুকু নিয়ে কালিনা ইভানভিচও আমার ঘাড়ে তার অন্যায় ঠেলা সামলানোর দায়দায়িত্ব চাপিয়ে নিজে অলক্ষিতে অদৃশ্য হবে গেল।

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের উৎসব চলছে আপনাদের?'

'গোর্কির জন্মদিবস উদ্‌যাপনের।'

'তা আমাকে যে বড় নেমন্তন্ন করেন নি?'

'এ-দিনটায় আমরা বাইরের কোনো লোককে নেমন্তন্ন করি না। এটাই আমাদের রীতি।'

'যাই হোক, আমাকে কিছু খেতে তো দিন।'

'তা অবশ্য দিতে পারি। কিন্তু কালিনা ইভানভিচ পালাল কোথায়?'

'ওহ্, সেই সাংঘাতিক বুড়োটি? সেই মৌমাছি-পালক? এখ্‌খুনি যিনি আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন তিনিই বুঝি সে-ই? আচ্ছা, কী জঘন্য ব্যাপারটায় আপনিও নিজেকে জড়িয়েছেন বলুন তো! জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের ওরা তো আমাকে জ্বালিয়ে মারলে একেবারে। কম্যান্ডান্ট আমার দু-বছরের মাইনে কেটে নেবে বলে শাসাচ্ছে। তা, আপনার ওই কালিনা ইভানভিচ গেলেন কোথায়? ওঁকে ডাকুন দেখি একবার!'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না মুখখানাকে ব্যাজার করে তুললেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলুম কালিনা ইভানভিচের সাংঘাতিক কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। কারণ, মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না আসলে খোশমেজাজেই ছিলেন। কালিনা ইভানভিচের খোঁজে একটি ছেলেকে পাঠালুম। অবশেষে দূর থেকে নিচু হয়ে অভিবাদন করতে-করতে কালিনা ইভানভিচ এসে দেখা দিল।

'খবরদার, বেশি কাছে আসবেন না কিন্তু!' হেসে ফেললেন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না। 'আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত! যা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছেন আপনি!'

একটা বেঞ্চিতে জাঁকিয়ে বসে কালিনা ইভানভিচ বললে:

'আমরা ভালো কামই করছি।'

এখানে বলা দরকার যে আলোচ্য ঘটনার আগের সপ্তাহে কালিনা ইভানভিচ যে-বেআইনী কাজটা করেছিল তার সাক্ষী ছিলুম আমি। সেদিন কালিনা ইভানভিচ আর আমি কী একটা কাজে যেন জনশিক্ষা-দপ্তরে গিয়েছিলুম, আর সেখানে গিয়ে কোনো একটা ছুতোনাতায় সেঁধিয়েছিলুম মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার অফিস-ঘরে। তাঁর অফিস-ঘরখানা ছিল প্রকাণ্ড বড় আর এক বিশেষ ধরনের কাঠ দিয়ে বানানো আসবাবপত্রে আগাপাছতলা ঠাসা। ঘরখানার ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটায় ছিল মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার কাজের ডেস্‌কো। দেখা গেল মহিলা অফিসে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর টেবিলের চারধারে আগাগোড়াই সর্বক্ষণ ভিড় জমিয়ে ছিল শিক্ষা-দপ্তরের, যাকে বলে, একধরনের মার্কামারা সব লোকজন। তাদের একজনের সঙ্গে তিনি যখন কথা কইছেন, তখন দেখা গেল আরেকজন সেই কথাবার্তায় মাথা গলাচ্ছে, আর তৃতীয় আরেকজন চুপচাপ শুনছে বসে। এছাড়া উপস্থিত অন্যদের মধ্যে কেউ টেলিফোন করছে, কেউ ওই টেবিলেরই একধারে বসে লিখছে, কেউ-বা পড়ছে। আবার দেখা গেল সই করার জন্যে অপর একজন তাঁর দিকে একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এই সব ব্যস্ত লোকজন ছাড়াও আরও বহু লোক এমনিই ঘরখানার মধ্যে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আর ঘরখানা ভর্‌তি হয়ে আছে কথাবার্তায় আওয়াজে, তামাকের ধোঁয়ায় আর ছেঁড়া কাগজের জঞ্জালে।

কালিনা ইভানভিচ আর আমি ওই ঘরে একখানা সোফায় বসে নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলছিলুম। হঠাৎ একটি রোগামতো মহিলা প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় ছুটে অফিস-ঘরে এসে ঢুকলেন আর এসেই আমাদের কানে প্রবল বেগে বাক্যস্রোত বর্ষণ শুরু করে দিলেন। বহু কষ্টে তাঁর কথার মর্মোদ্ধার করার পর এইটুকু বুঝতে পারলুম যে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ব্যাপার নিয়ে মহিলাটি বিশেষ বিচলিত। কারণ কিণ্ডারগার্টেনটিতে বহু বাচ্চা ছাত্রছাত্রী আছে, সেখানকার শিক্ষা-পদ্ধতিও নাকি ভারি চমৎকার, কেবল কোনো আসবাবপত্র নেই সেখানে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল মহিলাটি ওই দপ্তরে মোটেই প্রথম আগন্তুক নন, কারণ তিনি রীতিমতো তেজের সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর আচরণে দপ্তরের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তিও প্রকাশ পাচ্ছিল না।

'আ মলো যা! এরা একটা গোটা শহরের সমান হাজার-হাজার কিণ্ডারগার্টেন

বানিয়েছে অথচ আমাদের কিনা কোনো আসবাবপত্তরই দিতে চায় না। বলি, বাচ্চাগুলো বসবেটা কোথায়? বুঝলেন, প্রায়ই এরা বলে — ঠিক আছে, আজ এসো, তোমাদের আসবাব দেয়া হবে। আর আমি আমার বাচ্চাদের তিন ভেরস্তা* পথ টেনে নিয়ে আসি, সঙ্গে গাড়িঘোড়াও নিয়ে আসি, কিন্তু কোথায় কে? কোনো শর্মার টিকিটি দেখা যাবে না এখানে। এমন এনিয়ে নালিশ-ফরিয়াদ যে করব তারও লোক পর্যন্ত নেই। ছি-ছি, কী লজ্জার কথা বলুন দেখি! এইভাবে গোটা মাসটা আমি এখানে আসাযাওয়া করে মরছি। আর দেখুন দেখি এই ভদ্রমহিলা নিজের ঘরে কত আসবাব এনে পুরেছেন — কিন্তু কিসের জন্যে, বলতে পারেন?'

মহিলাটি যদিও তারস্বরে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন তবু মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার টেবিল ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা ওঁর দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছিল না। ঘরের মধ্যে তখন যেরকম হৈ-হট্টগোল চলছিল তাতে মনে হয় খুব সম্ভব ওঁর কথা কানেই যায় নি তাদের। ইতিমধ্যে কালিনা ইভানভিচ ঘরের আসবাবপত্রের দিকে ভালো করে এক-নজর ঠাহর করে দেখে হাত দিয়ে সোফার ওপর একটা চাপড় মেরে শুধোল:

'আচ্ছা, কমরেড, এখেনকার এই আসবাবে আপনের কাজ চইলবে, এয়া মনে করবার পারি কি?'

আহ্লাদে আটখানা হয়ে মহিলাটি বললেন, 'এই আসবাবে? বলেন কি, এ তো চমৎকার সব আসবাব!..'

'তাইলে আপনের ঝামেলাটা বাধত্যাছে কোথায়?' কালিনা ইভানভিচ বলল। 'এয়াতে যখন আপনের কাম চইলবে আর এখেনে এয়া খামোকা ঝুটমুট পইড়্যা থাকত্যাছে, তখন আপনের পোলাপানগো লেগ্যে এয়া সব এখান থেইক্যা উঠাইয়া লইয়া যান না ক্যান।'

এতক্ষণ মহিলাটির চোখ দুটো কালিনা ইভানভিচের মুখের ওপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ হয়ে ছিল। এখন উত্তেজিত হয়ে ওঠায় সে-দুটো চরকির মতো ঘুরতে লাগল। তারপর আবার একবার তারা কালিনা ইভানভিচের মুখের ওপর এসে স্থির হল।

* রুশদেশী দৈর্ঘ্যের মাপ। এক মাইলের অনুমানিক ২/৩ অংশ এক ভেরস্তার সমান। — অনুঃ

'কিন্তু... কী করে?'

'খুবই সহজে — এগুলা উঠাইয়া লইয়া গিয়া আপনের গাড়িগুলা বোঝাই কইর‍্যা লন। আর কী?'

'কী সর্বনাশ! কিন্তু তারপর?'

'আপনের যদি ছাড়পত্রের লেগ্যে মাথাব্যথা ধইর‍্যা থাকে তাইলে কই কি অ নিয়া দুশ্চিন্তা কইরবেন না। আপনে কত কাগজ চান? আপনেরে কাগজ লেইখ্যা দিবার লেগ্যে অমন বহুত্ পরগাছারে পাইয়া যাইবেন। এখন এগুলা লইয়া তো যান!'

'কিন্তু ধরুন, কেউ যদি জিজ্ঞেসা করে, তাহলে এজন্যে আমি কার কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি বলব?'

'বলবেন, আমি আপনেরে অনুমতি দিছি।'

'তাহলে সত্যিই আপনি অনুমতি দিচ্ছেন?'

'হ -- তা দিতেছি বৈকি!'

আনন্দে আত্মহারা মহিলাটির মুখ থেকে শুধু বেরোল 'কী সর্বনাশ!' তারপর প্রজাপতির মতো ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মুহূর্তের মধ্যে আবার তিনি ওই একই ভাবে ঘরে ফিরে এলেন। তবে এবার সঙ্গে করে নিয়ে এলেন প্রায় জনা কুড়ির মতো বাচ্চাকে। অতঃপর বাচ্চাগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ল যতসব চেয়ার, আর্মচেয়ার, ছোট-ছোট টুল আর কৌচের ওপর, আর বেশ খানিকটা কষ্ট করেই সেগুলোকে টেনেটুনে দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে লাগল। ফলে জিনিসপত্র টানাটানির এমন একটা প্রবল হট্টগোল উঠল ঘর জুড়ে যে শেষ পর্যন্ত মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নাও সে-সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি শুধোলেন:

'এই, কী করছ তোমরা?'

ঈষৎ ময়লারঙের একটি ছেলে আরেক সঙ্গীর সঙ্গে মিলে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে তাঁর কথার জবাব দিলে: 'আমরা এডারে বাইরি নিয়ি যাতিছি।'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না বললেন, 'আরেকটু কম সোরগোল করে নিয়ে যেতে পারছ না?' কথাটা বলেই আবার তিনি শিক্ষাদপ্তর-সংক্রান্ত কাজে ডুবে গেলেন।

কিছুটা হতাশভাবে আমার দিকে তাকিয়ে কালিনা ইভানভিচ বললে:

'এমন কান্ডমান্ড দ্যাখছ নি কোনোদিন? বাচ্চাগুলা, অপদাৰ্থগুলা, কিনা সক্কল আসবাবই উঠাইয়া লইয়া যাইবার চায়!'

অনেকক্ষণ ধরেই আমি সানন্দে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার অফিসের আসবাবপত্র লুট করা দেখছিলুম। এতে আপত্তি করতে বা চটে যেতে মন উঠছিল না আমার। এমন সময় আমরা যে-সোফাটায় এতক্ষণ বসে ছিলুম দুটি ছেলে এসে সেটা ধরেও টানাটানি শুরু করল। সেটাকেও নিয়ে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলুম তাদের। ব্যস্তসমস্ত মহিলাটি তাঁর রক্ষণাধীন ছেলেদের চারপাশে শেষবারের মতো কয়েক পাক চক্কর দেয়ার পর এবার ছুটে কালিনা ইভানভিচের কাছে চলে এলেন। তারপর ওর হাতটা ধরে আবেগভরে তাতে চাপ দিলেন আর এই মহানুভব ব্যক্তিটির হাসি-হাসি অপ্রস্তুত মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'দয়া করে আপনার নামটা বলুন! আমার জানা বিশেষ দরকার। সত্যি, আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন!'

'আরে, আমার নাম জাইনবার চান কিসের লেগ্যে? জ্যান্ত মানুষির লেগ্যে লোকে তো এখন আর পূজা দেয় না। আর আমার অন্ত্যেষ্টিকালীন প্রার্থনারও তো এখনও সময় হয় নাই, না কি কন?..'

'না-না, সত্যি, বলুন না আপনার নামটা..'

'আমি ধন্যবাদ চাই না, বোঝলেন-নি...'

এবার আমি আবেগভরে বলে উঠলুম, 'এই ভদ্রলোকের নাম হল গিয়ে কালিনা ইভানভিচ সের্‌দিউক।'

'ধন্যবাদ, কমরেড সের্‌দিউক, ধন্যবাদ!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারেন জিনিসপত্তর সব লইয়া যান গিয়া, নাইলে কেউ-না-কেউ আইস্যা পড়ব আর জিনিস লওয়ার এই অনুমতি বাতিল কইর‍্যা দিব-নে।'

আনন্দোচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতাবোধের পাখায় ভর দিয়ে মহিলাটি যেন উড়ে চলে গেলেন। আর গ্রেটকোটের বেল্‌টটা স্বস্থানে স্থাপন করে গলাখাঁকারি দিয়ে কালিনা ইভানভিচ এবার তার পাইপ ধরাল। বলল:

'অরে আমার নামটা বললা ক্যান? না বললেই ছিল ভালো। বোঝলা, আমি এ-সব পছন্দ করি না, এই কেউ আইস্যা আমারে বেশি-বেশি ধন্যবাদ দেয়...

তয় জিনিসপত্তর লইয়া অরা ঠিকঠিক সইর‍্যা পড়তে পারছে কিনা এয়া আমার জানা লাগবে!'

এর অল্পক্ষণের মধ্যেই মারিয়া কনদ্রাতিয়েভ্‌নার সাক্ষাৎপ্রার্থীরা দপ্তরের অন্যান্য ঘরে নিজের-নিজের জায়গায় চলে গেল। অতঃপর তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ মিলল আমাদের। কিন্তু শিগ্‌গিরই আমাদের সঙ্গে কাজ মিটে যাওয়ার পর অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই তিনি একবার বলে উঠলেন:

'আশ্চর্য, ফার্নিচারগুলো ওরা নিয়ে গেল কোথায়! আমার অফিস একেবারে খালি করে দিয়েছে দেখছি।'

'ওগুলা অরা একটা কিন্ডারগার্টেন ইশ্‌কুলে লইয়া গ্যাছে গিয়া।' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কালিনা ইভানভিচ গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলল।

এর দিন দুই পরে দৈবক্রমে কীভাবে যেন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল যে আসবাবপত্রগুলো কালিনা ইভানভিচের অনুমতিক্রমেই অফিস থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে জনশিক্ষা-দপ্তরে আমাদের ডাক পড়ল। কিন্তু আমাদের দিক থেকে সাড়া দেয়ার বিশেষ তাগিদ ছিল না। কালিনা ইভানভিচ স্রেফ জানিয়ে দিল:

'ওই কয়খান হাটুভাঙ্গা চেয়ারের লেগ্যে সেখানে যাইতে আমার ভারি ঠেকা পড়ছে কিনা! নিজেরই বলে আমার ঝামেলার অন্ত নাই, তায় আবার!'

আর তাই, উপরোক্ত ওই সমস্ত কারণে, মারিয়া কনদ্রাতিয়েভ্‌নার উপস্থিতিতে কালিনা ইভানভিচ এখন স্পষ্টতই অপ্রস্তুত বোধ করছিল।

'আমরা ভালো কামই করছি। ওয়াতে খারাপটা কী হইল?'

'কথাটা বলতে লজ্জা হচ্ছে না আপনার? অনুমতি দেবার আপনার কী অধিকার আছে, শুনি?'

সসম্ভ্রমে চেয়ারের ওপর ঝুঁকে বসল কালিনা ইভানভিচ।

'অন্য যে-কোনো মানুষির মতন আমারও নিচ্চয় অধিকার আছে কাউরে কোনো কিছু করতে দেয়ার। যেমন ধরেন আমি আপনেরে অনুমতি দিতে পারি, আপনে নিজের লেগ্যে একখান তালুক কিনেন গিয়া। আমি অনুমতি দিতেছি, ব্যস আমার কাম ফুরাইয়া গেল! তালুক একখান কিনেন না ক্যান! আর ইচ্ছা হইলে মাগনাই কিনেন একখান — আমি আপনেরে তারও অনুমতি দিতেছি!'

'কিন্তু সেরকম অনুমতি তো আমিও দিতে পারি,' চারিদিকে এক-নজর তাকিয়ে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না বললেন। 'যেমন ধরুন এই সবকিছু টুল আর টেবিল এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি।'

'হ, তা পারেন বৈকি!'

'কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে?' নিজের কথায় নিজেই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়া সত্ত্বেও মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না তর্ক করতে ছাড়লেন না।

'তারপর আবার কী! কিছুই না!'

'তার মানে? কী বলতে চান? এগুলো তুলে নিয়ে চলে গেলেই হল?'

'কিন্তু এগুলা লইব কেডা?'

'এই... কেউ-না-কেউ আর-কি।'

'ইস! লউক দেখি একবার! এগুলা লইয়া যাইবার চেষ্টা করার পর তার অবস্থাটা কী দাড়ায় একবার দ্যাখনের সাধ আছে আমার!'

'তাকে আর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে না তাহলে, তাকেই বরং গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে!' হাসতে-হাসতে এবার ফোড়ন কাটল জাদোরভ। অনেকক্ষণ ধরেই ও মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্নার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

লাল হয়ে উঠে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না মুখ তুলে জাদোরভের দিকে তাকালেন, তারপর অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে শুধোলেন:

'তোমার তাই মনে হয়?'

একমুখ হাসিতে জাদোরভের সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

বলল, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না বললেন, 'এ তো দেখছি রাহাজানের দর্শন।' তারপর কড়া সুরে আমাকে শুধোলেন, 'এইভাবে আপনার রক্ষণাধীন ছেলেদের মানুষ করে তুলছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা কম-বেশি এইভাবেই...'

'একে কী ধরনের মানুষ করা বলেন আপনি? অফিস থেকে ফার্নিচার তুলে নিয়ে যাওয়া -- এটা কি ঠিক কাজ? এদের কী হবার জন্যে বড় করে তুলছেন শুনি? জিনিসপত্র এদিক-ওদিক পড়ে থাকতে দেখলে আপনারা তা নিয়ে নিতে পারেন -- এটাই বলতে চান তো?'

একদল কলোনি-বাসিন্দা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল।

আলোচনাটা শুনতে-শুনতে তাদের মুখে তীব্র কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছিল। মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না ক্রমশ গরম হয়ে উঠতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করছিলুম তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা একটা বিদ্বেষের সুর শোনা যাচ্ছে। আলোচনাটাকে ওই পথে আর এগোতে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না। শান্তিস্থাপনের ইচ্ছেয় আমি বললুম:

'অন্য আরেক দিন প্রশ্নটা নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করা যাবে'খন! প্রশ্নটা খুবই জটিল, বুঝলেন না।'

কিন্তু মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না হাল ছেড়ে দেয়ার মেজাজে ছিলেন না। বললেন:

'এ-ব্যাপারে জটিলতার কী আছে? এ তো খুবই সোজা কথা — আপনাদের এটা হল কুলাকসুলভ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।'

কালিনা ইভানভিচও বুঝল যে ওঁর এই বিরক্তিপ্রকাশটা সত্যিই গুরুতর ধরনের। এবার সে মহিলার আরও কাছ ঘেঁষে বসে বলল:

'আমার মতন বুড়া মানুষির উপর রাগ কইরেন না। তয় আপনে ওই কথাটা খালি কইয়েন না — ওই কুলাক কথাটা! আমাগো পোলাপানরা সক্কলে সোভিয়েত-শিক্ষা পাইতেছে। বোঝলেন না, আমি তখন আপনের সাথে রসিকতা করতেছিলাম। ভাবলাম: মালিকানী এখেনে উপস্থিত আছেন, তিনি কথাটা শুইন্যা হাসবেন মাত্তর, ব্যস ব্যাপারটা মিইট্যা যাবে-নে। ওই বাচ্চাগো যে বসার চেয়ার-বেঞ্চি নাই, হয়তো তা-ও তিনি বোঝতে পারবেন। কিন্তু দ্যাখতাছি মালিকানী লোক ভালো না - তাঁর চোক্ষের সামনা থেইক্যা তাঁর আসবাবপত্তর উঠাইয়া লইয়া গেল আর এখন তিনি কিনা চোরের খোঁজ করতাছেন — আর কইতাছেন কুলাকসুলভ শিক্ষাদান...'

'এর অর্থ, আপনাদের ছাত্রছাত্রীরাও এ-অবস্থায় ওই একই কাজ করত?' মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না বললেন। তবে বোঝা গেল, তাঁর বিরোধিতার ভাবটা দুর্বল হয়ে আসছে।

'তা, অরাও অমনটা করুক না ক্যান!..'

'কিন্তু কেন?'

'অসাবধান মালিকগো একটু শিক্ষা দেয়নের লেগ্যে, আবার কী?'

কলোনি-বাসিন্দাদের ভিড় ঠেলে কারাবানভ এগিয়ে এল এবার। তারপর মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার দিকে ধবধবে তুষার-শাদা রুমালের নিশান-বাঁধা

একখানা লাঠি বাড়িয়ে ধরল। ওইদিন সব কলোনি-বাসিন্দাকেই উৎসব উপলক্ষে একখানা করে ধবধবে পরিষ্কার রুমাল দেয়া হয়েছিল।

কারাবানভ বলল, 'মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না, আর লড়াই করে লাভ নাই। আপনি বরং শাদা নিশান তুলে ধরেন!'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নাকে হঠাৎ হেসে উঠতে দেখে অবাক হলুম। চোখ দুটো ওঁর ঝলমল করে উঠল। বললেন:

'হ্যাঁ, ঠিক, আমি আত্মসমর্পণ করছি! না, কিচ্ছুটি ঘটে নি — তোমরা কুলাকসুলভ শিক্ষা পাচ্ছ না, কেউ আমার সর্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নেয় নি। আমি আত্মসমর্পণ করছি! 'মহিলা সামাজিক-শিক্ষা সমিতি' হারস্বীকার করছে!'

ওইদিন সন্ধেবেলা অপর কার যেন একটা চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে আমি যখন থিয়েটার-হলে প্রম্‌টারের বাক্স থেকে নেমে আসছি তখন হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, ক্রমশ খালি-হয়ে-আসা হলঘরটায় বসে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না খুব মনোযোগের সঙ্গে কলোনি-বাসিন্দাদের সর্বশেষ গতিবিধি লক্ষ্য করছেন।

তোস্‌কা সলভিয়েভ তখন চড়া রিন্‌রিনে গলায় হাঁক পেড়ে বলছে:

'সেমিওন, অ সেমিওন, তুমি কি তোমার পোশাক জমা দিয়েছ? যাবার আগে কিন্তু পোশাক জমা দিয়ি যাবে!'

জবাবে কারাবানভের গলা শোনা গেল:

'তোস্‌কামনি, ওরে হাঁদা — আমি তো সাতিনের* পার্ট করেছি!'

'ও, সাতিনের পার্ট! তাইলে পোশাকটারে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দাও।'

ওদিকে স্টেজের একটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভোলখভ তখন অন্ধকার ঘরখানার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছিল:

'গালাতেঙ্কো, ওরকম করলি চলবে না — চুল্লীটারে নিবায়ে দিতে লাগবে!'

'ওয়া আপনা থেক্যে নিব্যে যাবে-নে,' ঘুমঘুম ধরা গলায় জবাব দিল গালাতেঙ্কো।

'নিবায়ে দে শিগ্‌গিরি, বলতেছি! নির্দেশ শুনেছিস তো — চুল্লী জ্বালায়ে রেখে যাওয়া চলবে না।'

---

* গোর্কির 'নিচের মহল' নাটকের একটি চরিত্র। — অনুঃ

'নিদ্দেশ আর নিদ্দেশ! হ্ঃঃ, যত্তো সব... আচ্ছা, ঠিক আছে, নিবায়ো দেব-নে,' ঘোঁত্‌ঘোঁত করতে লাগল গালাতেঙ্কো।

একদল ছেলে তখন নাটকের সরাইখানার খাটগ্‌লোকে খ্‌লে টুকরোগ্‌লো স্টেজের ওপর জড় করছিল। আর তাদের মধ্যে একজন নাটকেরই একটা গানের কলি গ্‌নগ্‌ন করে ভাঁজছিল: 'স্‌র্য ওঠে রোজ সকালে...'

'এই তক্তাগ্‌লো আসচে কাল ছ্‌তারশালে নিয়ি যেতে হবে,' কাকে যেন উদ্দেশ করে মিত্‌কা জেভেলি কথাগ্‌লো বলল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে: 'আন্তন! হেই আন্তন!'

উইংসের পাশ থেকে ব্রাত্‌চেঙ্কো জবাব দিল:

'এই যে আমি! তা অত ভ্যা-ভ্যা করতেছিস কেন — তুই তো গাধা নোস!'

'শোন্‌ আসচে কাল আমারে একখান গাড়ি দিবি?'

'ঠিক আছে।'

'আর এট্টা ঘোড়া?'

'কেন, তোরা নিজিরা টানতে পারবি না?'

'অত শক্তি নাই শরীলে!'

'কেন, তোদেরে যথেষ্ট দানাপানি দেয় না?'

'না — ঃ!'

'তাইলে আমার কাছে আসিস — পেট ভরে খাতি দেব তোদেরে।'

পায়ে-পায়ে আমি মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার কাছে গেল্‌ম।

'রাত্রে শ্‌চ্ছেন কোথায়?'

'আমি লিদচ্‌কার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে ম্‌খের মেক-আপ তুলতে গেছে, হয়ে গেলে আমাকে তার ঘরে নিয়ে যাবে বলেছে... আন্তন সেমিওনভিচ, ব্‌ঝলেন, আপনার কলোনি-বাসিন্দারা না ভারি চমৎকার। তবে এদের বড্ড বেশি কাজ করতে হয়। এখন তো বেশ রাত হয়ে গেছে অথচ এরা এখনও কাজ করে চলেছে। আমি বেশ অন্‌মান করতে পারছি এরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আপনি এরপর এদের কিছ্‌ খেতে দিতে পারেন না? কিংবা অন্ততপক্ষে যারা খাটছে তাদের?'

'ওরা সকলেই খেটেছে — খাটছে। কিন্তু সকলকে খেতে দেয়ার মতো খাদ্য নেই।'

'তাহলে, অন্ততপক্ষে আপনি আর আপনার শিক্ষক-শিক্ষিকারা... আজ

আপনারাও তো অভিনয় করলেন, ব্যাপারটা ভারি ভালো লেগেছে আমার। তা, না হয় আপনারা কয়েকজন একত্র বসে একটু গল্পগুজব করলেন আর এক-আধমুঠো যা হোক... কিছু খেলেন? না কেন?'

'আমাদের ঠিক ভোর ছ'টায় উঠতে হয়, মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না।'

'এটাই কি একমাত্র কারণ?'

আমাদের আপন জন এই ভালোমানুষ মেয়েটিকে বোঝাতে বসলুম, 'বুঝলেন, ব্যাপারটা হল গিয়ে এই। আপনি যতটা মনে করেন আমাদের এই জীবনযাত্রা কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। বুঝলেন, অনেক বেশি কঠিন!'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না ভাবতে লাগলেন। এই সময়ে লিদচ্‌কা স্টেজ থেকে লাফিয়ে নেমে এসে বলল:

'আজকের নাটক কিন্তু ভালোই জমেছিল, কী বলেন?'

৬

মদনের শর

আমাদের গোর্কি জন্মতিথি উদ্‌যাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসন্ত এসে জাঁকিয়ে বসল। কিন্তু এ ছাড়াও আমাদের মধ্যে এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল যেখানটায় এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বসন্তঋতুর আবির্ভাবের ব্যাপারটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

নাট্যাভিনয়-সংক্রান্ত আমাদের কাজকর্ম কলোনির সদস্য ও গ্রামের তরুণতরুণীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগসাধনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। আর এই সংযোগ-সীমানার কয়েকটা বিন্দুতে এমন সব আবেগ আর পরিকল্পনার আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করল আমাদের সামাজিক শিক্ষাদান-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিতে যাদের কোনো স্থান ছিল না। দলপতি-পরিষদের নির্দেশে কলোনির যে-সমস্ত বাসিন্দা ছয়ের 'দ' মিশ্র বাহিনীর (এক্ষেত্রে এই 'দ' অক্ষরটি ছিল স্পষ্টতই 'দর্শক' কথাটির আদ্যাক্ষর) মতো সবচেয়ে

বিপজ্জনক জায়গাগুলোয় কর্মরত থাকত তারাই এ-ব্যাপারে সবথেকে বেশি করে আক্রান্ত হতে শুরু করল।

যে-সব কলোনি-বাসিন্দা ছয়ের 'অ' মিশ্র বাহিনীর (অর্থাৎ, অভিনেতৃবর্গের) সদস্য হিসেবে মঞ্চের ওপর অভিনয় করত, নাট্যাভিনয়ের 'বিষাক্ত চোরাবালি'তে তাদের পুরোপুরি ডুবে যাওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্টেজের ওপর প্রায়ই তাদের রোম্যান্টিক দৃশ্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা, এমন কি প্রত্যক্ষ প্রেমের অভিনয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও যেতে হোত, কিন্তু ঠিক এই কারণেই অন্তত কিছুকাল তারা তথাকথিত প্রথম প্রেমের যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য ছয়-মিশ্র বাহিনীর সদস্যরাও একই রকম অনুকূল নানা উপাদানের সাহায্যে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছিল। যেমন, ছয়ের 'শস' মিশ্র বাহিনীতে ছেলেরা সর্বদাই প্রচণ্ড সব বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত এবং আতশবাজি তৈরি নিয়ে অনবরত নানারকম গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার ফলে আঘাত লাগার দরুন ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথা ছাড়া তারানেতৃসকে প্রায় কখনও দেখাই যেত না। ফলে এই মিশ্র বাহিনীতে প্রেম-ভালোবাসা কোনোদিনই শিকড় গাড়তে পারবে না বলে মনে হোত। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে যতসব জাহাজ, দুর্গ আর মন্ত্রীদের গাড়িতে বিস্ফোরণের কান-ফাটানো আওয়াজ এই বাহিনীটির সদস্যদের হৃদয়-মন এতখানি অধিকার করে থাকত যে সেখানে 'প্রণয়াকাঙ্ক্ষার ধিকিধিকি চাপা আগুন' পুষে রাখার কোনো জায়গা ছিল না। যে-সব ছেলে স্টেজের ওপর আসবাবপত্র আর সিন-সিনারি টানাটানি করত তাদের বুকেও এই আগুন জ্বলে ওঠার তেমন সুযোগ ছিল না — শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা যাকে 'প্রবৃত্তির উদ্‌গতি'র প্রক্রিয়া আখ্যা দিতে ভালোবাসেন এই ছেলেদের বেলায় সেই ব্যাপারটা একটু বেশিরকমই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি দর্শক-শ্রোতাদের সঙ্গে একেবারে মিশে থেকে যাদের কাজকর্ম করতে হোত ঘর-গরমের ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর সেই ছেলেপিলেরাও মদনের শর নিক্ষেপের লক্ষ্য হওয়া থেকে সুরক্ষিত ছিল। কারণ, যতই রঙ্গপ্রিয় আর দায়িত্বজ্ঞানহীন হোন না কেন কোনো মদনদেবতাই কয়লার গুঁড়ো আর ঝুলকালি-মাখা ভুতুড়ে কালো ওই সব মূর্তির দিকে শর নিক্ষেপের কথা কল্পনাতেও আনতে পারতেন না।

ফলে এ-ব্যাপারে ছয়ের 'দ' মিশ্রর সদস্যদেরই বিপদ ছিল সর্বাধিক। কলোনিতে সেকালে সবচেয়ে ভালো যা পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়া যেত তা-ই

পরে থিয়েটর-দর্শনার্থী জনতার মধ্যে ঘোরাফেরা করত তারা। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র নোংরামি বা অগোছালো ভাব দেখলে আমিও এই ছেলেদের অত্যন্ত বকাবকি করতুম। তাদের কোটের বুকপকেট থেকে পরিষ্কার রুমালের একটা কোণ হাতছানির ভঙ্গিতে উঁকি দিত, চুলের কেয়ারি ছিল সর্বদাই সৌন্দর্যের একেবারে পরাকাষ্ঠা, কূটনীতিকদের মতো সৌজন্যপরায়ণ আর দাঁতের ডাক্তারদের মতো মনোযোগী হতে হোত তাদের। আর এইভাবে রণসাজে সেজে তারা সহজেই সেই সমস্ত মোহিনী মায়ার শিকার বনে যেত গনচারোভ্কা ও পিরগোভ্কা গাঁয়ে, ভলোভির খামারখোলায় এবং শহরের প্যারিসীয় প্রসাধন-কক্ষগুলোয় যে-মায়ার উদ্বোধন ঘটাতে তারা ছিল প্রায় একই রকম পটু।

থিয়েটর-হলের দোরগোড়ায় টিকেট পরীক্ষা ও হলে জায়গা খুঁজে দেয়ার সময় প্রথমবারের দেখাসাক্ষাৎগুলো প্রায়ই নির্দোষ ধরনের হোত। এই সমস্ত চমকপ্রদ কাজের কাজী ও সংগঠকদের তাদের প্রাণমাতানো কথাবার্তা ও অলৌকিক কাজের পদ্ধতিসহ মেয়েদের কাছে মনোরম অথচ সুদূর প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে — বলে মনে হোত। এ-ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট ছিল যে গাঁয়ের 'রোমিও' বা প্রেমিকপুঙ্গবরাও কলোনি-বাসিন্দাদের এই রকমসকমে মেয়েদের মতোই মুগ্ধ হোত, অথচ এর ফলে তাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক ঘটত না। কিন্তু এরপর যেই দ্বিতীয়বার অভিনয়ের অনুষ্ঠান হোত, এবং তারপর তৃতীয় ও চতুর্থবার তখন তাদের মধ্যে দেখতে-দেখতে পৃথিবীর সেই আদিতম কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করত। পিরগোভ্কা গাঁয়ের পারাস্কা কিংবা ভলোভির খামারখোলার মারুসিয়া শিগ্গিরই আবিষ্কার করে ফেলল যে গোলাপি গাল, চকচকে চোখ, কালো কিংবা সোনালি ভুরু ও লক্ষ-লক্ষ নিঃসন্দেহে মূল্যবান বস্তুর আচ্ছাদনস্বরূপ ঝলমলে নতুন ও ফ্যাশনদুরস্ত কাটছাঁটওয়ালা সুতী-কাপড়ের পোশাক এবং মেয়েলি ঠোঁটে উচ্চারিত প্রায় ইতালিয়ান সঙ্গীতের মতো করে গাওয়া ইউক্রেনীয় 'এল' সঙ্গীতের সামগ্রিক যোগফল গোর্কিপন্থীদের দৃশ্যপট পরিবর্তনের চাতুর্য কিংবা অন্য যে-কোনো কলাকৌশলের চেয়ে অনেকগুণে বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী। আর উপরোক্ত এই সমস্ত ক্ষমতাকে তারা যখন সক্রিয় করে তুলল তখন দেখা গেল কলোনি-বাসিন্দাদের সুদূরতা বা অনভিগম্যতার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফলে এমন একটা সময় এল যখন প্রতিবার নাট্যাভিনয় শেষ হবার

পর কলোনি-বাসিন্দাদের কেউ-না-কেউ এসে আমাকে এই কপট অনুরোধ জানাত:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আমি কি পিরগোভ্‌কার মেয়েদের বাড়ি পেঁীছে দিয়ি আসতি পারি — ওরা একা যেতি ভয় পাচ্ছে।'

এই ধরনের বাক্য অবশ্য নানারকম মিথ্যের প্রায়-নজিরহীন একটা সমন্বয় ছিল মাত্র। কারণ, আর্জি পেশ করত যে সে এবং আমি উভয়ে খুব ভালো করেই জানতুম যে কেউই কোনো কারণে ভয় পাচ্ছে না, কাউকেই সত্যি-সত্যি বাড়ি পেঁীছে দেয়ার দরকার করে না এবং বহুবচনে 'মেয়েরা' বলাটা একেবারেই একটা অতিশয়োক্তি। তাছাড়া, অনুমতি নেওয়ারও বিশেষ কোনো প্রয়োজন ঘটত না। কেননা ভীরু থিয়েটর-দর্শনার্থিনীর একটিমাত্র চোখের ইঙ্গিতেই ছেলেটি তার সহচর হবার জন্যে কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই একপায়ে খাড়া হয়ে থাকত।

এই সমস্ত কারণে অনুমতি দিতে আমি বাধ্য থাকতুম। তবে আমার — শিক্ষা-বিজ্ঞানীর — অন্তরের অন্তস্তলে অসামঞ্জস্যবোধের একটা স্পষ্ট অনুভূতিকে তখন চেপে রাখতে হোত। সকলেই জানেন যে শিক্ষা-বিজ্ঞান সরাসরি প্রেমের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। সে-বিজ্ঞান অনুযায়ী বলতে গেলে, যখন শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় একমাত্র তখনই এই 'জবরদস্ত প্রবৃত্তি'টি মাথা চাড়া দেয়। সর্বকালে এবং সকল জাতির মধ্যেই শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা প্রেমকে ঘৃণা করে এসেছেন। আমি নিজেও একধরনের ঈর্ষাচ্ছন্ন অসন্তোষ মনে পোষণ করে এসেছি যখন কোনো কলোনি-বাসিন্দা কম্‌সমোলের কিংবা কলোনির সাধারণ সভায় যোগ না দিয়ে, অবজ্ঞাভরে বই ছুড়ে ফেলে, যৌথ-সংস্থার সক্রিয় ও শ্রেণী-সচেতন সদস্যের উপযোগী যতেক গুণাবলীর প্রতি অবহেলা দেখিয়ে একমাত্র একজন মারুসিয়া কিংবা একজন নাতাশা ছাড়া অন্য কোনো কর্তৃস্থানীয়কে মেনে নিতে একগুঁয়ের মতো অস্বীকার করেছে এবং যখন আমি অনুভব করেছি যে সেই মারুসিয়া বা নাতাশার মতো ব্যক্তিরা কি শিক্ষাদীক্ষায়, কি রাজনৈতিক কিংবা কি নৈতিক সকল বিচারেই আমার চেয়ে বহু-বহু স্তর নিচের মানুষ। তবে, সুখের বিষয়, আমি যে-কোনো ব্যাপার নিয়ে ফিরে-ফিরে বারবার চিন্তা করায় বিশ্বাসী ছিলুম এবং নিছক ঈর্ষার উদ্রেক হচ্ছে বলেই কোনো ধরনের অধিকার কায়েমের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতুম না। কিন্তু কলোনিতে আমার সহকর্মীরা এবং আরও বেশি করে

জনশিক্ষা-দপ্তরের কর্মীরা এ-ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়মনা ছিলেন। মদনদেবের এহেন অদৃষ্টপূর্ব ও প্রাক-পরিকল্পনাহীন আচমকা হস্তক্ষেপে তাঁরা তাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন:

'যে করে হোক একে ঠেকাতেই হবে।'

যাই হোক, এই সমস্ত আলোচনার ফলে সব সময়েই কিছু-না-কিছু সুবিধে হোত, কারণ তা বাস্তব অবস্থার ওপর আলোকপাত করত। বোঝা যেত, আমাদের প্রত্যেককে এগোতে হবে নিজস্ব সাধারণ বুদ্ধি এবং জীবনের সাধারণ বোধের ওপর নির্ভর করে। আদর্শের স্বপ্ন দেখে কোনো কাজ হবার নয়। আমাদের হাতে যদি অঢেল পয়সা থাকত তাহলে আমি ওই সব কলোনি-বাসিন্দার বিয়ে দিয়ে দিতুম আর আমাদের চারপাশের এলাকায় বিবাহিত কম্‌সমোল-সদস্যদের বসতি গড়ে তুলতুম। তাতে এমন কীই-বা ক্ষতিটা হোত? কিন্তু এই ধরনের একটা পূর্ণতাসাধনের থেকে তখনও আমরা বহু দূরে। কিন্তু তাতেই-বা কী? দরিদ্র জীবন যাপন করেও সমস্যা সমাধানের পথ বাতলানো সম্ভব। শিক্ষাদানগত হস্তক্ষেপের দণ্ড চালনা করে প্রেমপীড়িতদের উৎপীড়িত করে তুলতে আমি তেমন আগ্রহ বোধ করলুম না, বিশেষ করে প্রেমিকরা যখন মোটেই শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করছিল না তখন সে-কথা চিন্তাও করতে পারছিলুম না। একবার একমুহূর্তের প্রাণখোলা ভাবের ঝোঁকে অপ্রিশ্‌কো আমাকে মারুসিয়ার একখানা ফোটোগ্রাফ দেখিয়ে বসল -- এতে স্পষ্টতই প্রমাণ মিলল যে আমরা যখন প্রতিবিধানের ভাবনাচিন্তায় কালহরণ করছিলুম, জীবনের এই ঘটনাপ্রবাহ তখন এগিয়ে চলেছিল তার আপন বেগে।

এমনিতে অবশ্য ফোটোগ্রাফখানা থেকে বোঝা যাচ্ছিল সামান্যই। মোটা, থ্যাবড়া-নাকী একটি মেয়ের ভাবলেশহীন মুখ ছবি থেকে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। কোনো দিক থেকেই তা গড়পড়তা মারুসিয়া-জাতীয় মেয়েদের থেকে নতুন কিছু ছিল না। তবে ছবিখানার উলটো পিঠে একটি স্কুলের মেয়ের কাঁচা হাতের লেখায় কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল পুরোমাত্রায়: 'প্রিয় দ্‌মিত্রকে — মারুসিয়া লুকাশেংকো। যখন তুমি দেখবে এরে, মনে পড়বে মারুসিয়ারে!'

দ্‌মিত্র অপ্রিশ্‌কো বসে ছিল চেয়ারটায়, হৃদয়খোয়ানো মানুষ হিসেবে সারা দুনিয়ার সামনে নিজেকে খোলাখুলি জাহির করে। তার এককালের প্রাণবন্ত আচার-আচরণের সামান্য কিছু করুণ অবশেষমাত্র বর্তমান ছিল তখন, এমন

কি কপালের ওপর থেকে তার সেই উচ্ছল চুলের গোছাটা পর্যন্ত অন্তর্ধান করেছিল এবং ভালোমানুষদের যেমন দেখা যায় তেমনই পরিচ্ছন্নভাবে মাথার ওপর তা চেপে পাট করে রাখা ছিল। ওর যে-বাদামি চোখ দুটো আগে কোনো একটা রসিকতার কথায় আচমকা ঝক্‌মকিয়ে উঠত কিংবা হৈচৈ করার বা হাসার সুযোগ পেলেই আলোর ঝিলিক হানত, সে-দুটোয় এখন পোষমানা গৃহস্থালির ভাবনাচিন্তা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনার অভিব্যক্তিমাত্র ছিল না।

'তা, কী করতে চাও তুমি?'

অপ্রেশ্‌কো হাসল। বলল:

'আপনের সাহায্য ছাড়া ব্যাপারটা বড় সহজ হবে না। অর বাপেরে আমরা এখনও পর্যন্ত কিছু জানাই নাই। মারুসিয়া ভয় পাতিছে। তবে অর বাপ আমারে পছন্দই করেন -- কিন্তু সে তো সাধারণভাবে।'

'ঠিক আছে — অপেক্ষা করা যাক... দেখা যাক!'

অপ্রেশ্‌কো চলে গেল - বেশ খুশি হয়েই, প্রেমিকার ছবিখানা সযত্নে কোটের ভেতরদিকের বুকপকেটে লুকিয়ে ফেলে।

এছাড়া চোবতের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরও শোচনীয়। সে ছিল গোমড়ামুখো, ক্রোধী স্বভাবের ছেলে। চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বলতে উল্লেখ করার মতো তার আর কোনোকিছুই ছিল না। ছুরি-মারামারির একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার ফলে একদা তাকে কলোনিতে আসতে হয়। কিন্তু কলোনিতে ঢোকার পর সে ক্রমে-ক্রমে শৃঙ্খলার বশবর্তী হয়ে পড়ে। তবে আমাদের জীবনের উদ্বেল প্রাণকেন্দ্রগুলো থেকে সর্বদাই সে নিজেকে তফাত করে রাখত। মুখখানা ছিল তার ভাবলেশহীন আর ফ্যাকাশে, এমন কি চটে উঠলেও তাকিয়ে থাকত শূন্যদৃষ্টিতে। জোরজবরদস্তির ফলে সে ইশ্‌কুল করতে শুরু করে। প্রাণপণ চেষ্টার ফলে তবে লিখতে-পড়তে শেখে। কিন্তু ওর কথাবলার ধরনটা ছিল আমার পছন্দসই — ওর অল্পস্বল্প কথার মধ্যে দিয়ে কেমন করে যেন একধরনের মহৎ ও সরল সত্যের অভিব্যক্তি ঘটত। কম্‌সমোল সংগঠনে যাদের প্রথম নেয়া হয় ও ছিল তাদের মধ্যে একজন। ওর সম্পর্কে কভালের সুনির্দিষ্ট মতটা ছিল এইরকম:

'জীবনে কখনও ও বক্তৃতা দিতি পারবে না, প্রচারের কাজও ওর দ্বারা হবার নয়, কিন্তু ওর হাতে একবার মেশিনগান তুলে দিন, দেখবেন প্রাণ দেবে তবু ও মেশিনগান হাতছাড়া করবে না!'

সারা কলোনিই জানত যে চোবত গভীরভাবে নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কোর প্রেমে পড়েছে। নাতাশা থাকত মুসি কার্‌পভিচের বাড়িতে, মুসির ভাগ্নী এই পরিচয়ে, কিন্তু আসলে ও ছিল নিছক খামারের দিনমজুরনী। মুসি কার্‌পভিচ ওকে থিয়েটারে আসতে দিত বটে, কিন্তু ওর পোশাক-আশাক ছিল একেবারে হতদরিদ্র। বহুদিন ধরে অন্যের ব্যবহারে জীর্ণ এবং মোটেই মাপসই নয় এমন একখানা স্কার্ট আর সাবেক কালের কালো রঙের কুঁচি-দেয়া একটা ব্লাউজ পরনে থাকত ওর, আর পায়ে থাকত অন্য মাপের দোমড়ানো-মোচড়ানো একজোড়া বুটজুতো। এছাড়া অন্য কোনো পোশাকে মেয়েটিকে আমরা কোনোদিন দেখি নি। এই পোশাকে করুণ কাকতাড়ুয়া সেজে আসত নাতাশা, কিন্তু আবার এরই ফলে তার মুখখানির সৌন্দর্য যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। লোহার মরচের রঙের শতচ্ছিন্ন, ময়লা একখানা শালের বৃত্তাকার আবরণের মধ্যে থেকে যা শোভা পেত তা যেন ঠিক মানুষের মুখ ছিল না, ছিল সরলতা ও পবিত্রতার মহত্তম মূর্ত রূপ এবং একধরনের শিশুশোভন হাস্যময় আস্থার প্রকাশ। মুখ গোমড়া করে থাকা কাকে বলে নাতাশা তা জানত না, ক্রোধ ঘৃণা সন্দেহ কিংবা গভীর দুঃখের কোনো প্রকাশ ছিল না তার মুখে। যা সে করতে সমর্থ ছিল তা হল সাগ্রহে মনপ্রাণ ঢেলে কোনো কিছু শোনা। আর তখন তার চোখের মোটা-মোটা কালো-কালো পাতাগুলি প্রায়-অলক্ষ্যভাবে কাঁপতে থাকত সারাক্ষণ। আর নয়তো সে জানত খালি মন খুলে হাসতে, সামনের দিকের অল্প একটু বাঁকা একটি দাঁতসহ ছোট-ছোট দাঁতের সুন্দর সাজানো পাটি দুটি প্রকাশ করে ফেলে।

সব সময়ে এক দল মেয়েকে সঙ্গে করে কলোনিতে আসত নাতাশা। আর ওই সব মেয়ের লোক-দেখানো হৈ-হল্লার পটভূমিতে ওর সরল শিশুশোভন সংযত ভাব ও খোশমেজাজের কারণে ওকে আলাদা করে চিনে নেয়া যেত।

বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই চোবত ওর সঙ্গে দেখা করতে যেত। আর মুখ গোমড়া করে মেয়েটির পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকত ও। কিন্তু মেয়েটিকে অপ্রতিভ করে তোলা কিংবা তার আন্তর জীবনে কোনো পরিবর্তন ঘটানো ছিল চোবতের সাধ্যাতীত। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলুম না যে একেবারে

শিশুর মতো এই মেয়েটি সত্যি-সত্যিই চোবতকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু ছেলেরা একবাক্যে আমার প্রতিবাদ করে বলে উঠেছিল:

'কে? নাতাশা? বলেন কী, ও তো এক মুহূর্তও চিন্তা না করে চোবতের জন্য যে-কোনো বিপদের মুখি যেতি পারে!'

আসলে বলতে গেলে ওই সময়টায় প্রেমের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো যথেষ্ট অবকাশ আমাদের ছিল না। তখন এসে পড়েছিল বছরের সেই ঋতু যখন দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা আগুন ছড়িয়ে সূর্যের বাৎসরিক অভিযান শুরু করার কথা। শেরেও তখন যেন সূর্যের অভিযানের অনুকরণেই আমাদের ওপর এত কাজ চাপিয়ে দিচ্ছিলেন যে কথা বলার ফুরসত ছিল না, খালি হাঁসফাঁস করতে হচ্ছিল আমাদের। আর তখন দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ছিল যে মাত্র তার আগের শরৎকালেই কলোনির সাধারণ সভায় আমরা শেরের বীজবোনার ওই পরিকল্পনাটি কী প্রবল উৎসাহেই না অনুমোদন করেছি। সরকারিভাবে অবশ্য একটি ছয়-খেতি পর্যায়ক্রমিক ফসল ফলানোর ব্যবস্থা চালু করার কথা ছিল শেরের, কিন্তু কার্যত তিনি যা চালু করলেন তা ছিল অনেক বেশি জটিল একটা ব্যাপার। দানাশস্যের চাষ বলতে গেলে শেরে প্রায় করলেনই না। মাত্র সাত হেক্টরের মতো জমিতে তিনি বুনলেন শীতকালীন গম। এছাড়া আমাদের তালুকের একটা একেবারে প্রত্যন্ত অংশে ছোটখাট একটা খেতে বুনলেন জই আর যবের দানা। এছাড়া আরও একটুকরো জমি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে শেরে আলাদা করে রেখেছিলেন। এই জমিটাতে তিনি আমাদের অজানা একজাতের জোয়ার বুনেছিলেন, আর বলেছিলেন ওই ফসলটা নিয়ে কৃষকরা ভারি ধাঁধায় পড়ে যাবে, কারণ ওটা যে জোয়ার তা তারা ধরতেই পারবে না।

তবে তখনও পর্যন্ত কৃষকরা নয় আমরাই ধাঁধায় পড়ে ছিলুম। এইভাবে সেবার নানা খেতে আলু, বীট, তরমুজ, বাঁধাকপি এবং নানা জাতের মটরশুঁটির বিরাট এক আবাদ গড়ে উঠল। এই সবকিছুর মধ্যে তারতম্য বোঝা অবশ্য আমাদের পক্ষে খুবই মুশকিল ছিল। ছেলেরা তখন বলত, শেরে নাকি আবাদে রীতিমতো এক প্রতিবিপ্লবের চাষ শুরু করে দিয়েছেন:

'সারা খেত জুড়ে আছে খালি ওনার যতসব রাজা, রানী, জার, এইসব!'

বাস্তবিক সব ক'টা খেত একেবারে নিখুঁত রকমের সোজা-সোজা সীমারেখা আর বেড়া দিয়ে ঘিরে শেরে কাঠের খোঁটার আগায় ছোট-ছোট বোর্ড লটকিয়ে

দিয়েছিলেন আর প্রতি খেতে কিসের বীজ কতটা করে বোনা হয়েছিল প্রত্যেকটি বোর্ডে তা খোদাই করিয়ে রেখেছিলেন। আর দেখা গেল একদিন সকালে কলোনি-বাসিন্দারা (কাকপাখির উৎপাত থেকে খেতে-বোনা বীজগুলো রক্ষা করত যারা সম্ভবত সেই ছেলেরাই) শেরের বোর্ডগুলোর পাশে-পাশে তাদের নিজস্ব সব সাইনবোর্ড লটকিয়ে দিয়েছে। মনে-মনে এতে গভীরভাবে আহত বোধ করলেন শেরে। দলপতি-পরিষদের এক জরুরি সভা ডাকার দাবি জানালেন তিনি আর সেই সভায় তাঁর কাছ থেকে যেরকম ব্যবহার পেতে আমরা একেবারেই অভ্যস্ত ছিলুম না সেই রকম আচরণ করলেন। অর্থাৎ কিনা আমাদের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন:

'বিলকুল অর্থহীন ব্যাপার, একেবারে গাধার মতো ভাঁড়ামি ছাড়া এটা কী? বিভিন্ন ফসলের প্রচলিত যে-নাম সেই নামই দিয়েছি আমি। একজাতের ফসলকে যদি 'আন্দালুসিয়ার রাজা' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে তো বুঝতে হবে সারা দুনিয়া জুড়ে ওই ফসলের ওই-ই নাম। নিজে-নিজে নাম বানাতে তো আমি পারি না। এটা নিছক গুণ্ডামি ছাড়া আর কী? ছেলেরা যতসব আজগবি জেনারেল বীট, কর্নেল কড়াইশুঁটি, ক্যাপ্টেন তরমুজ আর লেফ্টেন্যান্ট টোম্যাটো নামকরণ করে এর মধ্যে মাথা গলাতে আসে কেন, শুনি?'

তরিতরকারির এই সব ফৌজী সেনানায়ককে নিয়ে যে কী করা উচিত তা বুঝে উঠতে না-পেরে দলপতিরা হেসে দিল। তারপর খুব মাতব্বরি ঢঙে জিজ্ঞাসা করল:

'বোকার মতন এই রসিকতাটার জন্যি কারা-কারা দায়ী একবার দেখা যাক! ফসলগুলা আগে ছিল রাজারাজড়া, আর তারপর হয়ে গেল কিনা বেকসুর ক্যাপ্টেন আর ভগা জানে কী সব?..'

শেরেকে ওদের নিজের মতো করে একধরনের সমীহ করে চললেও ছেলেরা এ-কথায় না-হেসে পারল না। এই মতদ্বৈধের গুরুত্ব বুঝে অবশেষে সিলান্তি আবহাওয়াটাকে হাল্কা করে দিতে চেষ্টা করল। বলল:

'ব্যাপারখান হল্য গে এই, বোঝলা — যে-রাজারে খাতি পারে, অরে কী য্যানো কয়, গোরুতি, তারে ভয়ের কিছু নাই — এমনধারা রাজারে রাজাই থাকতি দেয়া যাতি পারে।'

কালিনা ইভানভিচও শেরের পক্ষ নিল:

'এত শোরগোল কী লইয়া শুনি? তমরা দেখাইতে চাও যে তমরা সব খাঁটি বিপ্লবী, তমরা রাজা-বাদশাগো সাথে লড়াই কইরবার চাও, রক্তশোষাগো মুন্ড কাইট্যা ফালাইতে চাও - এই তো? তা, এয়া লইয়া বেশি দুশ্চিন্তা করনের কিছু নাই – তোমাগো পেত্যেকেরে আমরা একখান কইর‍্যা ছুরি দিমু-আনে, আর যতক্ষণ না শরীলে ঘাম বাইরায় ততক্ষণ সব্জিগুলারে তমরা প্রাণের সুখে কাইট্যো, কেমন?'

ছেলেরা বুঝল একথার মানে কী, আর তাই একেবারে মাথাটি নিচু করে তারা কালিনা ইভানভিচের সিদ্ধান্ত মেনে নিল। এইভাবে সেবার আমাদের আবাদে প্রতিবিপ্লবের ব্যাপারটার অবসান ঘটল। অতঃপর শেরে যখন আমাদের বড় দালানটার সামনের বাগানে শ-দুই গোলাপচারা পুঁতে বাগানের সামনে 'তুষার-রানী' নামের বোর্ড লটকিয়ে দিলেন, একজনও কলোনি-বাসিন্দা তখন প্রতিবাদ করল না। কারাবানভ কেবল ফোড়ন কেটে বলল:

'রানী হোক বা না-হোক কিছু এসে যায় না, কেবল গন্ধটা মিষ্টি হলিই হল।'

বীটের ফসলই সেবার আমাদের সবচেয়ে জ্বালাতন করে মেরেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, বীট হল যাকে বলে জঘন্যরকমের বিরক্তিকর একটা ফসল। বীট বোনা খুব সহজ, কিন্তু তারপর তার তদারক করতে-করতে পাগল হবার দাখিল। অনেক সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে মাটির ওপর চারাগুলো মাথা জাগাতে-না-জাগাতে বীটখেতের আগাছা নিড়নোর দরকার হয়। আর প্রথমবার এই আগাছা নিড়নো একটা মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। নতুন গজানো চারাগুলোকে আগাছা থেকে আলাদা করে চেনা যার-তার কম্মো নয়। শেরে তাই দাবি জানালেন, আগাছা নিড়নোর কাজে বড় ছেলেদের লাগাতে দিতে হবে। এতে বড় ছেলেদের আবার আপত্তি ছিল! তারা অনুযোগ করে বলল:

'কী বীটখেত ফের আমাদেরই নিড়াতে হবে? কেন, এককালে কি আমরা খেত-নিড়ানোর কাজ যথেষ্ট করি নাই?'

যাই হোক, প্রথম নিড়েন তো চুকল, কিন্তু তারপরই এসে গেল দ্বিতীয় নিড়েনের কাজ। যখন সকলেই মাথা ঘামাচ্ছে বাঁধাকপি আর কড়াইয়ের খেত নিয়ে আর ঘাস শুকিয়ে খড় তৈরির কাজ যখন প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছে এহেন সময়ে কী কান্ড! শেরে কিনা তাঁর রবিবারের দরখাস্তে ঠান্ডামাথায় বেমালুম লিখলেন, 'বীটখেত নিড়ানোর জন্যে চল্লিশ জনকে চাই।'

দলপতি-পরিষদের সেক্রেটারি ভের্শ্নেভ এই ভালোমানুষি-ভরা আবেদনের ওপর এক-নজর চোখ বুলিয়েই উঠল একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে। টেবিলের ওপর সজোরে ঘুসি মেরে বলল:

'এ-এইটা কী ব্যাপার? আবার সেই বীট? আ মলো যা, জ্বালিয়ে মারলে দেখি! কিন্তু ব্যাপারটা ঢোকবে কবে?.. তা, আপনি বোধহয় ভুল করি একটা পুরানো দরখাস্ত দিয়ি বসে আছেন, তাই না?'

'না। নতুন দরখাস্তই,' ধীর-গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন শেরে। 'চল্লিশ জন লোক চাই আমার আর বড় ছেলেদেরই চাই।'

মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না সেদিন পরিষদের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ওই সময়ে গ্রীষ্ম কাটানোর জন্যে আমাদের কলোনির কাছাকাছি একখানা কুঁড়ে ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। বীটখেত নিড়নোর ব্যাপারে কলোনির ছেলেদের মেজাজ করতে দেখে তাঁর গালের টোলগুলোয় রীতিমতো ঢেউ খেলছিল তখন। তিনি বললেন:

'ইস্, ছেলেরা, তোমরা-না একেকটি কুঁড়ের বাদশা! তবে বর্শচ্-স্যুপে বীটের টুকরো খেতে তোমাদের মন্দ লাগে না নিশ্চয়ই!'

মাথাটা নিচু করে ঘোঁত্ঘোঁত আওয়াজ তুলে এর জবাব দিল সেমিওন। বলল:

'প্রথম কথা, এইটা হল গিয়ে গোরুঘোড়ার জাবনার বীট। দ্বিতীয়ত, আপনিও আসেন-না, খেত নিড়াতে আমাদের একটু সাহায্য করেন-না কেন? আপনি যদি মাত্তর দয়া করে আমাদের সাথে একটু কাজ করেন তো আমি কথা দিতেছি যে জঘন্য চাষের কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বীটখেতে কাজ করার জন্যি আমি একটা মিশ্র বাহিনী গড়ে তোলব!'

সহানুভূতি পাবার আশায় আমার দিকে ফিরে মুচকি হাসলেন মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না। তারপর মাথা হেলিয়ে কলোনির ছেলেদের দিকে ইঙ্গিত করে যেন বলতে চাইলেন:

'দেখুন দেখি কাণ্ড!..'

মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না সে-সময়ে ছুটিতে ছিলেন, তাই দিনের বেলায়ও কলোনিতে দেখা যেত তাঁকে। কিন্তু দিনের বেলায় কলোনি মোটেই উপভোগ্য জায়গা ছিল না। ঝুলকালি আর ধুলো মেখে রোদে-পোড়া ছেলেরা কলোনিতে ফিরত শুধু দুপুরের খাবার খেতে। আর কলোনিতে পেঁছেই নিড়ানিগুলো

কুদ্লাতির জিম্মায় ছুড়ে ফেলে রেখে বুদিয়োনির ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মতো প্রচণ্ড বেগে খাড়াই পাড় বেয়ে নদীতে নামতে-নামতে পথের মধ্যেই তারা নিজের-নিজের পরনের খাটো প্যান্ট খুলে রাখত। তারপর দেখতে-দেখতে কলমাক উত্তাল হয়ে উঠত তাদের উত্তপ্ত দেহের মাতামাতিতে, চিৎকারে, খেলাধুলোয়, দুষ্টুমিতে। আর পাড়ের ওপর ঝোপের আড়াল থেকে মেয়েরা তখন জুড়ত চিল-চিৎকার:

'এ-ই, যথেষ্ট ছ্যান হয়েছে, উঠে আয় বলতেছি! ছেলেরা, এই ছেলেরা, যা ভাগ্ দেখি! এবার আমাদের পালা!'

আর মুখখানায় বিব্রত ভাব ফুটিয়ে তুলে মনিটর তখন পাড়ের ওপর পায়চারি করতে থাকত। আর তখনও-পর্যন্ত-গরম খাটো প্যান্টগুলো ভিজে গায়েই টেনে পরতে-পরতে আর গা দিয়ে চকচকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার অবস্থাতেই ছেলেরা এসে পুরনো বাগানের ফোয়ারাটার চারপাশে-সাজানো টেবিলগুলোর ধারে জড় হোত। ওইখানেই মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না অনেকক্ষণ ধরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেন। গোটা কলোনিতে তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক অত গরমেও যিনি গায়ের চামড়া মোমের মতো শাদা রাখতে আর স্বাভাবিক চূর্ণকুন্তল বজায় রাখতে পেরেছিলেন। একারণে আমাদের ওই ভিড়ের মধ্যে তাঁকে অসম্ভবরকম পরিপাটি ঠেকত - এমন কি কালিনা ইভানভিচেরও এটা নজরে না-পড়ে পারে নি। একদিন তো ও বলেই বসল:

'মাইয়াটার চেহারাখান দ্যাখছ নি একবার, ভারি সোন্দর — তয় এখানে তা বৃথাই যাইতেছে, বোঝলা আন্তন সেমিওনভিচ! অর দিকি অমন তত্ত্বগত দৃষ্টিতে তাকাইলে চলব না, বোঝলা? হেয় কিন্তু তোমারে রক্তমাসে-গড়া মানুষ হিসাবেই দেইখ্যা থাকে আর তুমি কিনা ওর দিকি একদম নজর দাও না। ভাবখান এমন করত্যাছ-না, য্যান তুমি চাষীভুষি ছাড়া কিছু না।'

আমি বললুম, 'কী যে বলো-না তার ঠিক নেই! কলোনিতে বসে এখন প্রেম করলেই ষোলকলা পূর্ণ হয় আর-কি।'

'তাইলে তমার যা ইচ্ছা কর গিয়া!' পাইপে আগুন দিতে-দিতে বুড়োটে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল কালিনা ইভানভিচ। 'তয় এই কইয়া থুলাম, তোমারে কিন্তু বুড়া আঙ্গুল চোষতে হইব!..'

মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্নার নারীসুলভ গুণাবলীর কি তত্ত্বগত আর কি ব্যবহারিক কোনো বিশ্লেষণেই মন দেয়ার মতো যথেষ্ট সময় আমার ছিল না।

আর সম্ভবত সেই কারণেই তিনি আমাকে অনবরত চায়ের নেমন্তন্ন জানিয়ে যেতে লাগলেন। নেমন্তন্ন রক্ষা না-করায় এতদূর ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি যে শেষপর্যন্ত ভদ্রতা দেখিয়ে আমাকে বলতে হল:

'আসল ব্যাপার কী জানেন, আমি চা ভালোবাসি না — সত্যিই ভালোবাসি না!'

দুপুরের খাওয়াশেষে কলোনি-বাসিন্দারা সবাই যে-যার কাজে চলে যাওয়ার পর একদিন টেবিলে যখন মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না আর আমি মাত্র বসে ছিলুম তখন নিতান্তই সহজ বন্ধুত্বের সুরে তিনি আমায় বললেন:

'কূপমণ্ডূক প্রাজ্ঞ সেমিওনভিচ, আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শুনুন! আজ সন্ধেবেলা আপনি যদি আমার ঘরে না-আসেন তাহলে আমি কিন্তু আপনাকে অত্যন্ত অভদ্র বলে মনে করব।'

'কী খাওয়াবেন আমায়? চা?'

'আমি আইসক্রিম বানিয়েছি, বুঝেছেন? চা নয়, আইসক্রিম!.. বিশেষ করে আপনার জন্যেই বানিয়েছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললুম, 'ঠিক আছে। আইসক্রিম খেতে কখন যাব বলুন?'

'সন্ধে আটটায়।'

'কিন্তু সাড়ে আটটায় যে আমাকে দলপতিদের রিপোর্ট শুনতে হবে।'

'ইস্, শিক্ষাবিজ্ঞানের কাছে যে একেবারে আত্মাহুতি দিয়ে বসে আছেন দেখছি!.. ঠিক আছে, তাহলে — নটায় আসুন।'

কিন্তু দলপতিদের রিপোর্ট শোনার ঠিক পরেই সন্ধে নটা লাগাদ অফিস-ঘরে বসে আমি যখন বিব্রত হয়ে ভাবছি যে এখুনি আমাকে আইসক্রিম খেতে যেতে হবে অথচ এখনও পর্যন্ত দাড়ি কামানোর সময়টুকুও করে উঠতে পারি নি, এমন সময় মিত্‌কা জেভেলি ছুটে এসে চিৎকার করে বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, শিগ্‌গিরি আসেন দেখি একবার!'

'কেন? কী হল?'

'চোবত আর নাতাশারে নিয়ি এসেছে ছেলেরা। আর ওই যে ঠাকুদ্দা, অর নাম কী বলে যেন... ও হ্যাঁ মুসি কার্‌পভিচ...'

'ওরা কোথায়?'

'ওইখেনে, বাগিচার মধ্যি...'

তাড়াতাড়ি বাগানে গেলুম। লাইলাক-বীথির ধারে একখানা বেঞ্চিতে

আতঙ্কে জড়সড় হয়ে বসে ছিল নাতাশা। ওকে ঘিরে ছিল কলোনির একদল বাচ্চা মেয়ে আর মহিলাদের কয়েকজন। আর সারা পথটা জুড়ে ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেরা কী যেন একটা ব্যাপার নিয়ে তুমুল আলোচনা জুড়ে দিয়েছিল। শুনলুম কারাবানভ বলছে:

'ঠিকই করেছে! শুয়রটারে পিটায়ে মারো্য ফেললেই ভালো করত!..'

থরথর করে কাঁপছিল চোবত আর কাঁদছিল। আর জাদোরভ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল:

'আরে, অত ভয় পাবার কী আছে! এই তো আন্তন এসে গেছেন — উনিই সব ঠিক করে দেবেন, দ্যাখ্-না।'

উত্তেজনার চোটে একে অপরকে বাধা দিতে-দিতে ছেলেরা আমায় নিচের গল্পটা শোনাল।

আসলে হয়েছিল কী, মুসি কার্পভিচ নাতাশাকে শাস্তি দিচ্ছিল — সম্ভবত কয়েকখানা ঘরে-বোনা পশমী কাপড় কিংবা ওই ধরনের কিছু-একটা রোদ্দুরে শুকোতে দিতে ভুলে যাওয়ায়। তা সে যাই হোক, ঘোড়ার লাগাম দিয়ে মুসি নাতাশাকে সবে দু-এক ঘা লাগিয়েছে আর ঠিক তখনই চোবত সেখানে গিয়ে হাজির। চোবত যে তারপর মুসি কার্পভিচকে কী করেছিল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। নিজে চোবত চুপ করে ছিল। তবে এটুকু বোঝা গেল যে মুসি কার্পভিচের প্রাণপণ চিৎকার শুনে খামারখোলার আশপাশের কিছু লোক আর জনাকয়েক কলোনি-বাসিন্দা ছুটে গিয়ে দ্যাখে যে রক্তে মাখামাখি অবস্থায় আতঙ্কে জড়সড় হয়ে মুসি ঘরের এককোণে বসে আছে। তার তখন ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। মুসির এক ছেলের অবস্থাও তথৈবচ। চোবতকে দেখা গিয়েছিল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। কারাবানভের ভাষায়, সে তখন খ্যাপা কুকুরের মতো গর্গর করছিল। নাতাশাকে পরে কোনো এক প্রতিবেশীর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

এর ফলে কলোনির ছেলেদের আর খামারখোলাগুলোর বাসিন্দাদের মধ্যে নাকি কিছুটা বোঝাপড়ার দরকার হয়ে পড়ে। এই বোঝাপড়ার সময়ে কিলচড় ও অন্যান্য ধরনের কিছু-কিছু আত্মরক্ষার উপায় যে উপেক্ষিত হয় নি, চিহ্ন দেখে তা-ও মালুম হল। তবে ছেলেরা এ-সম্পর্কে বিশেষ কিছু ভাঙল না, খালি নাটকীয়ভাবে আবেগ দিয়ে বলল:

'বিশেষ কিছু করি নাই আমরা, কেবল এই — কী বলে — দুর্ঘটনার পর এক-আধটুক ওষুধবিষুধ দিছি আর-কি। আর কারাবানভ নাতাশারে কয়েল, 'তুমি কলোনিতি চলি এস, নাতাশা। ভয়ের কিছু নাই, কলোনিতি দেখবে লোকজন সবাই খুব ভালো। বোঝলে, ওখেনে আমরা এর এট্রা ফয়সলা করব-নে'।'

এই গোলমালে যারা জড়িত ছিল তাদের সবাইকে অফিস-ঘরে ডেকে নিলুম।

গম্ভীরভাবে বড়-বড় চোখ মেলে ওর পক্ষে অভিনব চারপাশের সবকিছু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল নাতাশা। ও যে ভয় পেয়েছে তা কেবল টের পাওয়া যাচ্ছিল ওর ঠোঁটের প্রায়-অদৃশ্য কাঁপুনিতে এবং গালের ওপর গড়িয়ে-পড়া ক্রমশ ঠান্ডা-হয়ে-আসা একফোঁটা গরম চোখের জল দেখে।

'তা, কী করা যায় বলেন দেখি?' কারাবানভ তীব্র স্বরে বলল। 'এর একটা হেস্তনেস্ত তো করা দরকার!'

বললুম, 'তা, বেশ তো, হেস্তনেস্ত একটা করা যাক!'

'ওদের বিয়া দিয়ি দ্যান!' প্রস্তাব করল বুরুন।

জবাব দিলুম, 'বিয়ে দেবার অনেক সময় পাওয়া যাবে হে। এখুনি সেটা করার দরকার নেই। তবে নাতাশাকে কলোনিতে ভর্তি করে নেয়ার পুরো অধিকার আছে আমাদের। এতে কারও আপত্তি আছে?.. চুপ, চুপ — অত চেঁচাবার দরকার নেই! মেয়েটিকে ভর্তি করে নেয়ার জায়গা আছে আমাদের। কোল্কা, কালকের নির্দেশনামায় ওকে পঞ্চম মিশ্র বাহিনীতে একটা জায়গা করে দাও।'

'ঠিক হ্যয়!' গর্জন করে উঠল কোল্কা।

রঙ্চটা শালখানা গা থেকে হঠাৎ খুলে ফেলল নাতাশা। চোখ দুটো ওর বাতাসে লকলকিয়ে-ওঠা আগুনের শিখার মতো জ্বলছিল। একমাত্র শিশুরা যেভাবে হাসতে পারে সেইভাবে আনন্দে একগাল হাসি নিয়ে ও ছুটে আমার কাছে এল। বলল:

'সত্যই? ঠিক কতিছেন? কলোনিতি নিবেন আমারে? ওহ্, ধন্যবাদ আপনারে খুড়ামশয়!'

ছেলেরা তাদের উদ্বেল আবেগকে চাপা দিল হাসির হর্রা ছুটিয়ে। মেঝের ওপর পা ঠুকে কারাবানভ বলল:

'আরে, কী সহজ! এত সহজ... ধ্বত্তোরি ছাই! কলোনিতে ঢুকে পড়া, বটে, বটে! কলোনি-বাসিন্দার গায়ে হাত দিবার চেষ্টা করে দেখুক না একবার!'

দারুণ খুশি হয়ে মেয়েরা নাতাশাকে একেবারে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। আর অনেকক্ষণ ধরে বকবকানি চালিয়ে গেল ছেলের দল। টেবিলের উলটো দিকে আমার মুখোমুখি এতক্ষণ বসে ছিল চোবত। এবার সে আমাকে ধন্যবাদ জানানোর চেষ্টা করল:

'এয়া যে হতি পারে এ আমার পেত্যয়ই যেত না!.. আমার মতন এমন একজন তুচ্ছ প্রাণীরে বাঁচানোর জন্যি ধন্যবাদ আপনারে!.. আর বিয়া করা — সে-সব পরে হলি চলবে-নে!..'

ঘটনাটা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সেদিন আলোচনা করলুম আমরা। ছেলেরা এরকম আরও সব ঘটনার উল্লেখ করলে, সিলান্তি সজোরে মতামত জাহির করল, আর তারপর কলোনি-বাসিন্দার পোশাক-পরা নাতাশাকে এনে একবার আমাকে দেখিয়েও নিয়ে যাওয়া হল। না, নববধূ নয়, ওকে দেখতে লাগছিল ছোট্ট একটি নরমসরম কুমারী-কন্যার মতো। সবশেষে কালিনা ইভানভিচ এসে ঘরে ঢুকল আর সেদিনকার সন্ধেবেলার নানা ঘটনার মোদ্দা কথাটা জানিয়ে দিল এইভাবে:

'এত সোরগোল তোলার আছেটা কী রে বাপু! যতক্ষণ পর্যন্ত তমরা কোনো জ্যান্ত মানুষির মাথা কাইট্যা না-ফালাইতাছ, লোকটা যতক্ষণ জ্যান্ত আছে, ব্যস, ততক্ষণ সব ঠিক আছে। চল, আমার সাথে একবার আবাদে চল — নিজের চক্ষে সবকিছু দ্যাখতে পাবা! পরগাছাগুলা এখন নিজিগো খড়ের গাদাগুলা ক্যামনে একাকার কইর‍্যা রাখছে একবার আইস্যা দেইখ্যা যাও দেখি — পটল তোলার আর কফিনে শোওনের আগে আর কখনও অরা এত শান্তশিষ্ট হইতে পারত কিনা সন্দেহ।'

মাঝরাত্রি পার হয়ে যাবার পর কালিনা ইভানভিচ আর আমি সেদিন মাঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। মনে হচ্ছিল, উষ্ণ নিথর রাত্রি যেন কান পেতে কথা শুনছে কালিনা ইভানভিচের। আঁটোসাঁটো, ছিমছাম পপ্‌লার গাছগুলো সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে তাদের দীর্ঘদিনের নেশায় বুঁদ হয়ে চারদিক থেকে আমাদের কলোনিকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছিল আর নিজ-নিজ চিন্তায় ছিল বিভোর হয়ে। দেখতে-দেখতে চারপাশে যে-সব পরিবর্তন ঘটে

গিয়েছিল হয়তো তাইতেই তারা হতবাক্ হয়ে ছিল। গোড়ায় একদিন তাদের সারবন্দীভাবে দাঁড় করানো হয়েছিল ত্রেপ্‌কের তালুক পাহারা দেয়ার জন্যে, আর এখন তারা পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছিল মাক্সিম গোর্কি কলোনি।

পপ্‌লার-বনের একটা কুঞ্জের ভেতর থেকে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার কুটিরটা তার অন্ধকার চক্ষুকোটরগুলো মেলে সোজা তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে। হঠাৎ দেখলুম কুটিরের একটা জানলা নিঃশব্দে খুলে গেল আর কেউ যেন জানলা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ল। লোকটা প্রথমে আমাদের দিকেই আসতে লাগল, তারপর একবার এক মুহূর্তের জন্যে থেমে দিকপরিবর্তন করে ঢুকে গেল জঙ্গলে। কালিনা ইভানভিচ তখন মির্‌গরদ থেকে ১৯১৮ সালের লোক-অপসারণের বর্ণনা দিচ্ছিল। কথার মাঝখানে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে থেমে সে শান্তভাবে মন্তব্য করল:

'বোঝলা-নি লোকটা কে? কারাবানভ অপদ্দাত্থটা, আবার কে! হেয় হইল গিয়া হাতে-কলমে কাজের লোক, নিছক তত্ত্বকথা আওড়ানোর লোক না, দ্যাখলা? আর তুমি —শিক্ষিত লোক হইলে কী হয় — যাও, এখন বুড়া আঙ্গুল চোষ গিয়া...'

৭

নতুনতরো বাহিনী

মুসি কার্‌পভিচ যখন কলোনিতে এল আমরা ভাবলুম ক্ষিপ্ত চোবত ওর মাথাটা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলায় ও বুঝি আমাদের গালিগালাজ করতে এসেছে। মুসি কার্‌পভিচের মাথাটায় অবশ্য দেখবার মতো একটা প্রকাণ্ড ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, কিন্তু দেখা গেল স্বভাবসিদ্ধ ধরনে কথা না-বলে ও যেন বিলাপ করছে 'মৃত্যুপথযাত্রী মরাল'-এর মতো। যাই হোক, যে-ব্যাপারটায় আমরা অত বিচলিত বোধ করছিলুম দেখা গেল সে-ব্যাপারের উল্লেখ করল ও একেবারে সন্ধি করার মনোভাব নিয়ে ক্রিস্টিয়ানসুলভ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। বলল:

'ভাবব্যেন না ছুঁড়িডার ব্যাপার নিয়ি কথা বলতি এস্যেছি! আমার দরকার ভেন্ন। ভগমানের দোহাই, আপনেদের সাথে বিবাদ করব্য ক্যানে? ক্যানে বিবাদ

করব্য, বলেন? কিসির জন্যি? ব্যাপার-স্যাপার যেমন চলত্যেছে চলুক-না, ক্ষেতি কী... আসলে আমি এস্যেছি ময়দা-কলডা নিয়ি কথা বলতি। গেরাম-সোভিয়েতের তরফ থেক্যে খুব ভালো এট্টা প্রস্তাব নিয়ি আপনেদের কাছে এস্যেছি।'

ভুরু কুঁচকে মুসি কার্পভিচের দিকে তাকিয়ে কভাল বললে·

'ময়দা-কল নিয়ি কথা বলতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! আপনেরা কলডা পাতি চান — অর্থাৎ ভাড়া নিতি চান, ইদিকে গেরাম-সোভিয়েতও ওই একই উদ্দেশ্যে একখান দরখাস্ত দেছে। তা, এ-ব্যাপারে ভাব্যেচিন্তে আমরা এট্টা মতলব ঠাউরায়্যেছি -- গেরাম-সোভিয়েতের মতন আপনেরাও হল্যেন গে স্থানীয় সোভিয়েত কর্তিপক্ষ। কাজেই এ-ব্যাপারে আপনেরা একদিকি আর আমরা অন্যদিকি থাকব্য, এমনডা হতিই পারে না...'

'আহা, তাই বটে!' কিছুটা যেন ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল কভাল।

অতঃপর নিজেদের মধ্যে কলোনিতে একটুখানি সংক্ষিপ্ত কূটনৈতিক সলাপরামর্শের দরকার হয়ে পড়ল। কভালকে ও অন্য ছেলেদের আমি বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করে ফেললুম যে তারা তাদের আসল মনোভাব আপাতত কূটনৈতিক পোশাক আর শাদা টাইয়ে ঢেকে রাখবে। ফলে কয়েক দিন ধরে লুকা সেমিওনভিচ ও মুসি কার্পভিচের পক্ষে জীবন বিপন্ন না করেই কলোনিতে এসে দেখা দেয়া সম্ভব হল।

ওই সময়ে নতুন কয়েকটা ঘোড়া কেনার দরকার হয়ে পড়েছিল, আর তাই নিয়ে গোটা কলোনিই ছিল অত্যন্ত দুশ্চিন্তিত হয়ে। গাড়িতে জোতার উপযোগী আমাদের বিখ্যাত ঘোড়াগুলো চোখের সামনে দেখতে-দেখতে বুড়ো হয়ে পড়ছিল, এমন কি 'লালু'রও দাড়ি গজাচ্ছিল। ওদিকে দলপতি-পরিষদ তার আগেই 'খোকাবাবু'কে অশক্ত বলে ঘোষণা করে বসে-বসে তার মাসোহারা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে কলোনিতে তার থাকার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকবে এবং যে-ক'টা দিন সে বাঁচবে সেই ক'দিন জইয়ের একটা বরাদ্দ নির্দিষ্ট থাকবে তার জন্যে। আর একমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আমার অনুমতি নিয়েই তবে তাকে কখনও-সখনও গাড়িতে জোতা চলবে। এছাড়া আর তিনটে ঘোড়া -- 'ডাকাতনী', 'মেরি' আর 'বাজপাখি' সম্বন্ধে শেরে কোনোদিনই ভালো ধারণা পোষণ করতেন না।

বলতেন, 'ভালো খামার হতে হলে সেখানে ভালো-ভালো ঘোড়া থাকতেই হবে। ঘোড়াগুলো ভালো না হলে খামার ভালো হতেই পারে না।'

আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কোর রেওয়াজ ছিল এই যে সে পালা করে এককেবার কিছুদিন এককেটা ঘোড়ার প্রেমে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেত। তবে 'লালু'কে সে পছন্দ করত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এমন কি সেই ব্রাত্‌চেঙ্কোকেও দেখা গেল যে শেরের ধ্যানধারণার প্রভাবে পড়ে ভবিষ্যতে সত্যিকার ভালো-ভালো ঘোড়া পাওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে সে। তার আশা ছিল এমনতরো ঘোড়া বুঝি রাতারাতি একদিন আমাদের মধ্যে এসে আবির্ভূত হবে। শেরে, কালিনা ইভানভিচ, ব্রাত্‌চেঙ্কো আর আমি — আমাদের এই ক'জনের কখনও কোনো-না-কোনো মেলায় ঢুঁ-মারার কামাই ছিল না। আর সে-সব জায়গায় হাজার-হাজার ঘোড়া পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ জুটত আমাদের। তবে তখনও পর্যন্ত একটাও ঘোড়া কেনা হয়ে ওঠে নি। কখনও দেখা যেত মেলায় বিক্রির জন্যে আনা ঘোড়া আমাদের ঘোড়াগুলোর চেয়ে কোনো অংশে ভালো নয়, কখনও-বা কেনার উপযোগী ঘোড়ার দাম ধরা হয়েছে আমাদের পক্ষে খুবই বেশি, আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সযত্নে লুকনো ঘোড়ার কোনো খুঁত বা অসুখ শেরের সতর্ক চোখে ধরা পড়ে যেত। তাছাড়া এটাও সত্যি যে ওই সব মেলায় ভালো জাতের ঘোড়া পাওয়াও সম্ভব ছিল না। তার আগের কয়েক বছরের যুদ্ধ আর বিপ্লব অপেক্ষাকৃত ভালো জাতের ঘোড়ার একেবারে সর্বনাশ করে ছেড়েছিল, অথচ ঘোড়া প্রজননের উপযোগী নতুন-নতুন খামার তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। কখনও-কখনও আন্তন কোনো মেলা থেকে এমন মেজাজ নিয়ে ফিরত যাকে অন্ধ আক্রোশের কাছাকাছি বলা যেতে পারে। সে বলত:

'ব্যাপারখানা কী? সারা মুল্লুকে কোথাও ঘোড়া নাই, নাকি? কিন্তু আমাদের একটা ভদ্দরগোছের ঘোড়ার দরকার পড়লি করব কী আমরা? হাতে টুপি নিয়ে বুর্জোয়া ভদ্দরলোকদের দোরে-দোরে ভিখ মেগে বেড়াতে হবে, নাকি?'

ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পুরনো লোক হিসেবে কালিনা ইভানভিচ ঘোড়াঘটিত সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে মাথা ঘামাতে ভালোবাসত। আর অন্তত এই একটি বিষয়ে এমন কি শেরে পর্যন্ত তাঁর স্থায়ী ঈর্ষার মনোভাবের রাশ কিছুটা আলগা দিতেন আর কালিনা ইভানভিচের জ্ঞানগম্যিতে আস্থা রাখতেন। বিশেষজ্ঞদের

এই রকম একটা দলে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কালিনা ইভানভিচ বলল:

'লুকা আর মুসি দুই রক্তশোষাতে কয় কী যে খামারখোলার মুজিকগো নাকি ভালো-ভালো ঘোড়া আছে কিন্তু অরা সেগুলা মেলাতে লইয়া যায় না। অরা ভয় পায়।'

শেরে বললেন, 'মোটেই তা নয়। ভদ্দরগোছের ঘোড়াই নেই ওদের। আমাদের যেমন চোখে পড়েছে কেবল ওইরকমই আছে মাত্র। তবে ভয় নেই, শিগ্‌গিরই আমরা ঘোড়া-প্রজননের খামারগুলো থেকে ভালো-ভালো ঘোড়া পেতে পারব, তবে আর একটু সবুর করতে হবে এই যা।'

কালিনা ইভানভিচ কিন্তু জোর দিয়ে বলল, 'আমি বলতাছি, অগো নিচ্চয় আছে। লুকা, ওই ব্যাটা কুত্তির বাচ্চা, সারা জেলার অন্ধিসন্ধি জানে ও, কোথায় কী চলতাছে সবই অর নখদপ্পনে। তাছাড়া ব্যাপারটা একটু চিন্তা কইর‍্যা দ্যাখলেও বোঝন যায় যে হাতে-কলমে যে-সকল খামারী কাজ করে তাগো কাছে ছাড়া ভালো জাতের ঘোড়া আর মিলবটা কোথায়? আর হাতে-কলমে যে-সকল খামারী কাজ করে তারা তো খামারখোলাগুলাতেই থাকে, নাকি! ব্যাটারা — পরগাছাগুলা — গা-ঢাকা দিয়া থাকে আর গোপনে ঘোড়ার বাচ্চা পালে। হারামজাদা পাজিগুলা ডরায় পাছে কেউ অগো থেইক্যা ঘোড়া কাইড়্যা লয়। তয় আমরা নিজিরা যদি অগো কাছে যাই, তাইলে হইতে পারে এক-আধটা ঘোড়া পাইলেও পাইতে পারি...'

মতাদর্শের ব্যাপারটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না-ঘামিয়ে আমিও সমস্যাটার সমাধান করতে চাইলুম এইভাবে:

'ঠিক আছে, আসচে রবিবার নিজেরাই গিয়ে সরেজমিনে খোঁজ করা যাবে। হয়তো এক-আধটা ঘোড়া কিনতে পেয়েও যেতে পারি, কে বলতে পারে!'

'তা মন্দ কী?' শেরেও সায় দিলেন। 'ঘোড়া অবশ্য কেনা হবে না আমাদের, তবে এদিক-ওদিক খানিকটা বেড়ানো তো হবে। এই সব হাতে-কলমে কাজের খামারী কী-কী ধরনের ফসল ফলায় একবার তা চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছে আছে।'

পরের রবিবার ফিটনগাড়িতে গোটা দুই ঘোড়া জুতে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। যে-সমস্ত নরম ধুলোভরা কাঁচা রাস্তা গ্রামগুলোকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল সেগুলো ধরে দুলকি চালে চলতে লাগলুম।

এইভাবে গন্চারোভ্কা পার হয়ে খার্কভমুখো বড়রাস্তা ডিঙিয়ে একটা পাইনবনের বেলেমাটির পথ পায়ে-পায়ে মাড়িয়ে এসে পেঁছিলুম এমন একটা ‘দূর অঞ্চলে’ যেখানে আগে কোনোদিন আমরা আসি নি।

উঁচু একটা ডাঙাজমির ওপরে পেঁছিতে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হল আপাতদৃষ্টিতে মনোরম বিস্তৃত এক দৃশ্যপট। সামনে ছড়িয়ে ছিল প্রায়-সীমাহীন, দিগন্তবিস্তৃত এক সমভূমি। মনে হচ্ছিল, কে যেন আগাগোড়া স্টিমরোলার চালিয়ে জমিটাকে অমন সমান করে দিয়েছে। এই দৃশ্যপট যে বৈচিত্র্যের জন্যে উল্লেখ্য ছিল তা নয়, বরং সম্ভবত বৈচিত্র্যের অভাব ও একঘেয়েমিই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। সারা জায়গাটা ছেয়ে ছিল ঘন-করে-বোনা ফসলে। চারিদিকে খালি ঢেউয়ের পর ঢেউ -- সোনালি, সবুজ-সোনা, সোনালি-তামাটে। আর তার মাঝেমধ্যে এখানে-ওখানে খালি জোয়ার-ফসলের উজ্জ্বল সবুজের ছোঁয়া কিংবা বাজরাখেতের টোল-খাওয়া লালচে-শাদা-সবুজ উপরিতলের বৈচিত্র্য। আর এই সোনালিরঙের পটভূমিতে প্রায় দৃষ্টিকটু রকমের নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে সাজানো একেক গুচ্ছ তুষার-শাদা কুঁড়েঘর আর তাদের চারপাশের নিচু জমিতে সুনির্দিষ্ট অবয়বহীন যতসব বাগানজমি আর সব্জিখেত। প্রতিটি কুঁড়ের গুচ্ছকে ঘিরে ছিল দুটি বা তিনটি উইলো আর অ্যাস্প গাছ, কিংবা কখনও-কখনও পপ্লার-কুঞ্জ আর পাহারাদারের বাদামিরঙের জীর্ণ কুঁড়েসহ একখানি করে তরমুজ-খেত। সবই ছিল আমাদের ওই অঞ্চলের একেবারে নিখুঁত রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিতে সাজানো — সবচেয়ে কড়া নিসর্গ-চিত্রীর চোখেও প্রচলিত রীতির একটিমাত্র ব্যত্যয় ধরা পড়ত কিনা সন্দেহ।

ছবিটা কালিনা ইভানভিচের ভারি মনে ধরে গেল। সে বলল:

‘আরে, দ্যাখো দ্যাখো, খ্যাতমালিক থাকে কেমন ছিমছাম! এখেনকার লোকজন দ্যাখতাছি গোছগাছ জানে ভালো!’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেরেকে কথাটা মেনে নিতে হল। বললেন, ‘তাই বটে।’

‘চল, সামনের ওই ঘরখানায় ঢুঁ মাইর‍্যা দেখা যাক,’ কালিনা ইভানভিচ প্রস্তাব করল।

ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে-চলা একটা পথে গাড়ি ঢোকাল আন্তন। অতঃপর আমরা গিয়ে একখানা বাড়ির বেড়ার নেহাত শাদাসিধে একটা আগড়ের সামনে দাঁড়ালুম। আগড় মানে, পাতলা খানতিনেক উইলোগাছের গুঁড়ি

গাছের বাকল দিয়ে বাঁধা। উঠোনে ঢুকতেই পাঁশুটেরঙের ঘেয়ো একটা নেড়িকুত্তা একখানা গাড়ির তলা থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে আমাদের দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে খরখরে কর্কশ গলায় ঘেউঘেউ ডাক ছাড়তে লাগল। অবশেষে সাক্ষাৎ মিলল কুঁড়ের মালিকের। অযত্নে বেড়ে-ওঠা দাড়ির গোছা থেকে কী যেন ঝাড়তে-ঝাড়তে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে তাজ্জব বনে গিয়ে এবং যেন কিছুটা উৎকণ্ঠা নিয়েই সে আমার আপাতদৃষ্টিতে ফৌজী পোশাকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'সেলাম, কর্তা!' কালিনা ইভানভিচ হাসিমুখে আলাপ শুরু করল। 'গির্জা থেইক্যা এই ফেরলেন বুঝি?'

সম্পত্তিরক্ষক ওর পোষা প্রাণীটির মতোই আলস্যে-ভরা খরখরে গলায় গৃহস্বামী বলল, 'গির্জায় বেশি যাই না আমি। তয় আমার ইস্তিরি মাঝেমধ্যি যায় বটে... তা, আপনেরা আসতিছেন কনে থেক্যে?'

'আমরা কাজের লেগ্যে আসছি। শুনছি আপনেদের এখেনে নাকি ভালো একটা ঘোড়া আছে বিক্রির লেগ্যে। তা, কথাটা সত্য?'

এ-কথায় গৃহস্বামীর চোখ দুটো আমাদের ঘোড়ার গাড়িখানার ওপর একচক্কর ঘুরে এল। আমাদের 'লালু' আর কালোরঙের 'মেরি' জুড়ি হিসেবে মোটেই তেমন যুতসই নয় দেখে ওর উদ্বেগ যেন কিছুটা কমল বলে মনে হল।

'আমিই তো কথাডা নূতন শোনত্যেছি! ভালো-ভালো ঘোড়া আমি পাব কনে, কন দেখি? তয় এট্টা ঘোড়া অবিশ্যি আছে আমার -- তিনবছুরে মাদী এট্টা। তা অতেই বোধকরি আপনেদের কাম চল্যে যাবে-নে?'

আস্তাবলে ঢুকে একেবারে ভেতরের একটা কোণ থেকে তিনবছুরে একটা মাদী ঘোড়া বের করে আনল লোকটা। দেখা গেল, ঘোড়াটা বেশ প্রাণবন্ত আর হৃষ্টপুষ্ট।

'জোয়ালে কখনও জোতেন নি এটাকে?' শেরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'বিশেষ কোনো কাজির জন্যি এডারে জোয়ালে জোতা হয় নাই বটে, তয় গাড়ি টানার দরকার হলি এরে অনায়াসে জোয়ালে জুততি পারব্যেন। গাড়ি টানার পক্ষি এডা ভালোই হব্যে, সে আমি চোখ বুজ্যে কতি পারি!'

কিন্তু শেরে বললেন, 'না। একে দিয়ে চলবে না। আমাদের কাজের পক্ষে এটা খুবই বাচ্চা। আগে থেকেই কাজে লেগেছে এমন একটা ঘোড়া আমাদের দরকার।'

'তা সত্য, ঘোড়াডা বাচ্চাই,' মালিক স্বীকার করল। 'তয় ভালো ঘরে পড়লি এডা চড়চড় কর্যে বাড়ব্যে-নে। সে আমি আপনেরে কথা দিতি পারি। এডারে আমি তিন বছর ধর্যে পাল্যেছি। তা দেখ্যেই বোঝতি পারেন, কত যত্ন কর্যে পাল্যেছি। তাই না?'

মাদী ঘোড়াটা যে যত্নে লালিত হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। অন্তত পালক গৃহস্বামীর চেয়ে সে যে এক শো-গুণ বেশি যত্নে পালিত হচ্ছিল তা তার পরিষ্কার চকচকে গায়ের চামড়া আর সযত্নে-আঁচড়ানো কেশর দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছিল।

'তা, এটার জন্যে কত দাম চান আপনি?'

'তা, কাজের লোক আপনেরা কাজের জন্যি ঘোড়া কিনতি চান — বেশি দাম আর বলি কী কর্যে? তা, ওই ষাট চের্‌ভোনেত্‌সই দিবেন, আর তার সাথে একপেট খানাপিনা, এই আর-কি।'

একটা উইলোগাছের ডগার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ব্যাপারটা ধরতে পারল আন্তন। প্রায় খাবি খাওয়ার মতো ভঙ্গি করে শুধোল:

'অ্যাঁ? কত বললেন? ছয় শো রুব্‌ল?'

'ঠিক, ঠিক — ছয় শো রুব্‌ল,' বিনীতভাবে জবাব দিল গৃহস্বামী।

রাগ চাপতে না-পেরে আন্তন এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'এমনধারা এট্টা অপদাত্থ ঘোড়ার জন্যি ছ-য় শো রুব্‌ল!'

'নিজিই তুমি অপদাত্থ — ঘোড়ার মস্ত সমঝদার লোক হয়্যেচ তুমি, তা-ই বটে! ঘোড়াডারে আগি পরিক্ষে কর্যে দ্যাখো দিকি একবার — তয় কোয়ো!' ঘোড়ার মালিকও সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠল।

ওকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে কালিনা ইভানভিচ তাড়াতাড়ি বলল, 'না-না, মাদীটারে অপদাত্থ কওয়া চলে না। মাদীটা খুবই ভালো, তয় কিনা এতে আমাগো কাম চলব না।'

আর কিছু না-বলে শুধু নিঃশব্দে মুচকি হাসলেন শেরে। যাই হোক, আমরা সবাই আবার ফিটনে এসে উঠলুম। তারপর চলে এলুম গাড়ি

হাঁকিয়ে। পাঁশুটে নেড়িকুত্তাটা আবার একবার ঘেউঘেউ রবে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাল। কিন্তু তার মালিক বেড়ার আগড় বন্ধ করার পর আর একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না।

সেদিন এই ধরনের ডজনখানেক খামারখোলায় ঘুরলুম আমরা। প্রায় প্রতিটি খামারেই একটা-না-একটা যুতসই ঘোড়ার খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু আমরা আর কেনাকাটার ধার দিয়ে গেলুম না।

বাড়ি ফিরতে সেদিন প্রায় সন্ধে হয়ে এল। ফেরার পথে মনে হল খেতখামার দেখার ব্যাপারে শেরের উৎসাহ যেন কমে গেছে। সারাটা পথ তিনি ভাবনায় ডুবে রইলেন। আর আন্তন তার গায়ের ঝাল মেটাতে 'লালু'কে অনবরত চাবুকের বাড়ি দিতে-দিতে আর গজগজ করতে-করতে চলল:

'তোর মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি? জীবনে কখনও আগাছা দেখিস নাই, বটে? দাঁড়া, মজা টের পাওয়াচ্ছি তোরে!..'

এদিকে রাস্তার ধারের সোমরাজের আগাছাগুলোর দিকে ক্রুদ্ধচোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কালিনা ইভানভিচ সারাটা পথ খালি আপনমনে বিড়বিড় করে চলল:

'কী সব খারাপ লোক এই পরগাছাগুলা -- দ্যাখলা তো! আরে, মানুষে তদের কাছে আইতাছে — তা ঘোড়া বিক্রি না-করবার চাস না-করলি — কিন্তু আচরণটা মানুষির মতন করবি তো! অতিথি বইল্যা কথা! তা না — যতো সব শুয়ারের বাচ্চা! আরে অপদাথ, দ্যাখতাছিস লোকে সক্কাল থেইক্যা ঘোরতাছে, তা কিছু খাইতে তো দিবি তাগো -- ঘরে তো তর বর্শচ্-স্যুপ আছে, নাকি তাও নাই? কিংবা অন্তত কিছু আলুসিদ্ধ দে!.. কান্ডখান দ্যাখো একবার, ব্যাটা নিজির দাড়িগাছ আচড়ানোর সময় পর্যন্ত পায় নাই -- এমন কান্ড দ্যাখছ নি বাপের জন্মে? একটা কিন. হাড্ডিসার বাচ্চা ঘোড়া, তার লেগ্যে চায় কিনা ছয় শত রুবল! আহ্লাদ কত! আবার কয়, ঘোড়ারে সে নাকি 'পালছে'! তা-ই বটে! ঘোড়া পালছে হেই কাঙ্গালগুলা -- দ্যাখছ নি অর খামারে কত জনমুনিষ কাজ করে?'

জনমজুরদের আমিও দেখেছিলুম। আস্তাবল আর শুয়োরের খোঁয়াড়ের ধারেকাছে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নেংটি-পরা একদল লোক। শহুরে এতগুলো লোককে একসঙ্গে আসতে দেখে ভয়ে-ভয়ে, থ' মেরে গিয়ে দূর থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা লক্ষ্য করছিল এই একান্ত

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা। একটামাত্র খামারের উঠোনেই এতগুলো ভব্যসভ্য লোকের এমন একটা তাজ্জব সমন্বয় ঘটতে দেখে, সত্যি বলতে কী, তারা আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। তারপর একসময়ে সেই অবোলা প্রাণীদের একজন একটা ঘোড়াকে আস্তাবল থেকে বের করে এনে লজ্জা-লজ্জা ভঙ্গি করে মালিকের হাতে লাগামগাছ তুলে দিচ্ছিল কিংবা কেউ-কেউ আদর করে ঘোড়ার পাছায় এক-আধটা চাপড়ও মারছিল। এইভাবে তাদের সবচেয়ে আপনজন ওই অবোলা প্রাণীটির প্রতি তারা ভালোবাসা জানাচ্ছিল কিনা কে জানে।

যাই হোক, কালিনা ইভানভিচও অবশেষে বকবকানি বন্ধ করে চুপ মেরে গেল। আর বিরক্তভাবে তামাকের পাইপে টান দিতে লাগল। একমাত্র কলোনির এলাকায় ঢোকার মুখে এসে নৈঃশব্দ্য ভাঙল সে। হঠাৎ খুশিভরা গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'হারামজাদা রক্তশোষাগুলা আমাগো উপাস করাইয়া মারছে!..'

কলোনিতে পেঁছে দেখি লুকা সেমিওনভিচ আর মুসি কার্‌পভিচ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘোড়া কেনার অভিযানে আমাদের এহেন অসাফল্য দেখে লুকা তো তাজ্জবই বনে গেল।

বলল, 'এ হতিই পারে না! ঠিক আছে, আন্তন সেমিওনভিচ আর কালিনা ইভানভিচরে আমিই যখন ঘোড়ার তল্লাস দিছি, তখন আমারেও আপনেদের সাথে ব্যাপারডার ফয়সলা করতি লাগবে। তা, ঘাবড়ায়েন না, কালিনা ইভানভিচ! এতি নাহক আপনের মনমেজাজ নষ্ট হবে, আর মেজাজ নষ্ট হওয়ার মতন খারাপ ব্যাপার মানুষির আর কী হতি পারে কন দেখি! বেশি ঘাবড়ায়ে গেলি আপনেরই ক্ষেতি। তা, ঠিক আছে, আসচে হপ্তায় খালি আপনে আর আমি যাব-নে। আন্তন সেমিওনভিচরে কিন্তু ঘরে থাকতি লাগবে, ওনারে আবার এট্টু বেশি - হিঃ-হিঃ, বলশেভিকের মতন দেখায় কিনা! তাইতি মানুষজনেরা ডরায়, বোঝলেন না!'

পরের রবিবার লুকার গাড়িতে চেপে কালিনা ইভানভিচ আর লুকা সেমিওনভিচ খামারখোলাগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ব্রাত্‌চেঙ্কো সেদিন একধরনের একটা বেপরোয়া ঔদাসীন্যের ভাব নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। রওনা হবার সময় কালিনা ইভানভিচকে কেবল সে দুষ্টুমিভরা ইয়ার্কির ছলে বলল:

'মনে করে সাথে রুটি-টুটি নিয়েছেন তো, নইলে কিন্তু উপাস দিয়ে মরতে হবে!'

ছুটির দিনে পরার এমব্রয়ডারি-করা ব্লাউজের ওপর বিছনো জাঁকালো লাল দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে লুকা সেমিওনভিচ তার লাল ঠোঁট দু'টো হাসিতে ভাঁজ করে বলল:

'কমরেড ব্রাত্‌চেঙ্কো, একথা বলতি পারল্যে কী করে্য? আমরা মানুষজনের সাথে মোলাকাত করতি যেতেছি, তা সাথে করি রুটি নিব ক্যানে? আজ তো আমাদের খাঁটি বর্‌শ্‌চ্‌ আর ভেড়ার মাংস খাতি লাগবে, আর কওয়া যায় না কেউ হয়তো বোতলখানেক ভালোমন্দ কিছু গলায় ঢালতিও দিতি পারে।'

কালিনা ইভানভিচকে গভীর কৌতূহল নিয়ে কথা শুনতে দেখে ও তার দিকে ফিরে একবার চোখ টিপল, তারপর টকটকে লালরঙের কেতাদুরস্ত লাগামগাছখানা তুলে নিল হাতে। জোয়ালকাঠের ধনুকে-জোতা চ্যাটালো ছাতিওয়ালা ওর পুরুষ্টু মদ্দা ঘোড়াটা অতঃপর টগবগিয়ে যাত্রা শুরু করল আর শক্তপোক্ত, ভারি লোহা-বাঁধানো গাড়িখানাকে টেনে নিয়ে চলল অনায়াসে।

সেদিন সন্ধেবেলায়, আগুন লাগার সংকেত শুনলে যেমন হয় তেমনই তড়িঘড়ি কলোনির সকল বাসিন্দা কলোনির সামনে এসে জড় হল। আর সবাই চোখ মেলে দেখল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। দেখা গেল, কালিনা ইভানভিচ ফিরে আসছে বিজয়গর্বে। আর লুকা সেমিওনভিচের মদ্দা ঘোড়াটা গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা, আর জোয়ালের ডাণ্ডা দুখানার মধ্যে জোতা একটা সুন্দর প্রকাণ্ড মাদী ঘোড়া। তার পাঁশুটে রঙের গায়ে চাকা-চাকা গাঢ় রঙের ছোপ। এছাড়া কালিনা ইভানভিচ ও লুকা সেমিওনভিচ দু-জনেরই হাবেভাবে ঘোড়ার মালিকদের ঢালাও অতিথিসেবার পর্যাপ্ত প্রমাণ পরিস্ফুট। কালিনা ইভানভিচ তো গাড়ি থেকে ভালোমতো নামতেই পারছিল না, তবে কলোনির ছেলেরা যাতে তার অবস্থা ধরতে না-পারে তার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছিল। অবশেষে কারাবানভ তাকে ধরে গাড়ি থেকে নামাল।

'কী, অতিথিসেবা হয়েছে তাহলে?'

'নিচ্চয়, হইছে বৈ কি! তা দ্যাখো, কেমন একটা সোন্দর ঘোড়া আনছি আমরা!'

ঘোড়ার বিশাল পাছাটায় হাত দিয়ে চাপড় দিতে লাগল কালিনা ইভানভিচ। সত্যিই ঘোড়াটা দেখতে ভারি চমৎকার ছিল। যেমন তার লোমের ঝালরদেয়া শক্তিশালী পা চারখানা, তেমনই প্রকাণ্ড গঠন; যেমন হারকিউলিস-সদৃশ বুকের ছাতি, তেমনই সুবিন্যস্ত ভারি কাঠামো। এমন কি শেরেও কোনো খুঁত খুঁজে পেলেন না। যদিও বহুক্ষণ ধরে ঘোড়াটার পেটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরতে লাগলেন আর সদয় খুশি-খুশি গলায় থেকে-থেকে 'দেখি পা — ওই পা-খানা দেখি একবার', ইত্যাদি বলতে লাগলেন, তবু।

ঘোড়া কেনার এই ব্যাপারটা ছেলেরা অনুমোদন করল। গম্ভীরভাবে চোখ দু'টো কুঁচকে মাদীটার চারপাশে একচক্কর ঘুরে এল বুরুন। তারপর ঘোষণা করল:

'অবশেষে কলোনিতে এমন একখান ঘোড়া পাওয়া গেল যেটা সত্যিকার ঘোড়া!'

কারাবানভেরও পর্যন্ত ঘোড়াটা পছন্দ হয়ে গেল।

বলল, 'হ্যাঁ, এটা একটা কাজের ঘোড়া বটে। পাঁচ শো রুব্‌ল দাম এর সার্থক। এরকম ডজনখানেক ঘোড়া পেলেই আমাদের ঐশ্বর্যের আর সীমা থাকবে না।'

মাদী ঘোড়াটার ভার নিল ব্রাত্‌চেঙ্কো সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে। জিভ দিয়ে চুঃ-চুঃ আওয়াজ করে নিজের খুশির আভাস দিতে-দিতে ঘোড়াটার চারপাশে একচক্কর ঘুরে এল ও। ঘোড়াটার প্রবল অথচ সংহত শক্তি ও তার শান্তিপ্রিয় পোষমানা প্রকৃতি দেখে ও যেমন খুশি হল তেমনই অবাক হয়ে গেল। ব্রাত্‌চেঙ্কোর চোখের সামনে যেন নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

'এখন আমাদের এট্টা ভালো মদ্দা ঘোড়া দরকার। মদ্দা পেলে আমরা নিজেরাই ঘোড়ার চাষ করতে পারি -- আমি কী বলতে চাই বোঝলেন তো!' এই বলে অনবরত তাগিদ দিতে-দিতে শেরেকে সে জ্বালাতন করে তুলল।

কী বলতে চাইছিল ও শেরে খুব ভালো করেই তা বুঝেছিলেন। 'প্রভাতী'কে (এটাই ছিল মাদী ঘোড়াটার নাম) গম্ভীরভাবে এক-নজর খুঁটিয়ে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন:

'মদ্দা একটা খুঁজে বের করবই। একটা বিশেষ খামারের দিকে আমার নজর আছে। গম রোয়া পর্যন্ত কেবল একটু ধৈর্য ধরে থাক, তারপর আমি সেই খামারটায় ঢুঁ দেব।'

ওই সময়ে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন কলোনিতে কাজ চলছিল একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। শেরের নিখুঁতভাবে ছকে-দেয়া পথ ধরে এগিয়ে চলছিল কাজের চাকা। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট, কোনোটা বড় ছেলেদের নিয়ে, কোনোটা আবার ইচ্ছাকৃতভাবেই শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত ছোটদের নিয়ে তৈরি মিশ্র বাহিনীগুলি নিড়ানি, কাস্তে, মই, ইত্যাদি হাতিয়ারে সেজে কিংবা নিছক ছেলেমেয়েদের জোড়ায়-জোড়ায় হাতকে সম্বল করেই প্রতিদিন মাঠে নামত, আবার ফিরেও আসত এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচির যথাযথতা বজায় রেখে। আর ছেলেমেয়েরা চন্‌মন করত হাসিঠাট্টায়, খুশিতে আর আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে। কী করতে হবে আর কোথায় কীভাবে তা করতে হবে — তার নাড়িনক্ষত্র জানত তারা। মাঝেসাঝে দেখা যেত আমাদের সহকারী কৃষিবিৎ ওলিয়া ভোরনভা মাঠ থেকে হঠাৎ ফিরে এসে অফিসে-রাখা একটা মগ থেকে চুমুক দিয়ে জল খেতে-খেতে সেদিনের ভারপ্রাপ্ত মনিটরকে বলছে:

'মিশ্র পাঁচেরে সাহায্য পাঠাও।'

'কেন? হয়েছে কী?'

'আঁটিবাঁধার কাজটা পিছায়্যে পড়েছে... সাংঘাতিক গরম ওখেনে!'

'কতজন দরকার?'

'পাঁচ জনের মতন। কোনো মেয়ের হাত খালি আছে?'

'একজনের আছে।'

অতঃপর জামার হাতায় ঠোঁট দু'টো মুছে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যেত ওলিয়া। এদিকে মনিটর নোটবই হাতে নিয়ে দৌড়ে যেত নাশপাতি গাছটার নিচে। মিশ্র বাহিনীতে প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত লোক সরবরাহের দপ্তরটি ভোরবেলা থেকেই সেখানে চালু থাকত। আর সেই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত দলপতি তখন কর্তব্যরত বিউগ্‌লবাদককে সঙ্গে নিয়ে মনোরম দুলকি চালে এগিয়ে আসত। তারপর মিনিটখানেকের মধ্যে বিউগ্‌লের সংক্ষিপ্ত কাটা-কাটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত কলোনিময় — ডাক পড়ত সংরক্ষিত অতিরিক্ত বাহিনীর। আর ঝোপঝাড়ের তলা থেকে, নদী থেকে আর শোবার ঘরগুলো থেকে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে আসত খুদে বাচ্চারা। নাশপাতি গাছের নিচে গোল হয়ে দাঁড়াত তারা। আর এর মিনিটখানেক পরে দেখা যেত গুটি পাঁচেক কলোনি-বাসিন্দা দ্রুত কুচকাওয়াজ করে ছুটে চলেছে গমখেতের দিকে।

ইতিমধ্যেই আমরা নতুন চল্লিশটি বাচ্চাকে কলোনিতে ভর্তি করে

নিয়েছিল্ম। বাকি কলোনি-বাসিন্দারা গোটা একটা রবিবার কাটিয়ে দিয়েছিল তাদের দেখাশ্নো, ধোয়া-পাখলা করানো, পোশাক পরানো আর নবাগতদের বিভিন্ন বাহিনীতে ভাগ করে দেয়ার কাজে। বাহিনীর সংখ্যা আর বাড়াল্ম না আমরা, কেবল এগারোটা বাহিনীকে প্রোপ্রি স্থানান্তরিত করল্ম লাল বাড়িতে। তবে প্রতিটা বাহিনীতে নির্দিষ্ট কতগ্লো করে জায়গা খালি রেখে দেয়া হল। এর ফলে নবাগতরা আগেকার সদস্যদের সঙ্গে দ্ঢ়ভাবে য্ক্ত হয়ে যেতে পারল। যদিও তখনও পর্যন্ত এই আগন্তুকরা ঠিকমতো কুচকাওয়াজ করতে পারছিল না, কেবল কারাবানভের ভাষায় হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে চলছিল মাত্র, তব্ এর ফলে তারা যে গোর্কিপন্থী এই সগর্ব চেতনা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল।

নবাগতরা সকলেই ছিল অত্যন্ত অল্পবয়স্ক। তাদের মধ্যে কারো বয়সই তেরো-চোদ্দ বছরের বেশি ছিল না। আর তাদের অনেকেরই ছিল আকর্ষক, আনন্দদায়ক ম্খ। বিশেষ করে স্নান সেরে চক্‌চকে নতুন সাটিনের খাটো প্যান্ট পরে গোলাপি ম্খখানি নিয়ে যখন তারা এসে দাঁড়াত তখন তো বটেই। তখনও পর্যন্ত তাদের অনেকেরই চুল ঠিকমতো ছাঁটা ছিল না, তব্। তবে বেল্খিন আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল:

'আজ ওরা নিজিরাই নিজিদের চুল ছেঁটেছে। বোঝেন তো, এ-ব্যাপারে ওদের হাত ঠিক পাকা নয়... তবে আজ রাত্তিরে চুলছাঁটাইয়ের লোক আসতেছে, আর সে এলিই ওদের ঠিকমতো বানিয়ে ফেলা যাবে-নে।'

প্রথম একদিন কি দ্'দিন এই নতুনতরো সদস্যবাহিনী কলোনির সর্বত্র ঘ্রে বেড়াল তাদের জীবনে আনকোরা নতুন সব অভিজ্ঞতার ধাক্কায় চোখ বড়-বড় করে। শ্য়োরের খোঁয়াড়ও দেখল তারা আর কড়া মেজাজের স্তুপিত্‌সিনের দিকে অবাক হয়ে হাঁ-করে তাকিয়ে রইল।

আস্তন তো নীতিগতভাবেই এই নতুন বাহিনীর সঙ্গে কোনোরকম কাজ-কারবার করতে অস্বীকার করে বসল। বলল:

'তোরা এখেনে করছিসটা কী, শ্নি? তোদের জায়গা তো এখনও খাবার ঘরে।'

'ক্যানে, খাবার ঘরে ক্যানে?'

'তাছাড়া আর কোন কাজের য্গ্যি তোরা, তাই বল্ দেখি? তোরা তো খাওয়ার যন্তর ছাড়া আর কিছ্ না।'

এঃ, কলিই হল্য! আমি বলে কাম করতি যাতিছি!'

'আরে জানি-জানি, কেমন যে কাজ করবি তা ভালোই জানা আছে! তোরে দেখাশোনার জন্যিই জনা দুই ওভারসিয়ার লাগবে। তাই না, সত্যি করে বল্ দেখি?'

'কিন্তু দলপতি বল্যেছেন আসচে পরশু থেক্যেই আমরা কাম শুরু করব্য। তখন দ্যাখবেন-নে!'

'দ্যাখব্য, তাই না? কী মনে করিস, আমি জানি না কিছু? ব্যাপারখান কী রকম হবে জানিস — 'উঃ, বাবারে, কী গরম লাগতোছে! উঃ, কী জলতেষ্টাটাই না পায়্যেছে আমার! উঃ বাবারে! উঃ মারে!..'

শুনে বাচ্চা ছেলেরা অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বলল:

'উঁহু, মা-টা নয়!.. ওসব কিছুটি হবে না, দ্যাখবেন!'

অথচ একেবারে প্রথম দিনটারই শেষে দেখা গেল নতুন ছেলেদের মধ্যে থেকে ব্রাত্‌চেঙ্কো তার গুটিকয়েক সাকরেদ জোগাড় করে ফেলেছে। নিজস্ব পদ্ধতিতেই ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজন অশ্বপ্রেমিকের সন্ধান পেয়ে গেছে সে। আর, কী আশ্চর্য, দেখা গেল চাকালাগানো একটা জলের পিপে মাঠের পথ ধরে গড়গড় করে এগিয়ে চলেছে আর পিপের ওপর নতুন আগন্তুক এক গোর্কিপন্থী পেতিয়া জাদরোজ্‌নি চেপে বসে 'বাজপাখি'কে চালাচ্ছে। ওদিকে আস্তাবলের দরজা থেকে শোনা যাচ্ছে তারস্বর হুকুমজারি:

'এই! ঘোড়ারে কিন্তু বেশি জোরে দাবড়াবি না — মনে রাখিস, জল নিয়ে আগুন নেভাতে যাচ্ছিস না তুই!'

এর একদিন পরেই নবাগতরা মিশ্র বাহিনীর কাজে যোগ দিল। তাদের পক্ষে অপরিচিত এই ধরনের খাটুনির কাজে ভিড়ে গিয়ে থেকে-থেকে হোঁচট খেতে আর হাঁসফাঁস করতে থাকলেও যখন তারা দেখল যে কলোনি-বাসিন্দাদের একটা সারি একবারও লাইন না-ভেঙে একগুঁয়ের মতো আলুখেত বরাবর এগিয়ে চলেছে, তখন তাদেরও মনে হল তারাই-বা কেন লাইন বজায় রেখে এগোতে পারবে না। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটবার পর তারা বুঝতে পারল তাদের দু-জনকে যেখানে আলুখেতের একটা সারি-বরাবর কাজে লাগানো হয়েছে সেখানে পুরনোরা প্রত্যেকে খেতের একেকটা সারির ভার পেয়েছে। আর তারপর প্রচণ্ডভাবে ঘামতে-ঘামতে তাদের কেউ হয়তো পাশের ছেলেটিকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করত:

'কামড়া কখন শেষ হব্যে বলতি পার?'

ইতিমধ্যে গমফসল কেটে ঘরে তোলা হয়ে গিয়েছিল। ঝাড়াই-মাড়াইয়ের চালায় কাজ শুরু হতে যাচ্ছিল তখন। অন্য সকলের মতোই শেরেও ধুলো-ময়লা আর ঘামে মাখামাখি হয়ে ফসলঝাড়াই কলের যন্ত্রপাতি আর ঝাড়াইয়ের জন্যে তৈরি ফসলের আঁটিগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন:

'আসচে পরশু ফসল ঝাড়াই শুরু করব আমরা -- আর আসচে কাল যাব ঘোড়ার সন্ধানে।'

ব্রাত্‌চেঙ্কোর দিকে চোরাচোখে এক-নজর তাকিয়ে সেমিওন বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, 'আম্মো যাব।'

'ঠিক আছে, তাই যা,' আন্তন বলল। 'তা, মন্দাটা বেশ ভালো জাতের হবে তো?'

'না, খারাপ মন্দা নয়,' শেরে জবাব দিলেন।

'তা আপনি কি ওটারে সভ্‌খোজ* থেকে কিনেছেন?'

'হ্যাঁ, সভ্‌খোজ থেকে।'

'কতয় কিনলেন?'

'তিন শো রুব্‌লে।'

'কই, তেমন বেশি তো পড়ে নি!'

'উঁ? হুঁ।'

'অ! তাইলে এটা হইব গিয়া সোভিয়েত ঘোড়া!' কালিনা ইভানভিচ বলল। তারপর ফসলঝাড়াই কলটার দিকে তাকিয়ে শুধোল:

'তা, তুমি কপিকলটারে অত উচা করবারে চাইতাছ ক্যান?'

'হ্যাঁ, সোভিয়েত ঘোড়া,' জবাব দিলেন শেরে। তারপর বললেন, 'কই, বেশি উঁচু তো হয় নি? খড় তো খুবই হালকা।'

অতঃপর রবিবারে সকলেই বিশ্রাম নিল, স্নানটান সারল, নৌকো বাইল আর নবাগতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল সারাদিন। তারপর সন্ধেবেলায় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কলোনির অভিজাত সমাজ বা সেরা ছেলেমেয়েরা প্রধান দালানটার গাড়িবারান্দার নিচে জমায়েত হয়ে 'তুষার-রানী'দের সৌগন্ধ্যে

* সভ্‌খোজ — রাষ্ট্রীয় খামার। — অনুঃ

মাতোয়ারা হতে-হতে নানারকম বিচিত্র গল্পকথা শুনিয়ে নবাগতদের দারুণভাবে তাক লাগিয়ে দিতে লাগল। নবাগতরাও সশ্রদ্ধভাবে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ দেখা গেল ময়দা-কলটার ওধার থেকে মোড় ঘুরে ধুলোর একটা ঘূর্ণিঝড় তুলে দিয়ে এক ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর পথে পুরনো একটা বয়লার পড়ে থাকতে দেখে ঘোড়াটা দারুণ চমকে উঠে পাশে হটে যাবার চেষ্টা করছে। অবশেষে ঘোড়সওয়ার এসে পড়ল, আর একেবারে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল -- সোনালি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেমিওন! আর তাই দেখে হঠাৎ আমরা সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ মেরে গেলুম। এর আগে একমাত্র আঁকা ছবিতেই এমন একটা আজব দৃশ্য দেখেছি -- রূপকথার গল্পের বইতে আর গোগলের 'ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ' নামের বড় গল্পের বইখানায়। ঘোড়াটা সেমিওনকে পিঠে করে নিয়ে এল ভারি অনায়াসে আর জোরালো একটা ভঙ্গিতে, মোটা জমকালো ল্যাজখানা দোলাতে-দোলাতে আর সোনালির আভালাগা ফুরফুরে কেশরটা হাওয়ায় উড়িয়ে। ঘোড়াটা এত জোরে ছুটে এসেছিল যে ঘাবড়ে গিয়ে তার একেবারে নতুন ধরনের ও তাজ্জব বনিয়ে দেয়ার মতো সুলক্ষণগুলো তো গোড়ায় ভালো করে আমাদের ঠাহরই হয় নি। পরে দেখলুম কী তার বলিষ্ঠ ঘাড় আর তেজিয়ান আর মজাদার তার ঘাড় ফেরানোর ধরনই-বা কত রকমের আর সরু-সরু পেশল পা চারখানা লম্বা-লম্বা করে ফেলার কায়দাই-বা কত।

একেবারে আমাদের সামনে পেঁছে ঘোড়ার সুন্দর, সুগঠিত ছোট্ট মাথাটি তার প্রায় বুকের কাছে টেনে এনে লাগাম কষে ঘোড়া রুখল সেমিওন। আর তার কয়লা-কালো, তরুণ, প্রোজ্জ্বল, কোণে-কোণে লালচে আভালাগা চোখ দুটো হঠাৎ হতভম্ব আন্তনের বুকে দৃষ্টির তীর হানল। আর আন্তন তখন যে কী করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না -- কখনও হাত দুটো নিজের কানের কাছে উঠিয়ে তালি দিচ্ছে, কখনও যেন খাবি খাচ্ছে, আবার কখনও-বা আগাগোড়া শিউরে উঠছে :

'এইটা কি আমাদের? সত্যি? মদ্দা ঘোড়া? আমাদেরই?'

'আমাদের!' সগর্বে উত্তর দিল সেমিওন।

হঠাৎ কারাবানভকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল আন্তন, 'আ মলো যা, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামবি তো, না কী! ওইখানেই চেরকাল বসে থাকতে চাস?

ঘোড়ায় চড়ার আশ এখনও মেটে নাই বুঝি? দ্যাখ দেখি. ঘোড়াটার মুখ থেকে ফেনা তুলিয়ে ছেড়েছিস তুই! এ তোর কুলাকের টাট্টুঘোড়া না, বুঝলি!'

ঘোড়ার লাগামখানা চেপে ধরে রাগে চোখে আগুন ছুটিয়ে আন্তন ফের দ্বিতীয়বার তার হুকুম জারি করল।

সুড়সুড় করে এবার ঘোড়ার জিন থেকে নেমে এল সেমিওন।

বলল, 'আরে, ঠিক আছে ইয়ার! বুঝেছি, বুঝেছি। আরে, এর আগে আর কখনও যদি এমন একখান ঘোড়া থেকে থাকে তবে তা ছিল একমাত্তর নাপোলেয়ঁ'র।'

দমকা হাওয়ার মতো একলাফে জিনের ওপর চেপে বসে এবার আন্তন ঘোড়ার গলায় আস্তে-আস্তে চাপড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ কেমন লজ্জা পেয়ে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জামার হাতায় চোখ মুছতে লাগল।

নরম করে হাসতে লাগল ছেলেরা। কালিনা ইভানভিচও হাসল, গলাখাঁকারি দিল, তারপর আবার হাসল।

বলল, 'উঁহু, না-মাইন্যা উপায় নাই। সত্যই এটা চমৎকার ঘোড়া। তয় আমি বলব — আমাগো পক্ষে এইটা কিঞ্চিৎ বেশি ভালো হইয়া পড়ছে। আমরা এইটার দফারফা কইর‍্যা ছাড়ব দ্যাখতাছি।'

ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে তীব্রভাবে আন্তন শুধোল, 'কী বললেন? কে দফারফা করবে?' তারপর ছেলেদের দিকে ফিরে গাঁক্‌গাঁক করে উঠল: 'মেরে ফেলব একবারে! খবরদার, যে এটার গায়ে হাত দেবে তারে একদম মেরে ফেলব! লাঠি নিয়ে তাড়া করব তারে! শাবলের ঘায়ে মাথা ভেঙে ফেলব!'

সজোরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। আর ঘোড়াটাও কেমন যেন হেলেদুলে, আদুরে-আদুরে ভাব করে, ছোট-ছোট পা ফেলে ওকে বয়ে নিয়ে গেল আস্তাবলে। যেন এতক্ষণে সত্যিকার মালিককে জিনের ওপর পেয়ে ও খুশি হয়েছে।

ঘোড়াটার নাম দিলুম আমরা 'মলদিয়েত্‌স'*।

* (রুশ ভাষায়) মলাদিয়েত্‌স — বাহাদুর। — অনুঃ

৮

নবম ও দশম বাহিনীদ্বয়

জুলাই মাসের গোড়ায় বছরে তিন হাজার রুব্‌ল খাজনার বিনিময়ে তিন বছরের মেয়াদে ময়দা-কলটির ইজারা পেয়ে গেলুম আমরা। কোনোরকম অংশীদারি বা ভাগাভাগি ছাড়াই কলটিকে পুরোপুরি আমাদের হেফাজতে ছেড়ে দেয়া হল। ফলে গ্রাম-সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গেল আবার। অবশ্য তখন গ্রাম-সোভিয়েতের দিনও ঘনিয়ে এসেছিল। ময়দা-কলটির দখল পাওয়া ছিল লড়াইয়ের ফ্রন্টের দ্বিতীয় সেক্টরে আমাদের নিজস্ব কম্‌সমোল সংগঠনটিরই জয়ের সূচক।

আমরা নিজেরাই দেখে প্রায় অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম যে কলোনিটা ক্রমশ বেশ চোখে পড়বার মতো বেড়ে উঠছিল এবং একটা দৃঢ়মূল সুনিয়ন্ত্রিত সংস্থার ধরনধারণ আয়ত্ত করে ফেলছিল।

এর অল্প কিছুদিন আগেও একজোড়া ঘোড়া কিনতে গিয়ে আমাদের সঞ্চয়-তহবিলে বেশ টান ধরেছিল। আর এখন, গ্রীষ্মের মাঝামাঝির মধ্যে, ভালো জাতের কয়েকটা গোরু, একপাল ভেড়া আর কিছু নতুন আসবাবপত্র কেনার জন্যে মোটা একটা টাকার বরাদ্দ করতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধেয় পড়তে হল না।

ওদিকে শেরে আমাদের খরচের বরাদ্দে বলতে গেলে প্রায় কিছু ভাগ না-বসিয়েই চুপচাপ নতুন একটা গোশালা তৈরির কাজে নেমে পড়েছিলেন আর ভালো করে সেদিকে নজর দেবার আগেই একদিন দেখা গেল উঠোনের একধারে সুদৃশ্য অথচ শক্তপোক্ত একটা দালান খাড়া হয়ে উঠেছে। আর গোশালা থাকলেই জায়গাটাকে নোংরায় আর দুর্গন্ধে ভরে থাকতে হবে এমন একটা ধারণার মুখে তুড়ি দিয়ে শেরে আবার গোশালাটার সামনে ফুলের একটা বাগানও বসিয়েছিলেন। এই নতুন গোয়ালে জায়গা পেল পাঁচটা সিমেন্‌থাল গোরু আর 'সীজার' নামে একটা ষাঁড়। অল্পবয়সে এই 'সীজার' ছিল আমাদেরই গোয়ালের একটা বাছুর, আর তারপর আমাদের সবাইকে, এমন কি শেরেকেও, তাক লাগিয়ে দিয়ে হঠাৎ সেই বাছুর পরিণত হয়ে উঠল ষাঁড়ে। ষাঁড়টার অসামান্য গুণাবলী দেখে আমাদের তো প্রায় চোখই ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

'সীজার'-এর জন্যে সদ্বংশীয়ের সার্টিফিকেট আদায় করতে শেরেকে অবশ্য প্রচুর ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছিল। তবে তার সিমেন্‌থাল গোত্রের লক্ষণগুলি এতই স্পষ্ট ছিল যে পরিশেষে আমাদের একখানা সার্টিফিকেট না-দিয়ে আর রেহাই ছিল না। 'মলদিয়েত্‌স'ও এইরকম একখানা সার্টিফিকেট পেয়েছিল। আমাদের পশু-খামারের সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অপর এক সদস্য ছিল ভাসিলি ইভানভিচ বা যোল পুদ ওজনের একটা মদ্দা শুয়োর। যে-সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন আগে শুয়োর প্রজন্মের একটা পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বিশুদ্ধ ব্রিটিশ বংশজাত এই শুয়োরছানাটাকে কলোনিতে নিয়ে আসি আমি। ত্রেপ্‌কেদের বুড়োকর্তার নামে শুয়োরটার নামকরণ হয়।

এই ধরনের সব বিশিষ্ট বিদেশীকে নিয়েই মূলত ভালোজাতের পশু-প্রজনন খামার গড়ে তোলার সূচনা ঘটানো আমাদের পক্ষে সহজতর হয়ে উঠল।

আমাদের দশম বাহিনীর অধিরাজ্য, অর্থাৎ শুয়োরের খোঁয়াড়, স্তুপিত্‌সিনের সর্বাধিনায়কত্বে উৎপাদনের প্রাচুর্য এবং বংশলতিকার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার বিচারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারা জেলায় একমাত্র সরকারি শুয়োর প্রজন-সংক্রান্ত পরীক্ষাকেন্দ্রটির পরেই ছিল তার স্থান।

চোদ্দ জনকে নিয়ে গঠিত দশম বাহিনীটি সর্বদাই কাজের পদ্ধতির দিক থেকে ছিল একেবারে আদর্শস্থানীয়। কলোনিতে শুয়োরের খোঁয়াড় ছিল সেই কয়েকটা বিভাগের মধ্যে একটা যাদের সম্বন্ধে কারো মনেই মুহূর্তের জন্যেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাসন্দেহ পোষণের অবকাশ ছিল না। ফাঁপা কন্‌ক্রিটে তৈরি ত্রেপ্‌কে তালুকের অন্তর্ভুক্ত এই চমৎকার দালানটা ছিল আমাদের উঠোনের একেবারে মধ্যিখানটায় তার জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। কিন্তু দালানটা এতই চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে আর মনোরম ছিল যে তার এই বিশেষ অবস্থানকে গোর্কি কলোনির পক্ষে অমর্যাদাসূচক বলে গণ্য করার কথা কোনোদিন কারো মাথায়ই আসে নি।

খুব কম কলোনি-বাসিন্দাকেই খোঁয়াড়ের ভেতর ঢুকতে দেয়া হোত। তবে সফররত দর্শনার্থী দলের সদস্য গণ্য করে নবাগতদের ঢুকতে দেয়া হোত ওখানে। সাধারণত ওখানে ঢুকতে হলে আমার কিংবা শেরের সই-করা একখানা পাস দেখানোর দরকার পড়ত। আর তাই কি কলোনি-বাসিন্দা আর কি

গ্রামবাসী সকলের চোখেই দশম বাহিনীর কাজকর্মের সঙ্গে রহস্যময় কিছু একটা জড়িয়ে আছে বলে ঠেকত, আর ওই সব রহস্যের শুলুকসন্ধান জানতে পারা ছিল বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার।

তবে এই দালানের তথাকথিত 'ওয়েটিং রুম'-এ ঢুকতে পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কারণ তার জন্যে শুধু দশম বাহিনীর দলপতি স্তুপিত্‌সিনের অনুমতির দরকার হোত। এই 'ওয়েটিং রুম'-এ শুধু বিক্রির উদ্দেশ্যে শুয়োরছানাদের রাখা হোত আর গাঁয়ের মাদী শুয়োরদের আনা হোত পাল ধরানোর জন্যে।

পাল ধরানোর দাম ধার্য ছিল তিন রুবল। এই টাকার বিনিময়ে স্তুপিত্‌সিনের সহকারী ও ক্যাশিয়ার অভ্‌চারেঙ্কো একখানা করে রসিদ দিত। এছাড়া 'ওয়েটিং রুম'টায় শুয়োরছানা বিক্রি করা হোত ওজনদরে; প্রতি কিলোগ্রামের দর বেঁধে দিয়েছিলুম আমরা। কৃষকরা অবশ্য আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত যে জ্যান্ত শুয়োর ওজনদরে বিক্রি করার কথা তারা বাপের জন্মে শোনে নি, এর চেয়ে হাসির ব্যাপার আর হয় না।

শুয়োরদের বাচ্চা দেবার সময় এলে 'ওয়েটিং রুম'-এ সর্বদাই লোকের ভিড় লেগে থাকত। কারণ শেরের রেওয়াজ ছিল এককে খেপে জন্মানো ঝাঁকের মধ্যে প্রথমটি আর সবচেয়ে বড়সড় ছানাটি সহ গুটিসাতেকের বেশি শুয়োরছানা না-রাখা, বাকিগুলো প্রায় সমস্তই তিনি শুয়োর-বিলাসীদের মধ্যে বিনি পয়সায় বিলিয়ে দিতেন। সদ্য মা-র দুধ ছেড়েছে এমন সব শুয়োরছানাকে যখন বিলিয়ে দেয়া হোত স্তুপিত্‌সিন তখন প্রাপকদের ওইখানে বসেই জ্ঞাতব্য সবকিছু জানিয়ে দিত। যেমন, রবারের চুষি ব্যবহার করে ছানাগুলোকে কীভাবে দুধ খাওয়াতে হবে, দুধে মাখন জল ইত্যাদির আপেক্ষিক পরিমাণ কীরকম থাকবে, ছানাগুলোকে স্নান করাতে হবে কীভাবে, কখন তাদের শক্ত খাবার দেয়া শুরু করতে হবে, ইত্যাদি। এছাড়া মা-র দুধ ছাড়ে নি এমন সব ছানাপোনা মাঝেমধ্যে অন্য লোককে দেয়া হোত একমাত্র গরিব কৃষকদের কমিটি থেকে বিশেষ প্রয়োজন আছে এইমর্মে সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারলে তবেই। শেরে সর্বদাই আগে থেকে জানতেন শুয়োরদের বাচ্চা দেবার সময় কখন আসছে, আর তাই সাধারণত দেখা যেত খোঁয়াড়ের দরজায় একখানা নোটিশ লটকানো আর তাতে লেখা অমুক-অমুক নাগরিক অমুক দিন শুয়োরছানা নেয়ার জন্যে আসতে পারেন।

শুয়োরছানা মিনিমাগনা বিলি করার এই রেওয়াজের ফলে আমাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ল গোটা জেলায়। আর শিগ্‌গিরই গাঁয়ে-গাঁয়ে বহু বন্ধু জুটে গেল আমাদের। ফলে, আশপাশের সমস্ত গাঁয়েই ব্রিটিশ-বংশীয় ভালো-ভালো মদ্দা আর মাদী শুয়োর বেড়ে উঠতে শুরু করল। ভালো জাতের শুয়োর প্রজননের পক্ষে এগুলো হয়তো তেমন কার্যকর ছিল না, তবে চমৎকার মোটাসোটা হয়ে বেড়ে উঠছিল শুয়োরগুলো।

খোঁয়াড়ে এর পরের বিভাগটি ছিল 'শিশু-পালনাগার'। এটা ছিল সত্যিকার একটা লেবরেটরি। প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা কী হবে তা স্থির করার আগে তাকে এই বিভাগে সবচেয়ে কড়া পর্যবেক্ষণের অধীনে রাখা হোত। শেরের তত্ত্বাবধানে সর্বদাই এই রকম কয়েক শো বাচ্চা থাকত আর বসন্তকালে এদের সংখ্যা যেত বেড়ে। সহজাত গুণসম্পন্ন এই সব বাচ্চার মধ্যে অনেককেই কলোনি-বাসিন্দারা চোখে দেখে চিনতে পারত আর পরম কৌতূহল আর মনোযোগ নিয়ে তাদের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করত। এই সব বাচ্চার মধ্যে যাদের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল তাদের এমন কি আমি, কালিনা ইভানভিচ, দলপতি-পরিষদ এবং কলোনি-বাসিন্দাদের অনেকেই চিনতুম। যেমন, বলা যেতে পারে, একেবারে জন্মের দিনটি থেকেই ভাসিলি ইভানভিচ ও 'মাতিলদা'র পুত্রসন্তানটি আমাদের সকলের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বাচ্চাটা জন্মেছিল হারকিউলিস-সদৃশ চেহারা নিয়ে, আর একেবারে শুরু থেকেই তার দেহে অভিজাত্যের সব কটি প্রয়োজনীয় লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল সে বাপের পদাঙ্কই অনুসরণ করবে। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রত্যাশা বিফল হয় নি। শিগ্‌গিরই তাকে বাপের খোঁয়াড়ের পাশে জায়গা করে দেয়া হল, আর ত্রেপ্‌কেদের ছোটকর্তার নামে তার নাম দেয়া হল পিওত্‌র ভাসিলিয়েভিচ।

শিশু-পালনাগারের পেছনে ছিল খাওয়ানোর খোঁয়াড়। ঘরটা ছিল হরেক রকমের রসিদ আর ওজনের নকশার রাজ্য, এখানে বিরাজ করত বুর্জোয়া জগতের উৎকৃষ্ট সুখশান্তি। মা-র বুকের দুধ ছাড়ানোর পর কিছু-কিছু শিশু যদি দার্শনিক সন্দেহপ্রকাশের লক্ষণ দেখাত কিংবা সরবে নানা দার্শনিক মতামত জাহির করার মতো বাহাদুরির আশ্রয় নিত, তাহলে মাসখানেকের মধ্যে দেখা যেত তারা এই খোঁয়াড়ে খড়ের বিছানায় শান্তভাবে শুয়ে ভালোমানুষের মতো তাদের খাবার হজমে ব্যস্ত আছে। এদের জীবনকথার

পরিসমাপ্তি ঘটত জবরদস্তি খাওয়ানোয়। অবশেষে এমন একটা দিন আসত যখন এদের কাউকে-না-কাউকে তুলে দেয়া হোত কালিনা ইভানভিচের কর্তৃত্বাধীনে, আর তখন সিলান্তি সেই ব্যক্তিবিশেষকে পুরনো বাগানের কাছে ঢালু বালুজমিতে নিয়ে গিয়ে দার্শনিক বিবেকের বিন্দুমাত্র পীড়ন ব্যতিরেকেই তাকে পরিণত করে ফেলত শুয়োরের মাংসে আর আলিওশ্‌কা ভোলকভ ততক্ষণে ভাঁড়ারে একটা পিপে ধুয়েমুছে তৈরি করে রাখত চর্বিটা জমা করে নেবার জন্যে।

শুয়োরশালের শেষ ঘরখানা ছিল মাদী শুয়োরদের খোঁয়াড়। তবে সেখানে একমাত্র প্রধান যাজ্ঞিকদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ফলে গির্জের এই অন্দরমহলের গোপন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানের সবকিছু আমার নিজেরই জানা ছিল না।

শুয়োরশাল থেকে আমাদের আয় হচ্ছিল ভালোই। অত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যে একটা লাভের কারবার ফেঁদে বসব তা কোনোদিনই ভাবি নি। একেবারে পুঙখানুপুঙখভাবে নিয়ন্ত্রিত শেরের ফসল ফলানোর পদ্ধতির ফলে আমাদের পশুখাদ্যের সঞ্চয় বিপুল হয়ে দাঁড়াল — বীট, কুমড়ো, ভুট্টা, আলু, কত কী যে জমে গেল তার ঠিক নেই। হেমন্তকালে আমাদের যা করতে হল তা হচ্ছে এই বিপুল পশুখাদ্য ঠিকমতো গোলাজাত করা।

ময়দা-কলটার দখল পাওয়ায় আমাদের সামনে যেন বিশাল দিগন্ত খুলে গেল। ফসল ভাঙাই বাবদ আদায় (পুদ পিছু চার পাউন্ড ময়দা) ছাড়াও ময়দা-কল থেকে গোরুঘোড়ার পক্ষে যা সবচেয়ে মূল্যবান জাবনা সেই তুষ পেতে লাগলুম।

ময়দা-কলের মালিকানা অপর একটা ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। এর ফলে চারপাশের কৃষক-সমাজের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা গেল নতুনভাবে বেড়ে, আর আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সামগ্রিক একটি নীতি নিয়ে চলতে সমর্থ হলুম। ময়দা-কলটা হয়ে উঠল কলোনির 'পররাষ্ট্র দপ্তর'। সেকালের নিয়ত-পরিবর্তনশীল কৃষক-সংক্রান্ত পরিস্থিতির জটিল জালে নিজেদের জড়িয়ে না-ফেলে আমাদের পক্ষে একটিমাত্র পদক্ষেপ নেয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি ধাপেই ছিল তখন একটি করে গরিব কৃষকদের কমিটি, আর এই কমিটির প্রায় সব ক'টিই ছিল সক্রিয় ও সুশৃঙখল। এছাড়া ছিল মাঝারি কৃষকদল, কড়াই-এর প্রত্যেকটি শুঁটির মতোই গোলালো আর

দৃঢ়-সংবদ্ধ, আবার কড়াইশুঁটির মতোই প্রত্যেকে তার নিজস্ব খোলসে বন্দী আর বিচ্ছিন্ন। সবশেষে ছিল 'কর্তাবাবুরা' বা কুলাকরাও — নিজেদের সুরক্ষিত আশ্রয়ের অন্তরালে ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠে, হিংস্র হয়ে উঠে বুকের মধ্যে জমা আক্রোশ আর তিক্ত স্মৃতির খোঁচায়।

ময়দা-কলটাকে দখলে এনে গোড়া থেকেই জাহির করে দিলুম যে প্রধানত যৌথ সংগঠনগুলোর সঙ্গেই আমরা কাজ-কারবার চালাতে ইচ্ছুক আর সব ব্যাপারে তাদের অগ্রাধিকার থাকবে। আগে থেকে এই সব যৌথ সংস্থার একটা ফর্দ তৈরি করতে চাইলুম আমরা। গরিব কৃষকরা সহজেই এই ধরনের সব সংস্থা তৈরি করে ফেলল, কারবারের কাজে সময়মাফিক আসতে শুরু করল, সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের পুরোপুরি মেনে চলল সবাই এবং দেনা-পাওনার ব্যাপারটাও মিটিয়ে দিতে লাগল দ্রুত আর বিনা বাক্যব্যয়ে। ফলে ময়দা-কলের কাজ চলতে লাগল বিনা ঝামেলায়। ওদিকে 'কর্তাবাবুরা'ও দৃঢ়বদ্ধ ছোট-ছোট যৌথ সংগঠন গড়ে তুলল, তবে সেগুলো তৈরি হল পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে। তদুপরি এই সব সংগঠনের ব্যাপারে টুঁ-শব্দটিও বাইরে প্রকাশ করল না তারা। ফলে তাদের মধ্যে কারা যে মোড়ল আর কারা নয় তা বোঝা পর্যন্ত প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

তবে মাঝারি কৃষকরা যখন ময়দা-কলে আসত কলোনির ছেলেদের কাজটা তখন কঠিন শারীরিক শ্রমের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। এই কৃষকরা কখনও দল বেঁধে আসত না, একজন-আধজন করে সারাদিন ধরে আসতে থাকত তারা। তাদের সমিতিগুলোর প্রতিনিধি থাকত বটে, তবে সেই প্রতিনিধি বাঁধা নিয়মে আগে এসে তার নিজস্ব ফসল দিত তারপর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি চলে যেত। আর পেছনে যারা থেকে যেত তারা জটলা পাকিয়ে নানা ধরনের সব সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কথা তুলে উত্তেজিত হয়ে উঠত। ওখানে কাজের মধ্যে কোথাও যে ন্যায্যতার অভাব আছে এ-বিষয়ে অস্পষ্ট একটা ধারণা হোত তাদের। দূরের পথ হেঁটে আসাটাকে একটা অজুহাত করে আমাদের ময়দা-কলের এই সব খরিদদার প্রচুর পরিমাণে সামগোন খেয়ে তাদের তেষ্টা মেটাত, আর তারপর ওইখানেই তাদের যতকিছু পারিবারিক বাদ-বিসংবাদের ফয়সলা করার প্রবল বাসনা চরিতার্থের প্রয়াস পেত। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী তর্কাতর্কি আর বেশ কিছু পরিমাণে হাতাহাতি করে কলোনির ছেলেদের

রীতিমতো নাজেহাল করে তোলার পর দুপুরের খাওয়ার সময় লাগাদ এই খরিদদারদের অনেকেই একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে রুগী বনে যেত। ময়দা-কলের কাজের ভার ছিল যে-নবম বাহিনীর ওপর তার দলপতি অসাদ্‌চি একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে হেস্তনেস্ত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই আমাদের মেঠো হাসপাতালটাতে আসত। এসে বলত:

'আচ্ছা, ওরে ব্যান্ডেজ বাঁধতেছেন কেন বলেন কো? ব্যান্ডেজ বাঁধলিই ও ভালো হয়ে যাবে নাকি মনে করেন? ওরা হল গিয়ে মুজিক — আপনি ওদের চেনেন না! যতই চিকিৎসা করেন ততই ওরা একে অপরের গলা কাট্যে চলবে। ওদের বরং আমাদের হাতে তুলি দেন — আপনার হয়ি আমরাই ওদের ব্যারাম ভালো করে দেব-নে! ময়দা-কলে যে কী কাণ্ড হতেছে-না, আপনার একবার এস্যে দেখা উচিত!'

এ-প্রসঙ্গে সত্যি কথাটা স্বীকার না-করে পারছি না যে আমাদের নবম বাহিনী আর ময়দা-কলের ম্যানেজার দেনিস কুদ্‌লাতি উভয়েই জানত কী করে ঝগড়াটেদের রোগ সারাতে হয় আর তাদের মাথা ঠান্ডা করতে হয়। কালক্রমে এ-ব্যাপারে তারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে, তাদের চিকিৎসা যে অভ্রান্ত সে-খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

দুপুরের খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছেলেরা ঢেঁকি-কলটার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকত। আর তাদের চারদিকে উত্তাল হয়ে উঠত অশ্লীল নোংরামির মত্ত সমুদ্র, যত্রতত্র মুখ থেকে ভকভক-করে-বেরনো সামগোনের দুর্গন্ধ, তুমুল হাত-নাড়ানাড়ি, পরস্পরের বস্তা ধরে টানাটানি-কাড়াকাড়ি, কার পালা আগে তাই নিয়ে অন্তহীন হিসেবনিকেশ আর অন্যান্য হিসেব আর ভাবনাচিন্তার সঙ্গে তা অনবরত গুলিয়ে ফেলা, ইত্যাদি। এসব যখন ছেলেদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন অসাদ্‌চি ময়দা-কলের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করত। নবম বাহিনীর সদস্যরা তখন সবচেয়ে মাতাল আর হট্টগোলকারী জনা তিন-চারকে হঠাৎ গিয়ে পাকড়ে ধরত তারপর দুই বগলের নিচে হাত গলিয়ে চেপে ধরে তাদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত কলমাকের ধারে। সেখানে গিয়ে একেবারে তুখোড় কাজের লোকের মতো কলোনি-বাসিন্দারা তাদের বন্দীদের মিষ্টি করে বুঝিয়েসুঝিয়ে নদীর পাড়ের ওপর বসে পড়তে বাধ্য করত, আর প্রশংসনীয় নিপুণতার সঙ্গে চট্‌পট তাদের মাথায়

দশ-বারো বালতি জল দিত ঢেলে। ব্যাপারটা কী যে ঘটছে তা ঠিক বুঝে উঠতে না-পেরে চাষীদের মধ্যে কেউ হয়তো গোড়ার দিকে তখনও একগুঁয়ের মতো তার আগের ঝগড়াঝাঁটির জের টেনে চলত। আর অসাদ্‌চি তার রোদে-পোড়া পা দুখানা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাত দু'টো খাটো প্যান্টের দুই পকেটে পুরে মনোযোগ দিয়ে বকবকানি শুনত মাতালের, তার প্রতিটি ধরনধারণ লক্ষ্য করত নিরুত্তাপ দুই ক'টা চোখ মেলে।

কখনও সে হয়তো বলত, 'লোকটা আরও তিনবার 'বেজম্মা' কয়েছে -- ঢাল্ ওর মাথায় আরও তিন বালতি জল।'

আর সজোরে হাত ঝাঁকিয়ে তৎপর লাপত সেই প্রয়োজনীয় জলটুকু সরবরাহ করত অবিলম্বে। তারপর ডাক্তারের মতো লোক-দেখানো গাম্ভীর্য নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে রুগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

অবশেষে একসময় নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে রুগীরা চোখ রগড়ে ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাত। কেউ হয়তো মাথা ঝাঁকিয়ে বলত:

'কে তমাদেরে এ-অধিকার দেছে, শুনি? অ্যাই! তমারে কইতেছি!..'

আর এটা শুনেই শান্তভাবে অসাদ্‌চি হুকুম দিত:

'লাগা আরেক ডোজ।'

সঙ্গে সঙ্গে মিঠে সুরে বলে উঠত লাপত, 'দেলাম আরেক ডোজ H_2O'। আর এমন সতর্ক সাবধানতার সঙ্গে রুগীর মাথায় আরেক বালতি জল ঢালত যেন ভারি দামি কোনো ওষুধের শেষ মাত্রাটা খেতে দিচ্ছে তাকে। তারপর রুগীর জলেভেজা বুকখানার ওপর ঝুঁকে পড়ে আগের মতোই মোলায়েম উদ্বেগ প্রকাশ করে হুকুমজারি করত:

'দম বন্ধ করে রাখেন... জোরে নিশ্বেস নেন এবার.. আবার দম বন্ধ করেন...'

আর সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে গিয়ে রুগীটি একেবারে মেষশাবকটির মতো লাপতের হুকুমে কখনও একদম নিথর হয়ে থাকত আবার কখনও শ্বাস টেনে পেট ফুলিয়ে তুলত আর হেঁচকি তুলতে থাকত। আর চারিদিকে হাসির ধুম পড়ে যেত একেবারে। যেন এতক্ষণে স্বস্তি পেয়েছে এমন ভাব করে লাপত তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠত। বলত:

'অবস্থা সন্তোষজনক. নাড়ির গতি ৩৭০. টেম্পারেচার ১৫।'

এ-সমস্ত ক্ষেত্রে না-হেসে কী করে মুখ গম্ভীর করে রাখতে হয় লাপত তা জানত এবং সমস্ত কাজকর্ম ও কথাবার্তা চালাত একেবারে ধরাবাঁধা বৈজ্ঞানিক

রীতি অনুযায়ী। কিন্তু খালি বালতি-হাতে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলের দল এই সব কান্ডকারখানা দেখে হাসি চাপতে পারত না। তাদের হো-হো হাসির সঙ্গে যোগ দিত খাড়াই পাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে-থাকা কৌতূহলী সহানুভূতিপ্রবণ গ্রামবাসী দর্শকরাও। আর তখন লাপত করত কী, এই গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করত:

'এখন কে আসতেছেন? এর পর কার জল-চিকিৎসার পালা?'

আর কথা তো নয় যেন মধু ঝরছে এমন একখানা ভাব করে গ্রামবাসীরা হাঁ করে তার প্রত্যেকটা কথা গিলত, আর প্রতিটা কথা বলার আধ-মিনিট আগে থেকেই হাসতে শুরু করে দিত।

তখন অসাদ্‌চিকে বলত লাপত, 'কমরেড প্রোফেসার, আর রুগী নাই।'

শুনে অসাদ্‌চি হুকুম দিত, 'যে-সব রুগীর রোগ ভালো হয়ে গেছে তাদেরে গা মোছানো হোক।'

ইতিমধ্যে রুগীদের সত্যিই হুঁশ ফিরত। নবম বাহিনীর ছেলেরা তখন সোৎসাহে তাদের মাটিতে শুইয়ে ফেলে আর চিৎ-উপুড় করিয়ে রোদ্দুরে সেঁকতে বসত। আর হয়তো দেখা যেত রুগীদের একজন এতক্ষণে রীতিমতো স্বাভাবিক গলায় হাসিমুখে অনুনয়-বিনয় করে বলছে:

'যথেষ্ট হয়েছে!.. আমি নিজিই এবার গা মোছতি পারব্য!.. এখন বেশ সুস্থ হয়ি গেছি।'

একমাত্র তখনই, এ-কথা শোনার পর, খুশি হয়ে হাসত লাপত। তারপর খোলামেলা গলায় হেঁকে বলত:

'এই যে, একজন সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওনারে ছেড়ে দেয়া যেতি পারে!'

অন্যেরা কিন্তু তখনও ধস্তাধস্তি করতে থাকত, এমন কি তাদের সেই পুরনো গালিগালাজের জের টানার চেষ্টা করত এইভাবে: 'আ মলো যা...' ইত্যাদি। তবে অসাদ্‌চি সংক্ষেপে সেই জলভরা বালতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় তাদের অপ্রকৃতিস্থতা যেত সম্পূর্ণ দূর হয়ে। তারা তখন কাকুতিমিনতি জুড়ে দিত:

'না-না, আর দরকার নাই! সত্যি বলত্যেছি, দিব্যি গালা আমার অভ্যেস হয়ি গেছে — মুখ ফস্‌কিয়ে কেমন বার হয়ি পড়ে!..'

এদের রোগের গতিক যেন সবচেয়ে খারাপ এমন ভাব করে লাপত তখন এই সব রুগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা শুরু করে দিত। আর কলোনি-বাসিন্দা

আর গ্রামবাসীদের হো-হো হাসি সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন। তবে লাপতের লাগসই কথার মনিমুক্তো বর্ষণ পাছে কান এড়িয়ে যায় সেই ভয়ে থেকে-থেকে হাসিতে ছেদও টানত তারা।

এদিকে লাপত তখন বলে চলেছে, 'কী কলেন, অভ্যেস? তা, অনেকদিনির অভ্যেস নাকি?'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠে রুগীটি ঘাবড়ে গিয়ে বলত, 'কী যে কও তুমি! ভগমান রক্ষে করেন আমারে!' তবে এর চেয়ে আর কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না, কারণ নদীর পাড়ের নবম বাহিনী তখনও পর্যন্ত যে হাত থেকে বালতি নামিয়ে রাখে নি তা তার চোখ এড়াত না।

'তাইলে বলত্যেছেন, বেশিদিনির অভ্যেস না? তা, আপনের বাপ-মায়েরও দিব্যি গালা রোগ আছে নাকি?'

'নিচ্চয়, আছে বৈকি,' বোকার মতো হেসে রুগীটি বলত।

'আর ঠাকুন্দার?'

'ঠাকুন্দারও ছেল...'

'আর আপনের খুড়ার?'

'নিচ্চয় আছে...'

'আর আপনের ঠাকুরমার?'

'নিচ্চয়, তাঁরও... এ-হে-হে, ভগমান রক্ষে করেন! আমার ঠাকুরমায়ের যতদূর জানি, কই তাঁর তো ছেল না...'

রুগীর ঠাকুরমা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন শুনে দর্শকরা সবাই আর লাপত স্ফূর্তিতে হৈ-হৈ করে উঠত।

জলে টুপটুপে-ভেজা রুগীটিকে জড়িয়ে ধরে এবার লাপত বলত:

'এ ভাব কেটে যাবে-নে! আমি বলতেছি, এ ভাব আপনের কেটে যাবে-নে! তবে আরও ঘনঘন আমাদের সাথে দেখা করতি আসেন যেন, বোঝলেন। জানেন তো আমরা মিনিমাগনা চিকিচ্ছে করে থাকি।'

শুনে কি বন্ধু কি শত্রু সকলের সঙ্গে রুগীও হাসতে-হাসতে অস্থির হয়ে পড়ত। এদিকে অসাদ্‌চি ততক্ষণে গিয়ে ময়দা-কলের দরজার তালা খুলতে লেগে যেত আর সেদিকে তাকিয়ে লাপত গম্ভীরভাবে বলে চলত:

'যদি চান তাইলে আমরা আপনের ঘরে গিয়িও চিকিচ্ছে করতি পারি। এমনিই, মিনিমাগনায়। তবে তার জন্যি হপ্তা দুই আগে আপনারে দরখাস্ত

দিতি লাগবে আর প্রোফেসারের জন্যি ঘোড়াও পাঠাতি লাগবে। এবাদে বালতি আর জলের যোগান তো দিতি লাগবেই। আমি আপনের বাপের, আর চাই কি মায়েরও চিকিচ্ছে করব।'

এর জবাবে এক মুহূর্তের জন্যে হাসি থামিয়ে অপর কেউ হয়তো বলত, 'অর মায়ের তো অমন অসুখ আছে বলি শুনি নাই।'

'কিছু মনে করবেন না -- আমি আপনের বাপ-মায়ের অসুখের কথা শুধোলি আপনি বলেছিলেন, 'নিচ্চয়, আছে বৈকি'।'

'আমি? মোট্টেও না!' সুস্থ-হয়ে-ওঠা রুগীটি অবাক হয়ে কথাটা অস্বীকার করে বসত এবার।

আর গ্রামবাসীরা আনন্দে হৈচৈ করে উঠত।

'হা-হা-হা!.. দ্যাখো একবার কান্ডখান!.. নিজির মায়ের বদনাম রটাচ্ছে লোকডা!..'

'কেডা! লোকডা কেডা?'

'কেডা আবার?.. ইয়াভ্‌তুখডা!.. ওই-যে যার ব্যামো হয়্যেছে!.. উঃ, মর্যে যাব আমি! সত্যি, মর্যে যাব! উঃ, শোরের বাচ্চা কোথাকার! আর ওই ছোঁড়াডার কান্ড দ্যাখো -- একবারের তরেও হাসল না ছোঁড়াডা... একবারে ঘুঘু ডাক্তার!..'

অতঃপর লাপত যেন বিজয়ী বীর এমন ভাব করে তাকে কাঁধে তুলে ময়দা-কলে নিয়ে আসত সবাই আর এঞ্জিন-ঘরে কাজ চালু করার হুকুম দেয়া হোত। যে-আবহাওয়ায় কাজ চলত এরপর তা হোত আগের একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। কুদ্‌লাতির সব নির্দেশই অতঃপর খরিদ্দারেরা বলা যায় অতিরিক্ত উৎসাহভরে পালন করে চলত, বিনা প্রতিবাদে প্রত্যেকে নিজের-নিজের পালা আসার অপেক্ষায় থাকত। আর লাপতের মুখের প্রত্যেকটি কথা গোগ্রাসে গিলত সবাই। বাস্তবিক, লাপতের ভাষার আর অন্যকে নকল করার ক্ষমতার ভাঁড়ার ছিল অফুরন্ত। এইভাবে সন্ধের মধ্যে গম-পেষাইয়ের পালা চুকত। ফেরার জন্যে ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হওয়ার আগে গ্রামবাসীরা সস্নেহে কলোনি-বাসিন্দাদের করমর্দন করত। সারা দিনে যত মজার খোরাক পেয়েছে যাবার সময়ে সোল্লাসে সেই সব স্মৃতির রোমন্থন করত তারা।

'ওহ্, লোকডা কয়্যেল কিনা অর ঠাকুরমা পর্যন্ত!.. আর ছেল্যাডা যা একখান

চিজ্ না! আমাদের প্রেতিডি গেরামে অমন এট্টা করো্য ছেল্যা যদি থাকত্য তাইলি কেউ গির্জায় যাওয়ার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতি পারত্য না।'

আবার কেউ হয়তো হঠাৎ হেঁকে বলত, 'হেই, কার্পো! কী, এখন শরীলডা বেশ শুকনা হয়েছে তো? আর মাথার অবস্তাডা কীরকম? ঘোর কাট্যে গেছে তো? অ্যাঁ, তর ঠাকুরমা পর্যন্ত? হা-হা-হা!..'

ময়দার বস্তাগুলো গাড়িতে তুলতে-তুলতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘন দাড়ির মধ্যে হাসত কার্পো।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, 'কথাডা এর আগি আর কখনও মাথায়ই আসে নাই। তয় কিনা ওই - হাসপাতালি ছেলাম তো!..'

'তা কই, দিব্যি গাল্যে কতিছিস না-যে! নাকি, দিব্যি গালতি ভুল্যে গেছিস?'

'আরে না-না, এখন ও দিব্যি গালব্যে না! হয়তো স্তরজেভোয়ে পার হয়ি যাবার পর ঘোড়াডারে গাল পাড়তি শুরু করব্যো!'

'হা-হা-হা-হা!'

জল-চিকিৎসার ব্যাপারে নবম বাহিনীর খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। আমাদের খরিদ্দাররা থেকে-থেকেই এই চমৎকার প্রতিষেধক ব্যবস্থাটার কথা স্মরণ করত আর লাপতের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জোরালো আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত। শুনে লাপত গম্ভীরভাবে, বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলত:

'আমি তো প্রধান সহকারী মাত্তর। ও-ই হল গে আসল প্রোফেসার - কমরেড অসাদ্চি।'

আগন্তুকদের দিকে অসাদ্চি কিন্তু তাকিয়ে থাকত নিরুত্তাপ চোখে। অতঃপর আগন্তুকরা লাপতের আদুড় কাঁধে সাবধানে চাপড় দিয়ে বলত:

'এঃ, বললিই হল্য, সহকারী! এখন যদি গাঁয়ে কেউ গালিগালাজ শুরু করো্য দেয় তো তারে বলা হয়: কী, তমার জন্যি কলোনি থেক্যে জল-চিকিচ্ছের ডাক্তার ডাকা লাগব্যে নাকি? জানো তো, ও আমাদের ঘরে-ঘরে এসিও চিকিচ্ছে করতি রাজি!..'

ময়দা-কলেও শিগ্গিরই আমাদের মনোমতো আবহাওয়া গড়ে তুলতে সমর্থ হলুম। ওখানকার কাজকর্মও হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, হাসিখুশিতে ভরা, [illegible] সেখানে জাঁকিয়ে বসল শৃঙখলা। প্রতিষ্ঠানের কঠোর বিধিবিধানের ব্যত্যয় ঘটাত যে উপযুক্ত বিচার-বিবেচনাসহ তাকে নিজের

শাসনের অধীন করতে ও তার অধিকারের সীমা সমঝে দিতে সদাই প্রস্তুত থাকল সে।

জুলাই মাসে গ্রাম-সোভিয়েতের পুনর্নির্বাচন সংগঠিত করলুম আমরা। লুকা সেমিওনভিচ ও তার বন্ধুরা বিনা লড়াইয়েই তাদের অধিকৃত পদগুলো ছেড়ে দিল। পরিবর্তে পাভেল পাভ্লভিচ নিকলায়েংকো নির্বাচিত হল চেয়ারম্যান আর কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে দেনিস কুদ্লাতি নির্বাচিত হল গ্রাম-সোভিয়েতের সদস্য।

৯

চতুর্থ মিশ্র বাহিনী

বুরুনের অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত চতুর্থ মিশ্র বাহিনী জুলাইয়ের শেষ থেকে কাজ শুরু করল। বুরুন ছিল এই চতুর্থ মিশ্রের সর্বস্বীকৃত দলপতি। কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে অপর কেউ এই কঠিন অথচ সম্মানজনক পদের দাবিদার ছিল না।

চতুর্থ মিশ্র বাহিনী কাজ করত ভোরের আলো ফোটা থেকে শুরু করে সন্ধে পর্যন্ত। বাহিনীর ছেলেরা প্রায়ই বলত যে তারা বিউগ্লের 'সংকেত ছাড়াই' কাজ করে থাকে। সত্যিই এই বাহিনীর সদস্যদের কাজে যাওয়া কিংবা কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার সময় বিউগ্লের কোনোরকম সংকেতধ্বনি জানানো হোত না। বুরুনের চতুর্থ মিশ্র ওই সময়ে কাজ করছিল ফসল ঝাড়াই-মাড়াইয়ের গোলায়।

ঘুম ভাঙানোর সংকেত বাজানো আর জলখাবারের পালা চোকার পরে ভোর ঠিক চারটের সময়ে চতুর্থ মিশ্র শ্বেত প্রাসাদে ঢোকার সদর দরজার সামনে ফুলের বাগান-বরাবর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যেত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই দাঁড়াতেন কলোনি-বাসিন্দাদের সারির ডানদিকে। একমাত্র দু-জন যাঁরা ওই বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকতেন তাঁরা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাকি সবাইকে যে চতুর্থ মিশ্রের কাজে যোগ দিতে হোত তা নয়, তবে বহুদিন থেকে চতুর্থ মিশ্র বাহিনীতে কাজ করা কলোনিতে একটা বিশেষ ভব্যতা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল। ফলে আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন একজন ব্যক্তিও এই সংগঠনটির

নির্দেশনামা থেকে বাদ পড়তে রাজি ছিলেন না। যাই হোক, কলোনি-বাসিন্দাদের সারির ডানদিকে যাঁরা দাঁড়াতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন শেরে, কালিনা ইভানভিচ, সিলান্তি অত্‌চেনাশ, অক্‌সানা, রাখিল, আমাদের ধোপাখানার দুই মেয়ে-কর্মী, সেক্রেটারি স্পিরিদোন, ময়দা-কলের প্রধান রোলারচালক (যে-সময়ের কথা বলছি ওই সময়টায় সে ছিল ছুটিতে), গাড়ির চাকা-তৈরির শিক্ষক কোজির, আমাদের বাগানের লালচুলো গোমড়ামুখো মালী মিজিয়াক ও তার স্ত্রী সুন্দরী নাদিয়েন্‌কা, জুর্‌বিনের স্ত্রী এবং অপর কয়েকজন। এই শেষোক্তদের সকলকে আমিই ভালো করে চিনতুম না।

এছাড়া চতুর্থ মিশ্রের কলোনি-বাসিন্দাদের সারিতে এসে ভিড়ে যেত বহু স্বেচ্ছাব্রতীও। নবম ও দশম বাহিনীর যে-সমস্ত সদস্যের ওই সময়টায় কোনো কাজ থাকত না তারা এবং আস্তাবল-কর্মীদের দ্বিতীয় বাহিনী ও গোশালা-কর্মীদের তৃতীয় বাহিনীর কিছু-কিছু ওই ধরনের সদস্য সবাই এসে ভিড়ে যেত এই দলে।

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না বোকভা যদিও ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার কষ্টস্বীকার করতেন এবং পুরনো সুতীকাপড়ের একখানা লম্বা গাউন গায়ে চড়িয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়ে যেতেন, তবু একদিন দেখা গেল একমাত্র তিনিই ওই লাইনে এসে দাঁড়ান নি, গাড়িবারান্দার নিচে বসে বুরুনের সঙ্গে গল্প করছেন। ওই সময়ের কিছু আগে থেকেই মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না চা কিংবা আইসক্রিম খেতে আমাকে আর নেমন্তন্ন করছিলেন না। তবে অন্য সকলের সঙ্গে যেমন আমার সঙ্গেও তেমনই একই রকম ভালো ব্যবহার বজায় রেখেছিলেন। ফলে তাঁর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষোভ ছিল না, বরং আগের চেয়ে আরও ভালোই লাগছিল তাঁকে। চোখ দুটো তাঁর দিনে-দিনে আরও গম্ভীর, আরও কঠোর হয়ে উঠেছিল, আর রসিকতাগুলো হয়ে উঠেছিল আগের চেয়ে আরও বিদ্বেষশূন্য। ওই সময়ের মধ্যে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না কলোনির বাচ্চাদের আর মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, সিলান্তির সঙ্গে আপস করে নিয়েছিলেন এবং আমাদের কিছু-কিছু অপেক্ষাকৃত গোলমেলে চরিত্রের ছেলেমেয়েদেরও বুঝতে শুরু করেছিলেন। ভারি মিষ্টি স্বভাব আর আনন্দদায়ক চরিত্রের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নাকে সেদিন এ-ব্যাপারে রেহাই দিলুম না আমি, কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস করে বললুম:

'মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না, যান, গিয়ে লাইনে দাঁড়ান। কর্মীদের লাইনে আপনাকে পেলে ওরা সবাই ভারি খুশি হবে।'

ভোরের আলোর আভার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি, তারপর রোদ্দুরে-ঝলমলে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল গোলাপি আঙুল তুলে মাথায় আটকে নিয়ে গভীর গমগমে গলায় একটু যেন শুকনোভাবে জবাব দিলেন:

'ধন্যবাদ। তা, আজ আমাকে কী করতে হবে -- ফসল-পেটাই, তাই না?'

'পেটাই না, মাড়াই,' বুরুন বলল। 'কত দানা বার হল তার হিসাবটা লেখবেন আপনি।'

'কিন্তু কাজটা কি আমি ঠিকমতো করতে পারব?'

'কেমন করে করতি হয় আমি দেখাব-নে।'

'তোমরা নিশ্চয় আমাকে খুব সহজ কাজ দিয়েছ, তাই না?'

শুনে বুরুন হাসল। বলল:

'আমাদের সব কাজ একই রকম। তা, সন্ধ্যাবেলা চতুর্থ মিশ্র যখন রাতের খাওয়া খেতি বসবে তখন কাজটা কেমন লাগল বলবেন -- আমরা শোনব।'

'আহা! কী মিষ্টি শোনাচ্ছে কথাটা। কাজের শেষে সন্ধেবেলায় রাতের খানা!..'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নার ভাবাবেগটা ঠিকই ঠাহর হয়েছিল আমার, তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাসি লুকোলুম। ইতিমধ্যেই মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না গিয়ে লাইনের ডানদিকে দাঁড়িয়েছিলেন আর কী একটা কথায় যেন সুর তুলে হাসছিলেন। আর তাঁর অনুরক্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আদবকায়দাদুরস্ত কালিনা ইভানভিচও তাঁর হাতে চাপ দিয়ে হাসিতে যোগ দিচ্ছিল।

হালকা চালে ড্রাম বাজাতে-বাজাতে এই সময়ে একদল বাজনদার ছুটে এল, তারপর তারাও দাঁড়িয়ে গেল লাইনের ডানদিকে। বাচ্চাসুলভ নমনীয় দেহগুলো অল্প-একটু দোলাতে-দোলাতে চারজন বিউগ্‌ল-বাদকও এসে পড়ল, তারপর বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কলোনি-বাসিন্দারাও সবাই টানটান খাড়া হয়ে দাঁড়াল, খুব গম্ভীর হয়ে গেল সবাই।

'পতাকার দিকে তাকাও! অ্যাটেন্‌শন!'

আস্তিনছাড়া রোগা-রোগা খালি হাতগুলো লাফিয়ে উঠল লাইন-বরাবর — পতাকাকে অভিবাদন জানানো হল। হাতে লাল কাপড়ের পট্টি-লাগানো পোশাকী জামাকাপড়-পরা কলোনির ওইদিনের মনিটর নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়া

ড্রামের গ্রগ্র আওয়াজ আর বিউগ্লের র্পোলি স্রস্রোতের মধ্যে রেশমী গোর্কি-পতাকাটিকে লাইনের ডান প্রান্তে বয়ে নিয়ে গেল — তার দ্'পাশে পাহারা হিসেবে রইল দ্খানি খাড়া বেয়নেটের ঠাণ্ডা ঝলমলে ইস্পাতের দ্'টি পাত।

'চারজন করে — ডানদিকে ফেরো! সামনে এগোও! মার্চ!'

বড়দের লাইনে অল্প একটু গোলমাল দেখা গেল, মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ভিতু-ভিতু চোখে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু ড্রামবাদকদের পা-ফেলার নিয়মিত তালে সবকিছ্র সংশোধন হয়ে গেল। চতুর্থ মিশ্র বাহিনী কাজে হাত দিতে চলল।

পেছন থেকে একদৌড়ে ছ্টে এসে ব্র্ন বাহিনীটাকে ধরে ফেলল, তারপর সকলের সঙ্গে পায়ের তাল মিলিয়ে আগে-আগে পথ দেখিয়ে বাহিনীকে নিয়ে গেল মাঠের একটা জায়গায়। জায়গাটায় তার আগের বেশ কয়েক দিন ধরে মাঠ-আলো-করে ছিল সিলান্তির হাতে-গড়া পরিপাটি সাজানো গমের আঁটির একটা মস্ত উ'চু গাদা। তার আশপাশে অবশ্য আরও কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট গাদা ছিল, তবে সেগ্লো অত পরিপাটি করে সাজানো ছিল না। এই পরের গাদাগ্লো ছিল জোয়ার, জই আর যবের আঁটির। এছাড়া ছিল সেই বিশেষ জাতের জোয়ার-আঁটির গাদা, যা এমন কি চাষীরাও চিনতে ভুল করে যব বলে মনে করেছিল। শেষোক্ত এই গাদাগ্লো বানিয়েছিল কারাবানভ, চোবত আর ফেদরেঙ্কো, আর একথা মানতেই হবে যে ছেলেগ্লো যতই খেটে থাকুক আর ঘাম ঝরিয়ে থাকুক এ-ব্যাপারে সিলান্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ'টে উঠতে পারে নি তারা।

তেলকালি-মাখা গম্ভীর মেজাজের মেকানিকরা চতুর্থ বাহিনীর আসার অপেক্ষায় এতক্ষণ তৈল-চালিত এঞ্জিনটির পাশে অপেক্ষা করে ছিল। এই এঞ্জিনটি পাশের একটি গ্রাম থেকে ভাড়া করে এনেছিল্ম আমরা। ফসল-মাড়াইয়ের যন্ত্রটা অবশ্য আমাদের নিজস্ব ছিল। তার আগের বসন্তকালে কিস্তিবন্দী দাম শোধ করার শর্তে যন্ত্রটা কেনা হয়েছিল, আর আমাদের তৎকালীন জীবনের আর সবকিছ্র মতো সেটাও ছিল একটা অভিনব, নতুন ব্যাপার।

বাহিনীটা ভেঙে দ্রুত ছোট-ছোট দল তৈরি করে ফেলল ব্র্ন। আগের দিন রাত্রেই সবকিছ্ পরিকল্পনা ছকে রেখেছিল সে। সাধে কি আর সে

চতুর্থ মিশ্রের ঝানু দলপতি হয়ে উঠেছিল! যাই হোক, জই-ফসলের যে-গাদাটা সবশেষে মাড়াই করা হবে বলে স্থির হয়েছিল আমাদের পতাকাটা নিয়ে গিয়ে তার ওপর পুঁতে দেয়া হল।

দুপুরের খাওয়ার সময়ের মধ্যেই গম মাড়াইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেল। মাড়াই-কলটার সবচেয়ে উঁচু মঞ্চটার ওপর ভিড় ছিল সবথেকে বেশি, সেখানে হৈ-হুল্লোড়ও চলছিল জোর। এই মঞ্চে ছিল প্রধানত মেয়েরা — সারা গায়ে পাঁশুটে-সোনালি গমের ভুসি মেখে খুশি-ঝলমলে চোখে কাজ করছিল তারা। এখানে ছেলেদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিল লাপত। আর, কোনো কিছুতেই ওর ক্লান্তি ছিল না -- নিজের পিঠখানা বা জিভ কাউকেই এক-মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছিল না ও। ফসল-মাড়াইয়ের কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিল সিলান্তি। গমের ভুসিতে একই রকম মাখামাখি অবস্থায় ওর টেকো মাথা আর পাতলা গোঁফজোড়া মাত্র নজরে পড়ছিল।

দেখা গেল লাপত এক সময়ে অক্সানাকে খেপাতে শুরু করেছে। বলছে:

'ছোঁড়ারা মজা করার জন্যি তোমারে বলেছিল যে এইটা গম। আসলে এইটা কিন্তু গম নয়, মটরশুঁটি। বোঝলে?'

গমের আবাঁধা একগোছা ছড়া নিয়ে লাপতের মাথায় চাপিয়ে দিল অক্সানা। লাপতের কথায় ইতিমধ্যে চারিদিকে যে-হাসির হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল, অক্সানার এই কাজে তা যে কিছুমাত্র চাপা পড়ল তা নয়।

ফসল-মাড়াইয়ের এই কাজটা আমার ভারি পছন্দ। বিশেষ করে যত সন্ধে ঘনিয়ে আসে ফসল-মাড়াইয়ের একটা বিশেষ সম্মোহন ততই পেয়ে বসে সবাইকে। ইতিমধ্যে যন্ত্রের একঘেয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর তালে কী করে যেন সঙ্গীতের ছোঁয়া লেগে যায় আর কান ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এই আজগবি গানের সুরে-লয়ে। মুহূর্তে-মুহূর্তে সে-সঙ্গীতের কতই-না বৈচিত্র্য আর রকমফের কানে ধরা পড়ে, আবার একই সঙ্গে মনে হয় এর অস্থায়ী, অন্তরা আর আভোগ বলতে কিছু নেই, প্রতিটি পদ আগের পদটিরই হুবহু অনুকৃতিমাত্র। আর এই সঙ্গীত কাজকর্মের জটিল নানারকম নড়াচড়ার ভারি সুন্দর আনন্দদায়ক একটা আবহ গড়ে তোলে। আর এই নড়াচড়ায় ইতিমধ্যে ক্লান্তির ছাপ ফুটলেও তখনও পর্যন্ত তা একটানা অদম্যভাবে চলতে থাকে। মনে হয় যেন কোন ভোজবাজির মন্ত্রে একেক সারি গমের ছড়া একেক বারে উঠে আসে ক্রমশ-

ছোট-হয়ে-আসা গাদাটা থেকে আর কলোনির ছেলেমেয়েদের অল্প একটু হালকা হাতের ছোঁয়ায় ছুটে চলে তাদের শেষ যাত্রায়। তারপর তারা লাফিয়ে পড়ে অতৃপ্ত যন্ত্ররাক্ষসটার মুখগহ্বরে আর পেছনে রেখে যায় উড়ন্ত খড়কুটোর ঘূর্ণিঝড় আর জীবন্ত ছড়াগুলো থেকে ছিঁড়ে-নেয়া উড়ন্ত গমের দানার আর্তস্বর। আর এই ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে, অসংখ্য গমের ছড়ার মৃত্যুর ছটফটানির আশেপাশে কলোনির ছেলেমেয়েরা মেতে থাকে হাসি-তামাশায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিতে আর উত্তেজনায় টলতে-টলতে অথচ নিজেদের ক্লান্তিকেই তুচ্ছজ্ঞান করে নিচু হয়ে দৌড়োদৌড়ি করতে-করতে, বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে আর মাখামাখি হয়ে ধুলোয় আর ভুসিতে, তারা যেন গ্রীষ্মকালের শান্ত সন্ধ্যার মনমাতানো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে। বিচিত্র শব্দের ঐকতানে, যন্ত্রের ক্লিক-ক্লিক শব্দের একঘেয়ে সুরে, সবচেয়ে উঁচু মণ্ডটার যন্ত্রণাদায়ক বেসুরো আওয়াজের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা মিলিয়ে দেয় স্বাস্থ্যবান মানুষের ক্লান্তিবোধের উল্লসিত, এবং মূলত প্রধান ধরনের এক সঙ্গীত। এই ঐকতান সঙ্গীতের প্রত্যেকটি বাজনাকে আলাদা করে চেনা যেমন শক্ত ছিল, তেমনই কঠিন ছিল গম-মাড়াই গোলাব আদিম ধরনের এই আকর্ষণ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনা। পাঁশুটে-সোনালি ভুসিতে মাখামাখি কলোনি-বাসিন্দাদের প্রত্যেককে আলাদা ক'রে চেনা বলতে গেলে প্রায় সম্ভবই ছিল না। দেখে মনে হোত বুঝি ওরা ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ ছবি। লালচুলো, কালোচুলো আর শণের রঙের চুলওয়ালা — সবাইকে দেখতে লাগত একই রকম। সেই কোন ভোরবেলা থেকে নোটবই হাতে নিয়ে ভূতের মতো দেখতে, কিছুটা কোলকুঁজো যে-মানুষটি সেদিন এই ঘূর্ণিঝড়ের একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি যে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না হতে পারেন এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। তাঁর পাশে দাঁড়ানো জবুস্থবু, কোঁকড়ানো ছায়াবৎ অপর একজনকেও চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। একমাত্র গলার স্বর দিয়ে, পরিচিত সেই এক বিনম্র, সংযত বাকভঙ্গি থেকে চিনতে পারলুম মূর্তিটি হলেন আমাদের এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ। শুনলুম তিনি জিজ্ঞাসা করছেন:

'কমরেড বোকভা, এখনও পর্যন্ত কতটা যব মাড়াই হয়েছে আমাদের?'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না তাঁর নোটবইখানা মেলে ধরলেন সূর্যাস্তের আলোয়।

'এর মধ্যেই চার শো পুদ হয়েছে।' এমন একটা ক্লান্ত, ভাঙা রিনরিনে গলায় জবাব দিলেন তিনি যে তাঁর হাল দেখে ভারি দুঃখ হল।

লাপত অবশ্য প্রাণের আনন্দে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ক্লান্তি দূর করার একটা-না-একটা প্রক্রিয়া খুঁজে ঠিক বের করছিল সে।

হঠাৎ শোনা গেল সারা গোলাঘর কাঁপিয়ে সে চিৎকার করে চলেছে, 'গালাতেঙ্কো! হেই গালাতেঙ্কো!'

গালাতেঙ্কো তখন দু-পুদ ওজনের খড়ের একটা বোঝা কাঁটাওয়ালা একটা ডান্ডার সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রেখে মাথার ওপর বসানোর চেষ্টায় ছিল। সমান তালে চিৎকার করে জবাব দিতে গিয়ে বোঝার ভারে এক মুহূর্ত টলে উঠল সে:

'কী, চাস কী?'

'এক মিনিট ইদিকে আয় দেখি — তোরে দরকার আছে!..'

লাপতের প্রতি গালাতেঙ্কো ভক্তিতে প্রায় গদ্‌গদ ছিল। লাপতের চতুর রস-রসিকতা, হাসিখুশি ভাব আর তার স্নেহ-মমতার জন্যে তাকে ভালোবাসত গালাতেঙ্কো। আবার লাপতই ছিল একমাত্র যে গালাতেঙ্কোকে বুঝত এবং আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত যে গালাতেঙ্কো মোটেই সত্যি-সত্যি কুঁড়ে নয়।

খড়ের বোঝাটা এঞ্জিনের সামনে ছুড়ে মাটিতে ফেলে গালাতেঙ্কো তাড়াতাড়ি ফসল-মাড়াই কলটার কাছে গেল। চারপাশের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম করার এমন একটা অজুহাত পেয়ে গিয়ে মনে-মনে ভারি খুশি হয়ে হাতের ডান্ডাটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লাপতের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল সে:

'কী? ডাকত্যেছিলি কী জন্যি?'

মঞ্চের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে লাপত শুরু করল, 'শোন্ ইয়ার, এট্টা কথা বলি।' আর নির্ঘাত মজাদার কিছু শোনা যাবে এই আশায় আশপাশের সবাই অমনি কান খাড়া করে রাখল।

'বল্, শোনত্যেছি...'

'আমাদের শোওয়ার কোঠায় যা...'

'তারপর?'

'আমার বালিশের নিচি দেখবি...'

'কী দ্যাখব?'

'আঃ, বলছি, বলছি। আমার বালিশের নিচি...'

'কিন্তু কী দ্যাখব?'

'আমার বালিশের নিচি দেখবি...'

'তর বালিশের নিচি যে তা তো বোঝলাম, কিন্তু কী...'

'...বাড়তি একজোড়া হাত।'

'তা, অদেরে নিয়ি আমারে কী করত্যে বলিস?' শুধোল গালাতেঙ্কো।

চারিদিকের হাস্যরোলের মধ্যে নিজের হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে লাপত বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারিস ও-দু'টারে এখেনে নিয়ি আয়, এ-দুখানায় আর কাজ চলতেছে না।'

'বোঝলাম,' গালাতেঙ্কো জবাব দিল।

ও মনে করেছিল সকলে বুঝি লাপতের কথাতেই হাসছে। নাকি, হয়তো ওর কথাতেও? কিন্তু ও তো প্রাণপণ চেষ্টা করেছে যাতে মুখ ফসকে বোকার মতো বা হাস্যকর কোনো কথা না-বেরোয় আর তাতে সফলও হয়েছে ভাবছিল, কারণ কথা যা হয়েছে তা তো একমাত্র লাপতই বলেছে। কিন্তু দেখা গেল, লোকে ক্রমশই বেশি জোরে-জোরে হাসছে। ব্যাপারখানা কী? এদিকে ফসল-মাড়াই যন্ত্রটা বিনা কাজে ক্লিক-ক্লিক করে চলেছিল। ফলে বুরুনি বকাবকি শুরু করল।

'কী ব্যাপার? হয়েছেটা কী? সবাই তোরা কাজ বন্ধ করেছিস কেন? তুই-ই এর জন্যি দায়ী, গালাতেঙ্কো!'

'বাঃ, আমি আবার কী...'

হঠাৎ সবাই কেমন চুপ করে গেল আর গমগম করে উঠল লাপতের গুরুগম্ভীর গলা। একই সঙ্গে ক্লান্তি আর উদ্বেগ প্রকাশ করে আর বুরুনের কাছে যেন কোনো গোপন কথা ফাঁস করছে এমন একটা চমৎকার ভঙ্গি করে সে বললে:

'দেখছিস? আমার হাত দু'খান আর কাজে লাগতেছে না। তা গালাতেঙ্কোরে একবার রেহাই দে-না, ও গিয়ি আমার বাড়তি হাত দু'খান খুঁজে নিয়ি আসুক।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল বুরুন, আর কপট ধমকের সুরে গালাতেঙ্কোকে বলল:

'তা যা না কেন? যা, গিয়ে নিয়ি আয়! আনতে নিশ্চয় তোর পেরানটা বেরিয়ে যাবে না! তুই কী কুঁড়ের বাদশা রে, গালাতেঙ্কো!'

গম-মাড়াই ঐকতানের সুর গেল কেটে। এবারে উঠল উচ্চকণ্ঠ রুদ্ধশ্বাস হাসি আর 'বাবা-রে মা-রে পারি না-রে'র বেসুরো আওয়াজ। এমন কি শেরে পর্যন্ত না-হেসে পারলেন না, মেকানিকরাও এঞ্জিন ছেড়ে নিজেদের তেলকালিমাখা হাঁটুগুলো জাপটে ধরে হেসে লুটিয়ে পড়ল। গালাতেঙ্কো তাড়াতাড়ি এজমালি শোবার ঘরগুলোর দিকে পা বাড়াল, আর সিলান্তি পেছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল:

'তাইলে ব্যাপারডা হল্য গে এই, দোস্ত!..'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল গালাতেঙ্কো। মনে হল, কী যেন ভাবছে। ওদিকে খড়ের স্তূপের ওপর থেকে কারবানভ চেঁচিয়ে বলল:

'কী, অপেক্ষা করতে লেগেছিস কার জন্যি? যা!'

এবার গালাতেঙ্কো হি-হি করে একমুখ হেসে দিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল ও। হাসতে-হাসতে আবার ও ডাণ্ডাটার কাছে ফিরে এল। খড়ের স্তূপের ওপর থেকে ছেলেরা শুধোল:

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'বুঝলি, লাপত আমারে কয় কিনা ঘরে গিয়ি অর জন্যি কয়খান বাড়তি হাত নিয়ি আসতি।'

'তা, আনতে গেলি না কেন?'

'অর কোনো বাড়তি হাত নাই তো, ও তো এয়ার্কি মারতেছেল।'

এবার বুরুন হুকুম দিল:

'যথেষ্ট হয়েছে — বাড়তি হাত নিয়ি আর গপ্পো না! কাজ শুরু কর্ সবাই!'

লাপত মন্তব্য করল, 'যথেষ্ট বল্যে যথেষ্ট! আমাদের এখন এই দু'টা পুরানো হাত নিয়িই কাজ করতি হবে।'

সন্ধে ন'টার সময় এঞ্জিন থামিয়ে শেরে বুরুনের কাছে গেলেন। বললেন:

'ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এদিকে আর আধা-ঘণ্টার কাজ বাকি।'

'ঘাবড়াবেন না! কাজটা আমরা শেষ করব,' বুরুন বলল।

শুনে লাপত ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল:

'গোর্কিপন্থী ভাইসব! আর আধা-ঘণ্টার কাজ বাকি। কিন্তু আমার ভয় হতেছে যে আর আধা-ঘণ্টা কাজ করলি আমরা খতম হয়ে যাব-নে। আমি এতে রাজি না।'

'তাহলে? কী চাস তুই?' সন্দেহভরা গলায় ব্রুন শুধোল।

'আমি এর প্রতিবাদ করি! আরও আধা-ঘণ্টায় আমরা সবাই অক্কা পেয়ে যাব। তাই না, গালাতেঙ্কো?'

'নিচ্চয়, তা যা বল্যেছিস। আধা-ঘণ্টা বড্ড বেশি সময়।'

এবার মুঠো-করা হাত তুলল লাপত। বলল:

'আরও আধা-ঘণ্টা ধরে কাজ করতে পারি না আমরা। সবকিছু — এই গোটা গাদাটা — আমাদের পনারো মিনিটে শেষ কর্ত্তে লাগবে। তোর ওই আধা-ঘণ্টাফণ্টা চলবে না!'

'ঠিক, ঠিক!' গালাতেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল। 'ঠিক কথা কয়েছে ও!'

আবার একচোট হাসির সঙ্গতের সঙ্গে ফের এঞ্জিন চালু করলেন শেরে। আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ দেখা গেল সকলে ওইখানেই ওই খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ে ঘুমনোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ব্রুন রেহাই দেয়ার পাত্র নয়, সে হুকুম দিল:

'সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও!'

বিউগ্‌ল আর ড্রাম-বাদকরা তাদের মওকা মেলার অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। এবার তারা দৌড়ে গিয়ে পয়লা সারিতে দাঁড়াল। বাজনার তালে-তালে চতুর্থ মিশ্র পতাকা বয়ে নিয়ে গেল তার যথাস্থানে — শ্বেত প্রাসাদে। আমি তখনও রয়ে গেছি ফসল-মাড়াই গোলায়, শ্বেত প্রাসাদ থেকে পতাকা অভিবাদনের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। হঠাৎ অন্ধকারে মস্ত লম্বা একটা লাঠি-হাতে এক মূর্তি আমার কাছে এসে উপস্থিত।

'কে?' চেঁচিয়ে উঠলুম।

'আমি, আন্তন সেমিওনভিচ। ফসল-মাড়াই কলডা নিয়ি আপনের সাথে কথা বলতি এস্যেছি। ভলোভির খামারখোলা থেক্যে, বোঝলেন। আমার নাম ভলোভিক...'

'ঠিক আছে! বাড়িতে এস...'

আমরাও শ্বেত প্রাসাদের দিকে রওনা দিলুম। মনে হল বুড়ো ভলোভিক অন্ধকারে বিড়বিড় করে কী-যেন বকতে-বকতে আসছে।

'ভারি ভালো লাগত্যেছে এখেনে। আগি — লোকে যখন বাস করত্য তখন যেমন ছেল আর-কি...'

'কেমন ছিল তখন?'

'এই, ধরেন কেনে, আপনেরা ফসল মাড়াই করতি বার হলেন ক্রুশ আর ধ্বজাপতাকা নিয়ি। যেমনডা ঠিক বার হওয়া উচিত আর-কি।'

'ক্রুশ আবার দেখলে কোথায়? আমরা খালি পতাকা নিয়ে বেরিয়ে ছিলুম। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে পাদ্রি-পুরুতও ছিল না।'

হাতের লাঠিগাছটা নাড়তে-নাড়তে সামনের দিকে কয়েক পা ছুটে গেল ভলোভিক।

চেঁচিয়ে বলল, 'পাদ্রি-পুরোত্যে কী আস্যে-যায়? লোকির উৎসব করা নিয়ি কথা। এও তো এক রকমের উৎসব, নাকি? ফসল ঘরে তোলা — বাপ-রে বাপ, লোকির কাছে এ-ই-তো সবার সেরা উৎসব, মচ্ছব যারে কয়। আর আমাদের মানুষে এডাই ভুলি বসি আছে।'

শ্বেত প্রাসাদে পেঁছে দেখলুম জমাট হৈ-হল্লা চলেছে। কলোনি-বাসিন্দারা যতই ক্লান্ত হয়ে থাকুক নদীতে একটা ডুব দিয়ে আসতে তাদের আটকায় নি। আর স্নানের পরে তাদের আর এতটুকু ক্লান্তি ছিল না শরীরে। বাগানে-পাতা টেবিলগুলোয় তখন স্ফূর্তির হুল্লোড় চলেছে আর কথায়-কথায় মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না‌র জল এসে যাচ্ছে চোখে। তাঁর অবশ্য চোখে জল আসার কারণ ঘটেছিল অনেকগুলো — কারণ তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন কলোনি-বাসিন্দাদের, কারণ তাঁর মধ্যেও সত্যিকার মানবধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, কারণ তিনিও আস্বাদ পেয়েছিলেন স্বাধীন কর্মচঞ্চল যৌথ জীবনের আনন্দ-উপভোগের।

বুরুন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী, কাজটা আপনার খুব সোজা ঠেকেছে?'

'জানি না,' মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না জবাব দিলেন। 'কাজটা বোধহয় কঠিনই। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়। আসল কথা হল, এ-ধরনের কাজ করে আনন্দ আছে।'

খাবার সময় সিলান্তি টেবিলে আমার পাশে বসল। তারপর এক সময়ে গলা নামিয়ে বলল:

'অরা আমারে কয়্যেছে খবরডা তমারে দিতি, বোঝলে। আসচে রোববার — ওই যাদের ঘটক কয় আর-কি — তারা ওল্গারে নিয়ি কথাবাত্তা কতি এখেনে আসতিছে। ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে!'

'কার কাছ থেকে? নিকলায়েঙ্কোর?'

'বোঝলে, পাভেল ইভানভিচের কাছ থেক্যে। বুড়ার কথা কতিছি আমি। কাজেই তমারে পুরাদস্তুর তৈয়ের হয়ি থাকতি হবে-নে, আন্তন সেমিওনভিচ। হাতমোছার তোয়ালে কয়খান যোগাড় করি রাখত্যে হবে-নে, বোঝলে, আর রুটি আর লবণ। এই হল্য গে ব্যাপার!'

'দোস্ত সিলান্তি, তোমাকেই এই সবকিছুর যোগাড়যন্তর, দেখাশোনার ভার নিতে হবে, বুঝলে?'

'তা তো বোঝতি পারলাম। কিন্তু ব্যাপারডা কী বোঝলে-নি দাদা, এমন সব অবস্তায় লোকি এক-আধটুক স্বাস্থ্যপান করে্য থাকে, ওই সামগোন বা ওইরকম আর-কিছু। বোঝলে?'

'না, সিলান্তি, সামগোন চলবে না। তবে তুমি বোতল-দুই মিষ্টি মদ কিনে রাখতে পার।'

১০

বিবাহ-অনুষ্ঠান

রবিবার পাভেল ইভানভিচ নিকলায়েঙ্কোর দুই দূত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। লোক দু'টি ছিল আমাদের পরিচিত — একজন কুজ্‌মা পেত্রোভিচ মগরিচ, অপর জন ওসিপ ইভানভিচ স্তমুখা। কুজ্‌মা পেত্রোভিচ কলোনির সকলের সঙ্গেই ভালোরকম পরিচিত ছিল। সে থাকত নদীটার ঠিক ওপারেই, আমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। লোকটা ছিল বাচাল, চরিত্রেরও কোনোরকম দৃঢ়তা ছিল না তার। আগাছায়-ভরা বেলেমাটির একটুকরো জমি ছিল তার, তাতে সে চাষ-আবাদ বড় একটা করত না। ফলে জমিটার নিজের উদ্যোগেই সেখানে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, আগাছা ইত্যাদি জন্মেছিল। এই জমির ওপর দিয়ে অসংখ্য পায়ে-চলার পথও তৈরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ সকলেরই যাতায়াতের রাস্তায় পড়ত জমিটা। কুজ্‌মা পেত্রোভিচের মুখখানা ছিল তার জমিটার মতোই, কারণ সেখানেও সৌন্দর্যবৃদ্ধির কাজে লাগে এমন কিছুই জন্মাত না। তার নোংরা, পাতলা, থোপা-থোপা দাড়ির প্রত্যেকটা গোছাকে মনে হোত যেন মালিকের স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না-করে গজিয়ে-ওঠা একেক গোছা আগাছা। তাছাড়া লোকটার মুখের ওপরও আঁকা হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য পথ - বলিরেখা, চামড়ার ভাঁজ, চাকার দাগের গর্ত।

একমাত্র যে-বস্তুটা কুজ্‌মা পেত্রোভিচের জমি থেকে তার মুখখানাকে আলাদা করে চিনিয়ে দিত তা হল বাঁশির মতো তার সরু, লম্বা নাকটা।

অন্যদিকে ওসিপ ইভানভিচ স্তমুখা আবার দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। গন্‌চারোভ্‌কার পুরুষদের মধ্যে তার ছিল সবচেয়ে সুন্দর মুখ আর সবথেকে সুগঠিত চেহারা। প্রকাণ্ড একগাছা লালচে দাড়ি ছিল তার মুখে, আর ছিল সুন্দর কিছুটা ভাসা-ভাসা একজোড়া চোখের উদ্ধত দৃষ্টি। লোকটার পরনে থাকত আধা-শহুরে আধা-ফৌজী একপ্রস্থ পোশাক। সব সময়েই তাকে বেশ কেতাদুরস্ত আর পাতলা ছিপছিপে দেখতে লাগত। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন চাষীদের মধ্যে তার বহু আত্মীয়স্বজন ছিল, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক তার নিজের কোনো জমিজিরেত ছিল না এবং মনে হোত যেন শিকারই তার একমাত্র পেশা। নদীর ঠিক পাড়ের ওপরই, ইচ্ছে করে যেন গ্রামের সংসর্গ এড়িয়ে আছে এমন একখানা বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র কুঁড়েয় বাস করত লোকটা।

অতিথিদের আসার কথা যদিও আগে থেকে জানতুম তবু আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত হবার আগেই তারা এসে উপস্থিত হল। তাছাড়া এ-ধরনের একটা অজানা ব্যাপারে প্রস্তুত হতে হলে যে কী-কী করতে হয় তা-ই বা আমরা জানব কী করে? তবে এ-ও সত্যি যে অতিথিরা এসে যখন আমার অফিস-ঘরে ঢুকল তখন সবকিছুই বেশ শক্তপোক্ত, ধীরস্থির আর গাম্ভারি চালে চলছিল। অফিসে তখন কালিনা ইভানভিচ আর আমি ছাড়া অপর কেউ ছিল না। ঘরে ঢুকে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে অতিথিরা গিয়ে বসল সোফায়। কীভাবে যে কথা আরম্ভ করা যায় বুঝে উঠতে পারছিলুম না, তাই ওসিপ ইভানভিচ নিজে থেকে কথা শুরু করায় খুশিই হলুম। খুব সহজভাবে সে বললে:

'আগের দিনি এমন সব ক্ষেত্রে লোকি শিকারিদের নিয়ি এট্টা গপ্পো ফাঁদি বসত্য। যেমন, ধরেন, আমরা শিকারে গেলাম, গিয়ি এট্টা খ্যাঁকশিয়ালীর দেখা পালাম, তা খ্যাঁকশিয়ালীডা ছেল আবার সোন্দর চেহারার এট্টা মেয়্যা... এইসব আর-কি! কিন্তু এখন আর ওই গপ্পের দরকার পড়ে না, যদিও আমি নিজিই শিকারি — তবু।'

বললুম, 'ঠিক কথা।'

সোফা থেকে না-উঠেই পা দু'টো একটু নেড়েচেড়ে ঠিক হয়ে বসল কুজ্‌মা পেত্রোভিচ। তারপর দাড়ি নেড়ে বলল:

'আমি বলতি চাই, এ-সবই অর্থহীন ব্যাপার!'

স্তমুখা তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল:

'ব্যাপারডা যে অথহীন সেডা কথা না, কথা হল্য সময় পাল্‌ট্যে গেছে আর-কি।'

'সময় নানারকমেরই আছে,' মাতব্বরি ঢঙে এবার শুরু করল কালিনা ইভানভিচ। 'কখনও-কখনও মান্‌যির মন আন্ধারে ছাইয়া থাকে আর হেয়াও অদের কাছে যথেষ্ট বইল্যা মনে হয় না — অরা তাই নিজিগো ভয় দেখানোর লেগ্যে কত রকমের যে ভুত-পেরেত মাথা খাটাইয়া বার করে তার ঠিকঠিকানা নাই। আর তারপর মাথায় গোবর ভইর‍্যা বইস্যা থাকে তারা আর সবকিছুতেই ডরাইতে ভালোবাসে -- তা সে বজ্রপাত, চান্দ, কালা বিড়াল, যাই হউক না ক্যান। কিন্তু এখন আমাগো সোভিয়েত গভর্নমেন্টের রাজত্বি -- এখন একমাত্তর পথ-রুইখ্যা-দাঁড়ান বাহিনী ছাড়া আর কাউরে ডরাই না আমরা...'

মনে হচ্ছিল কালিনা ইভানভিচ যেন ভুলেই গেছে যে আমরা সেদিন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার জন্যে একত্রিত হই নি। যাই হোক, স্তমুখা কালিনা ইভানভিচকে বাধা দিয়ে বলল:

'যার জন্যি আজ আমরা এস্যেছি তা সরলভাবে বলাই ভালো? আপনেদের কাছি যাঁরা আমাদের পাঠায়্যেছেন তাঁদেরে আপনেরা চিনেন -- তাঁরা হলেন পাভেল ইভানভিচ নিকলায়েঙ্কো আর তাঁর সহধর্ম্মিনী ইয়েভ্‌দাকিয়া স্তেপানভ্‌না। কলোনির পিতা হিসাবে আপনেরে আমরা জিজ্ঞেসা করত্যেছি, আপনে কি আপনের -- ওরে কী কয় -- মেয়্যা ওলিয়া ভোরনভারে ওনাদের ছেল্যা পাভেল পাভলভিচ -- যে কিনা বৰ্ত্তমানে গেরাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান -- তার সাথে বিয়া দিতি ইচ্ছুক?'

'এয়ার জবাব দিতি অনুরোধ জানাত্যেছি আপনেরে।' এবার মিনমিন করে বলল কুজমা পেত্রোভিচ। 'যদি আপনে এতি রাজি থাকেন (আর ছেল্যার বাপ তো রাজি আছেই) তাইলে আমাদেরে তোয়ালে আর রুটি দিতি আজ্ঞা হোক, আর যদি রাজি না থাকেন তাইলি অনুরোধ করবা যে আপনেরে এতডা কষ্ট দেলাম বলি আমাদের ভুল বোঝবেন না।'

'হি-হি!' কালিনা ইভানভিচ হেসে বলল, 'এয়াও যথেষ্ট না। বিয়া না-মঞ্জুর হইলে আপনেগো অথহীন প্রথা অনুযায়ী একখান কুমড় আপনেগো ঘাড়ে কইর‍্যা লইয়া ঘরে যাওন দরকার।'

ওসিপ ইভানভিচও হাসল। বলল, 'তাইলি কুমড়ার জন্যি আমরাও দাঁড়াব্য না। তাছাড়া এখন কুমড়া ফলনের সময়ও না।'

'তা যা বলছেন,' কথাটা মেনে নিল কালিনা ইভানভিচ। তারপর বলল, 'কিন্তু আগের দিন হইলে, বিশেষ কইর‍্যা ছেমরি যদি দেমাকী হইত, তাইলে ঘর ভইর‍্যা সে কুমড় রাখত - কওন তো যায় না যদি কাজে লাইগ্যা যায়। আর যদি বিয়ার বর না জোটত তাইলে ছেমরি ওই সকল কুমড় দিয়া তরকারি বানাইত। অপদাত্থ আর কারে কয়! তা, কুমড়ের ব্যঞ্জন হইল গিয়া অতি উপাদেয় বস্তু, বিশেষ কইর‍্যা যদি তাতে মকাইদানা পড়ে...'

'তা সে যাই হোক, বাপ হিসাবে আপনের জবাবডা কী, বলেন শুনি?' ওসিপ ইভানভিচ আবার প্রশ্ন করল।

আমি বললুম:

'আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো মেয়েটির বাবা নই, পিতৃত্বের অধিকারও নেই আমার। এ-ব্যাপারে অবশ্যই ওলিয়ার মত নিতে হবে আপনাদের। তার পরে অবশ্য খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে আমাদের দলপতি-পরিষদ।'

ওসিপ ইভানভিচ এতে রাজি হয়ে গেল। শান্তভাবে বলল, 'আপনেদের কী করতি হবে না-হবে সে তো আমাদের বলার কথা না, আপনেদের নূতন প্রথা অনুযায়ী যা উচিত বিবেচনা করেন তাই করেন না ক্যানে।'

অফিস থেকে বেরোতে পাশের ঘরে কলোনির মনিটরের দেখা পেলুম। তাকে বললুম দলপতি-পরিষদের সভা ডাকার বিউগ্‌ল-সংকেত জানিয়ে দিতে। কলোনিতে অস্বাভাবিক রকমের কর্মব্যস্ত আর উত্তেজিত একটা আবহাওয়া বিরাজ করছিল তখন। আমার কাছে ছুটে এসে হাসতে-হাসতে নাস্তিয়া জিজ্ঞাসা করল:

'তোয়ালেগুলান নিয়ি আসব কোথায়? এই ঘরে?' অফিস-ঘরের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল ও।

'তোয়ালে নিয়ে এখুনি অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এখনও আমরা বোঝাপড়ায় আসি নি, বুঝলে? তবে তুমি কাছাকাছি কোথাও থেকো, দরকার পড়লেই তোমাকে ডেকে পাঠাব।'

'আর বাঁধার কাজটা করবে কে?'

'কী বাঁধার কাজ আবার?'

'কেন, তোয়ালেগুলান! ওগুলান তো ওই — কী যেন বলেন অদেরে — ঘটকদের গায়ি বেঁধে দিতি হবে।'

তোস্‌কা সলভিয়েভ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তখন। বগলে প্রকাণ্ড একখানা গমের ময়দার রুটি চেপে ধরে হাতের নুনের পাত্রটাকে নাচিয়ে-নাচিয়ে দানাগুলোর লাফালাফি দেখছিল আর মজা পাচ্ছিল খুব। হঠাৎ সিলান্তি ছুটে এসে বলল:

'রুটি আর লবণ নিয়ি অমনধারা ঝাঁকাঝুঁকি করত্যেছ ক্যানে? ওগুলান এট্টা ডিশির উপর রাখো দেখি...'

চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছিল ও। সেটা লুকনোর জন্যে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল:

'ওহ্, এই সব কাচ্চাবাচ্চা নিয়ি কারবার!.. তা, জলখাবারির বেবস্তাডা গেল কনে?'

এমন সময় একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না দেখা দেয়ায় আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

অনুনয় করে বললুম, 'এ-ব্যাপারে আপনি একটু আমাদের সাহায্য করুন দেখি!'

'উঃ, এদের আমি কতক্ষণ যে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার ঠিক নেই। সেই কোন ভোর থেকে রুটিখানাকে সারা কলোনি-এরা হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমরা এস দেখি আমার সঙ্গে। আপনি কিছু ভাববেন না, আমরা সবকিছু বন্দোবস্ত করব'খন। মেয়েদের ঘরে আছি আমরা, দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন।'

খালি-পায়ে দলপতিরা সবাই ছুটে এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

ওই সুখের সময়টায় যারা-যারা দলপতি ছিল তাদের নামের একখানা তালিকা এখনও আমার সঙ্গে আছে। তালিকাটা এইরকম:

প্রথম বাহিনীর (জুতো-তৈরির কারিগরদের) দলপতি — গুত।

দ্বিতীয় বাহিনীর (আস্তাবল-কর্মীদের) দলপতি — ব্রাত্‌চেঙ্কো।

তৃতীয় বাহিনীর (গোশালা-কর্মীদের) দলপতি — অপ্রিশ্‌কো।

চতুর্থ বাহিনীর (ছুতোরমিস্ত্রিদের) দলপতি — তারানেত্‌স।

পঞ্চম বাহিনীর (মেয়েদের) দলপতি — নচেভ্‌নায়া।

ষষ্ঠ বাহিনীর (কামারশালের কর্মীদের) দলপতি — বেলুখিন।

সপ্তম বাহিনীর দলপতি — ভেত্‌কোভ্‌স্কি।

অষ্টম বাহিনীর দলপতি — কারাবানভ।

নবম বাহিনীর (ময়দাকল-কর্মীদের) দলপতি — অসাদ্‌চি।

দশম বাহিনীর (শুয়োর-খোঁয়াড়ের কর্মীদের) দলপতি — স্তুপিত্‌সিন।

একাদশ বাহিনীর (কাচ্চাবাচ্চাদের) দলপতি — গেওর্গিয়েভ্‌স্কি।

দলপতি-পরিষদের সেক্রেটারি — কোল্‌কা ভের্‌শ্‌নেভ।

ময়দাকলের ম্যানেজার — কুদ্‌লাতি।

ভাঁড়াররক্ষক — আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ।

সহকারী কৃষিবিৎ — ওলিয়া ভোরনভা।

বাস্তবে অবশ্য এই ক'জনের চেয়ে আরও অনেক বেশি কলোনি-বাসিন্দা দলপতি-পরিষদের সভায় যোগ দিত। জাদোরভ, জোর্‌কা ভোল্‌কভ, ভোলখভ আর বুরুনের মতো কম্‌সমোল সংগঠনের সদস্যদের যেমন সম্পূর্ণ আর সর্বস্বীকৃত অধিকার ছিল পরিষদের সভায় যোগ দেয়ার, তেমনই প্রিখোদ্‌কো, সরোকা, গোলস, চোবত, অভ্‌চারেঙ্কো, ফেদরেঙ্কো আর করিতোর মতো ঝানু পুরনো কলোনি-বাসিন্দাদেরও এ-ব্যাপারে একই রকম অধিকার ছিল। এছাড়া কাচ্চাবাচ্চাদের মধ্যে উৎসাহী অনেকেও যোগ দিত এই সভায়। মেঝের ওপর ঝাঁক বেঁধে বসত এরা। এদের মধ্যে বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই যাদের দেখা যেত তারা হল, মিত্‌কা, ভিত্‌কা, তোস্‌কা আর ভান্‌কা শেলাপুতিন। পরিষদের সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সব সময়ে যোগ দিতেন, আর উপস্থিত থাকত কালিনা ইভানভিচ আর সিলান্তি সেমিওনভিচ। ফলে হোত কী, সকলের বসবার মতো যথেষ্ট চেয়ার কখনই পাওয়া যেত না, আর সভায় যারা যোগ দিত তাদের অনেকে বসত জানলার তাকে কিংবা দাঁড়াত দেয়ালে ঠেস দিয়ে, আর নয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিত।

যাই হোক, সেদিন সভার উদ্বোধন করল কোল্‌কা ভের্‌শ্‌নেভ। ঘটক দু-জনকে আরও প্রায় ডজনখানেক কলোনি-বাসিন্দার সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে সোফাটায় বসতে হল, ফলে আস্তিনগোটানো হাত আর খালি-পায়ের গাদাগাদি ভিড়ে চাপা পড়ে তাদের আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব কিছুটা ক্ষুণ্ণই হল যেন।

ঘটকদের আসার উদ্দেশ্য দলপতিদের জানালুম আমি। অবশ্য দলপতি-পরিষদের কাছে এটা মোটেই নতুন খবর ছিল না, কারণ অনেকদিন আগে থেকেই ওলিয়া আর পাভেল পাভ্‌লভিচের মধ্যে বন্ধুত্বের ব্যাপারটা সকলের

নজরে পড়েছিল। তাহলেও নিছক আনুষ্ঠানিক ধরন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভের্‌শ্‌নেভ ওলিয়াকে প্রশ্ন করল:

'তু-তুমি পাভেলরে বি-বিয়া করতে ইচ্ছুক তো?'

অল্প একটু লাল হয়ে উঠে ওলিয়া জবাব দিল:

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!'

শুনে লাপত ঠোঁট ওলটাল। বলল:

'উঁহু, এইটা ঠিক হল না। তর আপত্তি করা উচিত ছিল, তাইলে আমরা তরে রাজি করানোর চেষ্টা পেতাম। নইলি মজাটা আর কী হল?'

কালিনা ইভানভিচ বলল:

'মজা হউক চাই না-হউক, আমাগো কাজের কথা কইতে লাগবে। আচ্ছা, আপনেরা খোলাখুলি বলেন তো, সম্পত্তি আর এইটা-সেইটার ব্যাপারে আপনেদের তরফ কী করবেন বইল্যা মনস্থ করছেন।'

ওসিপ ইভানভিচ গোঁফে তা দিল একবার। বলল:

'ব্যাপারডা হল্য গে এই — আপনেরা যদি বিয়াতে মত দেন তাইলে বিয়ার ভোজ আর বিয়ার উৎসব-অনুষ্ঠানের ভার নিব আমরা। আর তারপর নূতন বর-বৌ বুড়াবুড়ির সাথে একত্তর থাকব্যে। আর সক্কলে একত্তর থাকলি সম্পত্তিডাও এজমালি হয়ি থাকব্যে।'

'কিন্তু নতুন কুঁড়েখান কার জন্যি বানানো হচ্ছে?' কারাবানভ প্রশ্ন করল।

'কুঁড়্যেখান বানানো হতিছে মিখাইলের জন্যি।'

'কিন্তু পাভেল তো বড় ছেলে, তাই না?'

'বড় ছেল্যা তো বটেই। সেডা সত্য। কিন্তু বুড়া এমনডা করাই স্থির কর্যেছেন। বোঝলা না, পাভেল যে কলোনি থেক্যে বৌ পছন্দ করতিছে।'

'তা, তাতে হয়েছেটা কী? বৌ যদি কলোনির মেয়ে হয়ই?' অসন্তুষ্টভাবে গর্‌গর করে উঠল কভাল।

জবাবে কী যে বলবে প্রথমটায় ভেবে পেল না ওসিপ ইভানভিচ। তার হয়ে ফ্যাঁসফেঁসে মিনমিনে গলায় কুজ্‌মা পেত্রোভিচ বলল:

'ব্যাপারডা ঠিক হয়্যেছে ওইরকম। পাভেল ইভানভিচ বলতি চান: ইস্তিরিরে তো সোয়ামির কাছেই যাতি লাগব্যে, কারণ, বোঝলেন তো, অপর বৌয়ের বাপ জীবিত, কাজেই ছেল্যার শ্বশুর আছে — সের্গেই গ্রেচানির ঘর থেক্যে মেয়্যা নিত্যেছে মিখাইল। আর আপনেদের মেয়্যাডা, বোঝলেন তো, পাভেল

পাভ্‌লভিচের সাথে ওনাদের পুত্রবধূ হয়ি যাতিছে। পাভেল পাভ্‌লভিচ নিজিই এই বেবস্তায় রাজি আছে।'

'এই ব্যবস্থা হয়ে থাকলে আমাদের কুমড়াই দিতি লাগবে,' হাত নেড়ে বলল কারাবানভ। 'পাভেল পাভ্‌লভিচ রাজি আছে কি নাই, তাতে আমাদের কী এসে যায়? এতে শুধু এ-ই বোঝা গেল যে পাভেলের বুকের পাটা নাই। ব্যস, ফুরায়ে গেল। কিন্তু দলপতি-পরিষদ এইভাবে ওলিয়ারে সঁপে দিতি পারে না। এভাবে ওলিয়ারে সঁপে দিলি ওরে বুড়া শয়তানটার খেতমজুর করার সামিল হবে...'

'আঃ, সেমিওন...' কোল্‌কা ভুরু কুঁচকে বলল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে! শয়তান কথাটা আমি ফিরায়ে নিচ্ছি। যাই হোক, এটা হল একনম্বর আপত্তি। দ্বিতীয় কথা হল, আপনারা যে বিয়ার অনুষ্ঠানের কথা বলতেছিলেন সেইটা কী ব্যাপার?'

'সেডা এট্টা নেয্য ব্যাপার -- পুরোত্য ছাড়া কাউর কখনও বিয়া হয় না। আমাদের গেরামে কস্মিনকালেও এমন কাণ্ড হয় নাই।'

'হুঁ, এইবার আসল কথা ফাঁস হচ্ছে,' কভাল মন্তব্য করল।

দাড়ি চুলকে কুজ্‌মা পেত্রোভিচ বলল:

'কী যে আসল কথা আর কী নয় তা কে বলতি পারে? তয় আমাদের মধ্যি এমনধারা কাজ ভালো বলি গণ্য করা হয় না। এরে আমরা অবৈধ সম্পর্কের সামিল বল্যে মনে করি।'

পরিষদের সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সকলের মনে তখন একটিমাত্র ভাবনা — বিয়েটা বুঝি আর হল না। এমন কি আমার মনে এরকম ভয়ও ঢুকল যে ব্যাপারটার যদি সুমীমাংসা না হয় তাহলে ছেলেরা বিশেষ কোনো সৌজন্যের ধার না-ধেরে ঘটকদের হয়তো বিদেয় করে দেবে।

'আচ্ছা, ওলিয়া, পুরোত্যের বিয়া দেয়া পছন্দ হবে তো তমার?' কোল্‌কা শুধোল।

'তমার ব্যাপারটা কী কও দেখি -- হজমের গোলমাল হয়েছে, নাকি? ভুলি গেছ নাকি যে আমি একজনা কম্‌সমোল?'

ঘটকদের আমি বললুম, 'বুঝলেন, পুরুত-টুরুত ওসব চলবে না। অন্য কিছু ভেবে বের করুন। আপনারা কাদের কাছে আসছেন সেটা তো মনে ছিল,

নাকি? এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হয় নি যে আমরা গির্জেয় গিয়ে বিয়ে দেয়াতে রাজি হব?'

সিলান্তি উঠে দাঁড়াল এবার। তারপর বক্তৃতার জন্যে তৈরি হয়ে একটা আঙুল তুলল।

কোল্কা শুধোল, 'কী, সিলান্তি, কিছু বলতে চাও?'

'ব্যাপারডা হল্য গে এই, এট্টা কথা শুধু আমার জিজ্ঞেসা করার আছে।'

'তা, জিজ্ঞেসা কর না কেন?'

'কুজ্মা, বোঝলে কিনা, যারে কয় কল্পনাবিলাসী। তা, ওসিপ ইভানভিচ আমাদেরে কও না ক্যানে, ওনারা পুরোত্য চাতিছেন কিসির জন্যি? এয়ার চাইতে তমরা এট্টা শুয়ররে খাওয়ায়ে মোটা করলি কাজে দিত।'

'চুলায় যাক পুরোত্যের দল!' স্তমুখা হেসে ফেলল। 'যখনই পথে অদেরে দেখি অমনে আমি ঘরে ফিরি আসি, অপয়া জীবডারে দেখলি আর শিকারে বার হই না।'

'অর্থাৎ, আর কেউ না, কুজ্মাই এই সমস্ত ফ্যাকড়া তোলতিছ।'

কুজ্মা পেত্রোভিচ হাসল। বলল:

'হি-হি। ব্যাপারডা মোট্টেও তা না! ব্যাপারখান হল্য গে এই, বোঝলে — আমাদের বাপ-ঠাকুন্দারা, তস্য বাপেরা এইভাবেই বিয়াসাদি কর্যেছেন। তাছাড়া পাভেল ইভানভিচ বল্যেছেন, আমরা কোনোরকম — ওরে কী কয় যেন — যৌতুক, হাঁ-হাঁ, যৌতুক ছাড়াই এট্টা গরিব মেয়্যারে ঘরে নিত্যেছি, এই সব হ্যানো-ত্যানো আর-কি...'

শুনে টেবিলের ওপর সজোরে ঘুসি মারল কালিনা ইভানভিচ।

চেঁচিয়ে বলল, 'এ-সকলের মানে কী? কী অধিকার আছে তমার এ-সকল কথা বলার? কে তুমি এমন ধনী লোক আসছ যে আমাগো সামনা বড়-বড় কথা বইল্যা চাল দিত্যাছ? তুমি কি মনে কর যে তুমি নিজে আর তমার পাভেল ইভানভিচ একখান কইর্যা মাটির কুঁড়্যা বানাইছ বইল্যা তমাগো চাল দিবার অধিকার জন্মাইছে? লোকটা — তমার ওই পরগাছাটা — বুঝি মনে করে যে ঘরে তার একখান টেবিল আর গোটা দুই বেঞ্চি আর সিন্দুকে একটা চামড়ার কোট আছে বইল্যা সে লাখোপতি বইন্যা গেছে, না?'

ভয় পেয়ে গিয়ে কুজ্মা পেত্রোভিচ এবার মিনমিন করে বলল:

'না-না, কী যে বলেন! চাল দিত্যেছে কে আবার? বলত্যে কী, আমরা শুধু যৌতুকের কথাই বল্যেছি, আর তো কিছু বলি নাই।'

'জানো, তমরা কোন দেশে বইস্যা আছ? এ হইল গিয়া সোভিয়েত সরকারের রাজত্বি। তুমি হয়তো জানো না যে সোভিয়েত সরকার কেমন হইতে পারে? সোভিয়েত সরকার এমন যৌতুক দিবার পারে যা দেইখ্যা তমার সক্কল পচা মড়া ঠাকুন্দা, যত্তো সব অপদাত্থরা, গোরের মধ্যি তিন পাক ডিগবাজি খাইয়া মরব-আনে!'

ফের একবার দুর্বলভাবে প্রতিবাদের প্রয়াস পেল কুজ্‌মা। বলল:

'আমরা তো শুধু...'

প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠে ছেলেরা কালিনা ইভানভিচের কথায় হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল।

এবার সত্যি-সত্যিই গরম হয়ে উঠল কালিনা ইভানভিচ।

বলল, 'আমি বলি কী, দলপতি-পরিষদ ব্যাপারটা ভালো কইর‍্যা ভাইব্যা দেখুক। ব্যাপারখান সমঝাইয়া দেখ! এয়ারা আমাগো কাছে বিয়ার প্রস্তাব লইয়া ঘটক হিসাবে আসছে, কিন্তু আমাগো খুব ভালো কইর‍্যা বিবেচনা করন লাগব যে আমাগো মাইয়া ওলিয়ারে আমরা এই নিকলায়েঙ্কোর মতন হাভাতের ঘরে দিবার পারি কিনা। মনে রাখন লাগব যে এয়ারা কোনোদিন আলু আর প্যাঁজির থেইক্যা ভালো খাদ্য চক্ষে দেখে নাই, অপদাত্থ বুড়া নিকলায়েঙ্কো জমিতে জোয়ারের বদলি ভেরেণ্ডা ফলায়। কিন্তু আমরা ধনী লোক, বিয়া দিবার আগে দশবার আমাগো ব্যাপারটা ভাইব্যা দেখন লাগব।'

কালিনা ইভানভিচের কথায় দলপতি-পরিষদের সদস্যদের ও উপস্থিত অন্য সকলকে খুশি হয়ে উঠতে দেখে বোঝা গেল যে সমাধান করার মতো আর কোনো সমস্যা বাকি নেই। অতঃপর কিছুক্ষণের জন্যে ঘটকদের অফিস-ঘরের বাইরে পাঠানো হল আর ওলিয়ার যৌতুকের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল দলপতি-পরিষদ।

ঘটকদের কথা শুনে ছেলেদের মনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটায় ঘা লেগেছিল। কাজেই তারা ওলিয়ার জন্যে এমন যৌতুকের ব্যবস্থা করলে যে-কোনো বিচারেই যাকে তাক-লাগানো বলা যেতে পারে। শেরেকে ডেকে পাঠানো হল। কারো-কারো মনে অবশ্য ভয় ছিল যে এতটা দানধ্যানের প্রস্তাব করলে তিনি হয়তো আপত্তি তুলে বসবেন। কিন্তু দেখা গেল ভাবনাচিন্তায়

বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না-করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী কাটখোট্টাভাবে শেরে বললেন:

'ঠিকই হয়েছে! আমাদের পক্ষে যতই কষ্টকর হোক না কেন, ভোরনভাকে ধনীর ঘরের কনে বানাতেই হবে। এ-জেলার মধ্যে সবচেয়ে ধনীর ঘরের কনে। এই কুলাকগুলোরে একটু সমঝে দেয়া দরকার।'

ফলে দেখা গেল যৌতুক নিয়ে আলোচনার সময়ে যা-কিছু ওজর-আপত্তি উঠল তা একমাত্র এই ধরনের। যেমন:

'ঘোড়ার বাচ্চা? কোনো মানে হয়? ওলিয়ারে ভালো এট্টা ঘোড়া দিতে লাগবে, বাচ্চাঘোড়া না!'

ঘটকরা ইতিমধ্যে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে মনের ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় ছিল। ঘণ্টাখানেক পরে পরিষদের সভায় ফের তাদের ডেকে পাঠানো হল। তারা এলে কোল্‌কা ভেরশ্‌নেভ টেবিলের ওধারে দাঁড়িয়ে উঠে অল্প-একটু তুত্‌লে যে-গুরুগম্ভীর বক্তৃতাটা দিল, তা এই:

'দলপতি-পরিষদের সব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল এই: ওলিয়ারে পাভেলের সাথে বিয়া দেয়া হবে। তবে পাভেলরে আলাদা একখান কুঁড়েয় উঠে আসুতি লাগবে আর ওর বাবারে তাঁর নিজির খামার থেকে যা-কিছু তিনি দিতি পারেন তা-ই ওরে দিতি লাগবে। তা বাদে, পাদ্রি-পুরোত চলবে না, 'জাগ্‌স'*-এ এসে বিয়া রেজিস্ট্রি করা লাগবে। বিয়ার পর প্রথম দিন উৎসব হবে এখেনে, তারপর আপনেদের যেমন খুশি উৎসব করতি পারেন। তা বাদে, নতুন একখান খামার চালু করা বাবদ ওলিয়ারে আমাদের তরফ থেকে দেয়া হবে —

'বাছুরসহ এট্টা সিমেন্‌থাল গোরু,

'বাচ্চাসহ এট্টা মাদী ঘোড়া,

'পাঁচটা ভেড়া,

'এট্টা ব্রিটিশ মাদী শুয়র...'

ওলিয়াকে আমাদের দেয় যৌতুকের বিরাট ফর্দখানা পড়তে-পড়তে কোল্‌কার গলা ধরে গেল একেবারে। এই ফর্দের মধ্যে ছিল চাষবাসের যন্ত্রপাতি, বীজ, পশুখাদ্যের সঞ্চয়, জামাকাপড়, পর্দা, বিছানার চাদর,

* জাগ্‌স — সরকারি রেজিস্ট্রেশন অফিস। — অনুঃ

আসবাবপত্র, এমন কি একটা সেলাই-কল পর্যন্ত। কোল্‌কা বক্তৃতা শেষ করল এই বলে:

'দরকার হলি সব্বদাই আমরা ওলিয়ারে সাহায্য করব, আর ওরা স্বামী-স্ত্রী বাধ্য থাকবে কলোনিরি সাহায্য করতি। দরকার পড়লি এখেনে আসতে হবে ওদেরে। এ বাদে পাভেলরে 'কলোনি-বাসিন্দা' খেতাব দেয়া হবে।'

ঘাবড়ে গিয়ে চোখ পিট্‌পিট করতে লাগল ঘটকরা। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজেদের অন্ত্যেষ্টির ক্রিয়াকর্মে সাহায্যের জন্যে তাদের ডাকা হয়েছে। কী ঠিক আর কী বেঠিক তা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা না-ঘামিয়ে মেয়েরা হাসতে-হাসতে ছুটে এল ঘটকদের জামার সঙ্গে তোয়ালে বেঁধে দেয়ার উদ্দেশ্যে, আর তোস্‌কার নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেরা ডিশের ওপর রুমালে-ঢাকা রুটি আর নুন তুলে দিল ঘটকদের হাতে। ঘাবড়ে গিয়ে আনাড়ির মতো ঘটকরা রুটিখানা নিল বটে কিন্তু সেটা নিয়ে যে কী করবে তা ভেবে পেল না। কুজ্‌মা পেত্রোভিচের বগলে-চাপা ডিশখানা টেনে নিয়ে তোস্‌কা খুশির সুরে বলে উঠল:

'এই, এই, করেন কী! এখানা দিয়ি দ্যান, নইলি আমারে আবার ঘানি-পেশাইওলার সাথে ঝামেলায় পড়তি হবে-নে। এখানা হল গিয়ি... ওরে কী কয় যেন?.. প্লেট।'

আমার অফিসের টেবিলের ওপর টেবিল-ঢাকা পেতে দিয়ে মেয়েরা তার ওপর তিন বোতল মিষ্টি লাল মদ আর ডজনখানেক গেলাস রেখে গেল। প্রত্যেকের জন্যে গেলাসে মদ ঢেলে নিজের গেলাসটা তুলে ধরে কালিনা ইভানভিচ বললে:

'মাইয়াটার বাড়বাড়ন্ত হউক আর মান্য কইর‍্যা চলুক!'

'মান্যি করব্যে কারে?' ওসিপ ইভানভিচ প্রশ্ন করল।

'কারে সে তো সক্কলেই জানে — দলপতি-পরিষদরে আর, সাধারণভাবে বলতে গেলে, সোভিয়েত সরকাররে।'

সকলে গেলাসে গেলাস ঠেকালুম আমরা, তরল পদার্থটা গলায় ঢেলে দিলুম, তারপর স্যাসেজসহ স্যান্ডউইচ খেতে লাগলুম।

অতঃপর কুজ্‌মা পেত্রোভিচ নিচু হয়ে অভিবাদন করলে। বললে:

'সবকিছু এমন সোন্দরভাবে বেবস্তা করার জন্যি অনেক ধন্যবাদ। এয়ার

অথ, আমরা গিয়ি এখন পাভেল ইভানভিচ আর ইয়েভ্‌দকিয়া স্তেপানভ্‌নারে অভিনন্দন জানাতি পারি।'

'তা, যাইতে পারেন — অভিনন্দন জানান গিয়া তাগো!' কালিনা ইভানভিচ বলল।

ওসিপ ইভানভিচ আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল।

'আপনেরা... ইয়ে... চমৎকার মানুষজন। আপনেদেরে হার মানাব্যে কে?'

চুপচাপ, ইশ্‌কুলের মেয়েদের মতো লাজুক-লাজুক ভাব করে ঘটক দু-জন অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের দিকে যাত্রা করল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পেছন থেকে ওদের চলে-যাওয়া দেখছিলুম আমরা। হঠাৎ খুশিতে চোখ দু'টো সরু-সরু করে অতৃপ্তির ভঙ্গিতে কাঁধঝাঁকানি দিল কালিনা ইভানভিচ। বলল:

'উঁহু, এয়া ঠিক হইল না! খড়ে-ঠাসা পেঁচার মতন চইল্যা যাইতেছে ওয়ারা! অ পেত্রো, এক দৌড় দিয়া অগো গিয়া ধর্‌ দেখি, অগো আমার ঘরে আসতে ক'। আর আন্তন, একঘণ্টার মধ্যি দুইটা ঘোড়ারে গাড়িতে জুইত্যা গাড়িখান আমার ঘরের সামনা লইয়া আয় দেখি।'

ফলে, আরও ঘণ্টাখানেক পরে ছেলেরা হাসতে-হাসতে ঘটক দু-জনকে গাড়িতে তুলে দিল। ঘটকদের জামার সঙ্গে তখনও তোয়ালে দু'টো বাঁধা থাকলেও চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলার ধরনসহ আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধির অন্যান্য বহু লক্ষণ তারা ইতিমধ্যে হারিয়ে বসেছিল। তবে কুজ্‌মা পেত্রোভিচ অবশ্য রুটিখানার কথা ভোলে নি, সেখানা সযত্নে বুকে চেপে ধরে রেখেছিল সে। বালিবিছনো পথের ওপর দিয়ে ভারি গাড়িখানাকে এমন অনায়াসে টেনে নিয়ে চলল 'মলদিয়েত্‌স' যে মনে হতে লাগল গাড়িখানা বুঝি পালকের মতো হালকা।

থুথু ফেলে কালিনা ইভানভিচ বলল:

'লোকটা — রক্তশোষাটা — ইচ্ছা কইর‍্যাই এই গরিব মানুষ দু'টারে পাঠাইছিল!'

'কে পাঠিয়েছিল?'

'কে আবার, নিকলায়েঙ্কো হারামজাদাটা! ও আমাগো এই কথাটা সমঝাইয়া দিবার চাইতাছিল যে যেমন তোমাগো কনে তেমনই আমার দুই ঘটক।'

সিলান্তি বলল, 'না, ঠিক তা না। ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে-নি!

যে-বিয়ায় পাদ্রি-পুরোত্য থাকে না তেমন বিয়ার সম্বন্ধ আনতি ঘটক হতি অনেকে রাজি হয় না। কিন্তু এয়ারা, এই গরিব মানুষ দু'ডা, পাদ্রি-পুরোত্যের ধার ধারে না! আর তাই বুড়া, ধুরন্ধর শিয়ালডা — কার কথা কতিছি বোঝতেই পারত্যেছ — সে এয়াদেরে কয়েল: গোড়ায় ভাবখান করবি এমন যেন পুরোত্য না-হলি চলব্যেই না, তবে অরা যদি রাজি না-হয় তাইলি পরে ওসব বায়নাক্কা ছাড়্যে দিস... ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে।'

অগস্ট মাসের মাঝামাঝি বিয়ের দিন ধার্য হল। এদিকে কলোনিতে ছেলেমেয়েরা নানা দলে ভাগ হয়ে প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিল। এ-উপলক্ষে একটা নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজনও সম্পূর্ণ হল। এসব কাজে কত যে অসুবিধে দেখা দিতে লাগল তার ঠিক নেই, খরচান্ত হল আরও বেশি। ফলে মেজাজ না-বিগড়ে কালিনা ইভানভিচ থাকতে পারল না।

বলল, 'আন্তন সেমিওনভিচ, আমাগো সব কয়টা মাইয়্যাগো যদি এইভাবে বিয়া দেওন লাগে তাইলে পোলা কয়টারে আর আমারে — এই বুড়া মানুষটারে — দোরে-দোরে ভিক্ষা মাঙতে হাতে মালা দিয়া পাঠাইয়া দ্যাও-না ক্যান... কিন্তু বুঝি তো সব, কীই বা করন যায়...'

বিয়ের দিন গোটা কলোনি-এলাকা শান্ত্রী দিয়ে ঘিরে রাখা হল — পাহারার এই কাজের জন্যে নিয়োগ করতে হল পুরো দু'টো বাহিনী। তার আগে রীতিমতো ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করা হয়েছিল। এইভাবে জন্য সত্তরের মতো লোককে নেমন্তন্ন করা হল। নিমন্ত্রণ-পত্রের বয়ানটা ছিল এইরকম:

> 'কলোনি হইতে কলোনি-বাসিন্দা ওলিয়া ভোরনভার বিদায় ও কমরেড পাভেল পাভ্লভিচ নিকলায়েঙ্কোর সহিত তাহার শুভ পরিণয় নিষ্পন্ন হওয়া উপলক্ষে নব-দম্পতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে মাক্সিম গোর্কি শ্রম-কলোনির দলপতি-পরিষদ আপনাকে উৎসবের ভোজের আসরে ও পরবর্তী নাট্যাভিনয় প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছে।
>
> **দলপতি-পরিষদ।'**

সেদিন দুপুর দু'টোর মধ্যে কলোনিতে আমরা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলুম। বাগানে ফোয়ারাটার চারপাশ ঘিরে ভোজের টেবিলগুলো পাতা

হয়েছিল। জায়গাটা সাজানোর কৃতিত্ব ছিল জিনোভি ইভানভিচের শিল্পী-গোষ্ঠীটির। সেখানে সরু-সরু খুঁটির মাথায় বার্চগাছের ডালপাতা-দিয়ে-তৈরি মালা বুদ্ধি খাটিয়ে টাঙানো হয়েছিল ভারি সুন্দরভাবে। আমাদের সেই ছাদহীন খোলা-হাওয়ার খাবার ঘরের চারপাশ ঘিরে খুঁটিগুলো মাটিতে পোঁতা হয়েছিল। খুঁটির ডগায় ঝোলানো মালাগুলো বাইরের যারা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তাদের কারো কিন্তু একবারের তরেও মনে হয় নি যে মালাগুলো ওইভাবে ঝোলাতে ছেলেদের কতখানি বেগ পেতে হয়েছে। এছাড়া টেবিলগুলোর ওপর রাখা হয়েছিল ফুলদানি ভরে-ভরে শাদা গোলাপের স্তবক — বা শেরের 'তুষার-রানী'দের।

কলোনি যে ইতিমধ্যে কতখানি বেড়ে উঠেছিল এবং বাইরের চেহারার দিক থেকেও যে কতটা উন্নতি ঘটেছিল তার ওইদিন তা সবচেয়ে ভালো আর অকাট্যভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাগানের বালিঢালা চওড়া-চওড়া রাস্তা ঢালুজমিতে থাককাটা ফলবাগানের সবুজের সমারোহ আরও প্রকট করে ফুটিয়ে তুলেছিল। ওই সব বাগানের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি গুচ্ছ ঝোপঝাড়, ফুলবাগানে ফুলগাছের প্রত্যেকটি সারি ঠিক কোথায় কোনটি বসবে বা থাকবে রাতের স্তব্ধতায় জেগে বসে তা স্থির করা হয়েছিল আগে থাকতে। তাদের প্রত্যেকটির পেছনে ছিল মিশ্র বাহিনীগুলির জলসেচনের কঠিন শ্রম, আমাদের পুরো যৌথ সংস্থার যত্ন ও স্নেহ দিয়ে যেন সত্যিকার দামী পাথরে সাজিয়ে তাদের সুন্দর করে তোলা হয়েছিল। নদীর পাড়ের উঁচুনিচু জমিগুলোকে বশ মানানো হয়েছিল কড়া অথচ স্নেহশীল হাতের শাসনে: সেখানে কোথাও-বা ছিল একসার কাঠের সিঁড়ি, কোথাও বার্চের ডালপালায় তৈরি রেলিঙ, কোথাও পাতা আয়তক্ষেত্রাকার ফুলের গালচে আর সরু-সরু আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ, আবার কোথাও বালি-ছড়ানো বাঁধের রাস্তা। আর এ-সবই ছিল প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আরও কিছু অতিরিক্ত প্রমাণ, তা সে মানুষ আমাদের মতো মানবজাতির খালি-পা দরিদ্র প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও। এছাড়া এই খালি-পা মাণবক-প্রভুর বাসস্থলের ঢালাও আঙিনাগুলোয় প্রাক্তন মানবসমাজের এই পরিত্যক্ত শিশুদল সত্যিকার শিল্পীর হাতে অতীতের গভীর ক্ষতচিহ্নগুলিকে নিরাময় করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। আগের বছরের সেই কোন শরৎকালে কলোনি-বাসিন্দারা ওই সব উঠোনে শ-দুই গোলাপ-চারা পুঁতেছিল, আর কত-যে অগুন্তি অ্যাস্টর, কারনেশন,

স্টক, সিঁদুর-রঙা জেরেনিয়ম, নীল ক্যান্টারবেরি বেল আর আরও কত অজানা, নাম-না-জানা মরশুমি ফুলের বীজ আর চারা পুঁতেছিল তার ইয়ত্তা ছিল না। প্রতিটি বাড়ির সংলগ্ন এই সব উঠোন ঘিরে তৈরি করেছিল তারা বহু পাকা রাস্তা। বিভিন্ন বাড়ি আর তাদের সংলগ্ন জমিগুলোর মধ্যে যোগাযোগের শড়ক ছিল এগুলো। এছাড়া ফাঁকা জমিগুলোয় চৌকো বা তেকোনা কেয়ারি তৈরি করে সেখানে জোয়ারী ঘাস বুনে পতিত জমিকেও তাজা আর জীবন্ত করে তুলেছিল, আর এখানে-ওখানে বসিয়ে দিয়েছিল বাগানে বসার সবুজ বেঞ্চি।

কলোনিতে সবকিছুই হয়ে উঠেছিল সুখকর, আরামপ্রদ, সুন্দর আর যুক্তিবুদ্ধিসম্মত। আর এসব দেখে আমাদের এই গ্রহের সৌন্দর্য-বিধানে আমারও কিছুটা হাত আছে ভেবে আমি গর্ববোধ করছিলুম। তবে এছাড়া আমার নিজস্ব কিছু নন্দনতাত্ত্বিক খেয়ালিপনাও পেয়ে বসেছিল আমাকে। ফুলের কেয়ারি, পথঘাট, ছায়াঢাকা নিভৃত কোণ কোনো-কিছুই এক মুহূর্তের জন্যেও ঘোর নীলরঙের খাটো প্যান্ট আর শাদা শার্ট-পরা আমাদের ছেলেদের দিক থেকে আমার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দিতে সমর্থ হয় নি। সেদিনও দেখছিলুম আমি — ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ছেলেরা, ধীরপায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অতিথিদের মধ্যে, টেবিলগুলোর চারপাশে ব্যস্ত থাকছে পরিবেশনে আর নিজের-নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় পাহারায় দাঁড়িয়ে শয়ে-শয়ে যে-সমস্ত নিষ্কর্মা লোক এই অস্বাভাবিক বিয়ের দৃশ্য হাঁ-করে দেখার জন্যে জড় হয়েছিল তাদের তফাতে রাখছে। এরা ছিল সেই ছেলে, সেই সব গোর্কিপন্থী! সৌষ্ঠবপূর্ণ আর সুগঠিত, চমৎকার নমনীয় চেহারার সব ছেলে, অযথা-ওষুধের দাক্ষিণ্যবঞ্চিত পেশল স্বাস্থ্যবান যাদের দেহ আর টুকটুকে লাল ঠোঁট আর তরতাজা মুখাবয়ব যাদের। অমনধারা সব মুখ ছিল আমাদের কলোনিরই দান — শহরের রাস্তা থেকে অমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব নিয়ে কলোনিতে আসে নি ছেলেরা।

এই ছেলেদের প্রত্যেকের জীবনে অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট পথ ছিল, অগ্রগতির বাঁধা পথ ছিল গোর্কি কলোনিরও। তখনও পর্যন্ত এই সব বিচিত্র পথের শুধু সূত্রপাতটুকুই আমার নজরে পড়ছিল, আর কী কঠিনই-না ছিল কুয়াশায় অস্বচ্ছ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাদের লক্ষ্য, তাদের গতিপথ আর তাদের পরিণতি ঠাহর করে দেখা। এই কুয়াশায় ঘুরপাক খেয়ে চলেছিল এমন অনেক

কিছু উপাদান যা তখনও পর্যন্ত মানুষ জয় করতে পারে নি, যা নাকি ছিল পরিকল্পনা আর গণিতশাস্ত্রের আয়ত্তের বাইরে। আর এই সব উপাদানের মধ্যে পথ করে অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন ছিল আমাদেরই নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব। তাই ফুল আর সাজানো বাগানের নন্দনতত্ত্ব আমার মনোহরণে আর সমর্থ ছিল না।

হয়তো এসব দেখেশুনেই মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না একসময় এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন:

'ব্যাপার কী, পিতৃদেব? কী নিয়ে একা-একা এমন মনখারাপ করে রয়েছেন?'

'সকলেই — এমন কি আপনিও -- যখন আমায় ত্যাগ করেছেন, তখন মনখারাপ না-করে করি কী বলুন?'

'আরে, আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে আমি তো সুখীই হই। আপনাকেই খুঁজছিলুম আমি, আপনাকে বাদ দিয়ে বিয়ের উপহার দেখার ইচ্ছে নেই আমার। চলুন, যাওয়া যাক!'

ওলিয়ার যাবতীয় প্রাপ্য সম্পত্তি এনে জড় করা হয়েছিল দু'টো ক্লাসরুমে। অতিথিরা ভিড় জমিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল সবকিছু। অসন্তুষ্ট, ঈর্ষাকাতর গ্রাম্য মেয়েরা ঠোঁট বেঁকিয়েই ছিল আর ক্রুদ্ধ মনোযোগে আমাকে লক্ষ্য করে দেখছিল। কী কান্ড! আমাদের কলোনির মেয়েদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ছেলেদের তারা বিয়ে দিয়েছিল অন্য যতসব খামারখোলার মেয়েদের সঙ্গে, আর এখন কিনা দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে পয়সাওলা কনেরা তাদের একেবারে হাতের কাছেই ছিল। সত্যি, স্বীকার করলুম, আমার ওপর তাদের রাগ হবারই কথা!

বোকভা বললেন, 'এখন যদি দলে-দলে ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় তো কী করবেন আপনি!'

জবাব দিলুম, 'সে ভয় করি না। আমাদের মেয়েরা পছন্দের ব্যাপারে ভারি হুঁশিয়ার।'

এমন সময় একটি বাচ্চা ছেলে ছুটে এল। একেবারে দিশাহারা হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল:

'ওরা আসত্যেছে!'

উঠোনে ইতিমধ্যেই সর্বসাধারণের সভা ডাকার বিউগ্‌ল-সংকেত বেজে

চলেছিল। দেউড়ির নিচে আনুষ্ঠানিক রীতি অনুযায়ী কলোনি-বাসিন্দাদের একটা সারি আর এক-প্ল্যাটুন ড্রাম-বাদক পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল টানটান হয়ে। ময়দা-কলের ওধার থেকে মোড় নিয়ে এমন সময় আমাদের নব-দম্পতির গাড়িখানা আসতে দেখা গেল। লাল ফিতে দিয়ে ঘোড়া দু'টোকে সাজানো, কোচবাক্সে-বসা ব্রাত্‌চেঙ্কোর হাতেও লাল ফিতে বাঁধা। তরুণ দম্পতিকে আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন জানালুম আমরা। রাশ টেনে গাড়ি রুখল আন্তন। গাড়ি থেকে নেমে আনন্দে ওলিয়া আমার গলা জড়িয়ে ধরল। উত্তেজিত হয়ে হাসিকান্না-মেশানো গলায় বলল:

'আমারে ভুলে যাবেন না যেন — বড্ড ভয় লাগতেছে আমার!'

এরপর সংক্ষিপ্ত একটা সভার অনুষ্ঠান হল। জনশিক্ষা-দপ্তরের নামে তরুণ দম্পতিকে কৃষিবিদ্যার বিষয়ে প্রায় এক-লাইব্রেরি বই উপহার দিয়ে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না যেমন তাক লাগিয়ে দিলেন তেমনই অভিভূত করলেন আমায়। ওঁর পিছুপিছু দু'টি ছেলে ফুল-দিয়ে-সাজানো কয়েকখানা তক্তা জুড়ে তার ওপর মস্ত বড় একবোঝা বই বয়ে নিয়ে এল।

সভার অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রথমে তরুণ দম্পতিকে আমরা পতাকার নিচে দাঁড় করালুম, তারপর পুরোদস্তুর কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে সার বেঁধে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলুম ভোজের টেবিলে। তাদের জন্যে সম্মানের আসন আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল। পতাকাধারীরা পতাকা নিয়ে ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কলোনির একজন মনিটর রক্ষীদের পালাবদল করাল। তুষার-শাদা আলখাল্লা-পরনে জনা কুড়ি কলোনি-বাসিন্দা খাবার পরিবেশনে লেগে গেল এবার। ওদিকে তারানেত্‌সের অধীনে বিশেষ মিশ্র বাহিনী অতিথিদের পকেটের দিকে সতর্ক চোখ রাখতে লাগল আর হাতসাফাইয়ের কৌশল ও গৃহকর্তাসুলভ সৌজন্যের কী-এক অলৌকিক সংমিশ্রণে যেন পকেটগুলো থেকে বোতল কয়েক সামগোন হস্তগত করে ফেলে নিঃশব্দে তা কলমাকের জলে বিসর্জন দিয়ে এল।

ভোজের টেবিলে নব-দম্পতির একপাশে বসলুম আমি, অপর পাশে বসলেন পাভেল ইভানভিচ ও ইয়েভ্‌দাকিয়া স্তেপানভ্‌না। সন্ত নিকলাসের মতো ছুঁচলো ছোট্ট দাড়িওয়ালা কড়া মেজাজের পাভেল ইভানভিচ বসে-বসে খালি সজোরে ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন। কে জানে, হয়তো ছেলে তাঁর এবার স্বনির্ভর হতে চলেছে এই ভেবে বিরক্ত হয়ে, কিংবা তার অল্প কিছুক্ষণ

আগে তাঁর পকেট থেকে হাতসাফাই করে সামগোনের বোতল সরিয়ে ফেলে তারানেত্‌স যে-বিয়ারের বোতলটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার দিকে তাকাতে পারছিলেন না বলেই হয়তো।

কলোনি-বাসিন্দা ছেলেমেয়েদের ভারি আশ্চর্য ঠেকছিল সেদিন। ওদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার আশ মিটছিল না। ওদের আচরণে ছিল প্রাণচঞ্চলতা, খোশমেজাজ, শোভনতা আর ওদের নিজস্ব ধরনে এক-আধটুকু ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ। এমন কি টেবিলের অপর প্রান্তে মাতব্বরি করছিল যে একাদশ বাহিনী তারাও তাদের তত্ত্বাবধানের অধীন জনা পাঁচেক অতিথিকে ব্যস্ত রাখছিল দীর্ঘ প্রাণবন্ত আলাপে। বাচ্চারা বোধহয় একটু বেশি মন খুলে কথা বলছে এই ভেবে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম। তাই ব্যাপারটা সরেজমিনে পরীক্ষা করতে গেলুম। শেলাপুতিনের ছিল তখনও বাচ্চাসুলভ রিন্‌রিনে গলা। দেখলুম সে কোজিরের গেলাসে বিয়ার ঢেলে দিতে-দিতে বলছে:

'আপনার তো গির্জায় গির্য়ি বিয়া হয়েছিল, তা দেখেন তার ফল কত খারাপ হয়েছে!'

'তাইলে আপনার আবার বিয়া দেয়া যাক!' তোস্‌কা বুদ্ধি বাতলাল।

কোজির হাসল। বলল:

'ফের বিয়া করার পক্ষি বড্ড দেরি হয়্যে গেছে আমার, বোঝলা খোকারা।'

নিজের গায়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে বিয়ারটুকু খেয়ে ফেলল সে। দেখে তোস্‌কা হেসে উঠল। বলল:

'আপনের এখন পেটব্যথা শুরু হয়ে যাবে-নে...'

'হায়-হায়, ভগমান না করেন! কিন্তু ক্যানে, কও দেখি?'

'নিজির গায়ে আপনে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন যে বড়?'

ওর পাশে বসে ছিল একজন গ্রামবাসী, জটপাকানো শণের রঙের একমুখ দাড়ি নিয়ে। লোকটি ছিল পাভেল ইভানভিচের আমন্ত্রিত অতিথি। তার আগে আর কখনও সে কলোনিতে আসে নি, তাই যা দেখছিল তাতেই তার তাক লেগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল:

'আচ্ছা, খোকারা, এয়া কি সত্যি যে তমরাই এখেনকার কত্তাব্যেক্তি?'

'নিশ্চয়, আমরাই তো কত্তা!' শুর্‌কা জবাব দিল।

'তা, তমরা জমিজিরেত আবাদ করতি চাও কিসির জন্যি?'

তোস্‌কা সলভিয়েভ এবার এক-ঝটকায় গোটা দেহটা লোকটির দিকে ফিরিয়ে বসল। বলল:

'কিসের জন্যি জানেন না বুঝি? জমি চাষ না করলি আমাদেরে খামার-খোলার জনমজুর বনতি হোত, আর এখন আমাদেরে তা আর হতি হবে না।'

'তাইলি তমরা কী হতি চাও?'

'কী হতি চাই? শোনবেন?' হাতে মাংসর পিঠেখানা দুলিয়ে তোস্‌কা বলল। 'আমি হতি যাচ্ছি এঞ্জিনিয়র — আন্তন সেমিওনভিচও বলেছেন আমি এঞ্জিনিয়র হব, আর শেলাপুতিন হতি যাচ্ছে পাইলট।'

কথাটা বলে বন্ধু শেলাপুতিনের দিকে কিছুটা ব্যঙ্গভরে তাকাল সে। কেননা শেলাপুতিন যে ভবিষ্যতে পাইলট হবেই সেটা নাকি তখনও পর্যন্ত কলোনিতে কেউ মেনে নেয় নি। উৎসাহভরে মুখের খাবারটা চিবোতে-চিবোতে শেলাপুতিন কিন্তু জবাব দিল:

'হুঁ, হবই তো, পাইলটই তো হব আমি।'

'তা, জমি আবাদ করার দশাডা কী দাঁড়াব্যে তাইলি? তমাদের কেউ কি জমি চাষ করতি চাও না একবারে?'

'নিশ্চয়, চাই বৈকি! আমাদের মধ্যি কেউ-কেউ চায়। কিন্তু আমাদের ছেলেরা আপনেদের থেকে অন্যরকম চাষী হবে, এই আর-কি,' প্রশ্নকর্তার দিকে চট করে এক-নজর তাকিয়ে নিয়ে জবাব দিল তোস্‌কা।

'সত্যি? তা, ভেন্নরকম বলতি কী বোঝাতি চাও?'

'আমি বোঝাতে চাই যে আমরা হব অন্যরকম। আমাদের অনেক ট্রাক্টর থাকবে। আপনে কোনোদিন ট্রাক্টর দেখেছেন?'

'না। দেখ্যেছি যে তা কতি পারি না।'

'আমরা কিন্তু দেখেছি। ওই যে একটা সভ্‌খোজ আছে না — একবার সেখেনে আমরা কয়টা মাদী শুয়র নিয়ি গেছলাম। ওদের একটা ট্রাক্টর আছে — একদম গুবরে-পোকার মতন দেখতি...'

অতিথিদের লম্বা সারির ফাঁকে-ফাঁকে যোগসূত্র রক্ষা করছিল আমাদের বাহিনীগুলো। দূর থেকে প্রতিটি বাহিনীর অবস্থান সহজেই ধরতে পারছিলুম আমি, আর গোলমাল থেকে তাদের কেন্দ্রস্থল যে কোথায় তাও টের পাচ্ছিলুম। নবম বাহিনী যেখানে ছিল আমোদ-আহ্লাদ সবচেয়ে জমে উঠেছিল সেখানেই।

কারণ সেখানে ছিল লাপত, আর তাকে ঘিরে কলোনি-বাসিন্দারা আর অতিথিরা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, হাসির দমকে আর্তনাদ করছিল প্রায়। বন্ধু তারানেত্সের সঙ্গে মিলে লাপত নিজে সেখানে ময়দা-কলের প্রধান-প্রধান কর্মকর্তার জন্যে এক রকমারি ধোঁকার টাটি খুলে বসেছিল। লাপতের বিশেষ নির্দেশক্রমে ওই সব কর্মকর্তাকে তার তত্ত্বাবধানে নবম বাহিনীর সঙ্গে এক টেবিলে বসানো হয়েছিল। কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ময়দা-কলের ঘানি-ঘোরানেওয়ালা দশাসই, থপথপে মোটা লোকটি, রোগা, হাড়-বের-করা খাজাঞ্চি আর মেকানিক -- অত্যন্ত শাদামাটা এক ব্যক্তি। এককালে তারানেত্স ছিল নিপুণ পকেটমার, তাই ঘানি-চালকের পকেট থেকে সামগোনের বোতলটা হাতসাফাই করে বের করে নিয়ে সেই জায়গায় কলমাকের জলে-ভর্তি আরেকটা বোতল নিঃসাড়ে রেখে দেয়া তার কাছে ছিল ছেলেখেলার সামিল।

ঘানি-চালক আর খাজাঞ্চি অনেকক্ষণ ধরেই লজ্জা-লজ্জা ভাব করে টেবিলে বসে ছিল আর থেকে-থেকে তারানেত্সের মিশ্র বাহিনীর দিকে চোরাচোখে তাকাচ্ছিল। কিন্তু লাপত চোখ টিপে সান্ত্বনা দেয়ার ছলে তাদের বলছিল:

'আপনেরা হলেন গিয়ি আমাদের নিজির লোক। কিছছু ভাববেন না, আমি সব ব্যবস্থা করি দেব-নে!'

এক সময়ে তারানেত্স যখন ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার মাথাটা টেনে নিচে নামিয়ে কানে-কানে কী যেন বললে লাপত। শুনে তারানেত্স ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

অতঃপর চুপিচুপি ওদের পরামর্শ দিল লাপত, 'আপনেরা টেবিলের নিচি একেক গেলাস করি ঢেলে নেন না কেন। আর তারপর সামান্য এট্টু বিয়ার ঢেলে রঙ করে নেন। তাইলি সব ঠিক হয়ে যাবে-নে।'

টেবিলের নিচে কিছু সার্কাসের কৌশল অবলম্বনের পর মদ্যপিপাসুদের হাতের কাছে এরপর একেক গ্লাস সন্দেহজনক ফ্যাকাশেরঙের বিয়ার দেখা গেল। আর গ্লাসগুলোর সুখী মালিকরা চুপচাপ তাকিয়ে-থাকা নবম বাহিনীর মনোযোগী দৃষ্টির সামনে কেমন-যেন ঘাবড়ে গিয়ে নিজের-নিজের মদের চাট তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে সবকিছু তৈরি হয়ে গেলে ঘানি-চালক লাপতের দিকে ধূর্তামিভরা চোখ টিপে মদের গ্লাসটা নিজের দাড়ি অবধি তুলল। খাজাঞ্চি আর মেকানিক তখনও সতর্কভাবে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছিল, কিন্তু দেখা গেল সবাই বেশ চুপচাপ আছে। পপ্লারের একটা গুঁড়ির গায়ে

হেলান দিয়ে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারানেত্‌সও। লাপতকে কেবল একসময়ে চোখ নামিয়ে চোখের কোণে হঠাৎ-জাগা একটা ঝিলিক লুকোতে দেখা গেল।

ঘানি-চালক ফিস্‌ফিস করে বললে, 'তা, সবার মঙ্গলের জন্যি একপাত্তর হোক!'

গোটা নবম বাহিনীর ছেলেরা মাথা হেঁট করে তাদের তিন অতিথিকে কয়েক ঢোকে গেলাস সাবাড় করতে দেখলে। শেষের কয়েকটা ঢোক গেলার সময় মদ্যপায়ীদের মধ্যে কেমন-যেন একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব লক্ষ্য করা গেল। ঘানি-চালক খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে সন্দেহের চোখে এক-লহমা লাপতের দিকে তাকাল। কিন্তু দেখা গেল অন্যমনস্কভাবে লাপত কী যেন চিবোচ্ছে, মনে হল তার মনটা যেন তখন অনেক দূরে। ওদিকে খাজাঞ্চি আর মেকানিক প্রাণপণে এমন ভাব দেখানোর চেষ্টা করতে লাগল যেন তেমন বিশেষ কিছুই হয় নি। এমন কি কাঁটা দিয়ে প্লেট থেকে চাটের মাংস পর্যন্ত তোলার ভান করতে লাগল তারা।

অভিজ্ঞ ঘানি-চালক টেবিলের নিচে হাত নামিয়ে নিজের বোতলটা পরীক্ষা করতে গেলে কে যেন আস্তে তার হাত ধরে টান দিল। মাথা তুলতেই সে দেখতে পেল তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে তারানেত্‌সের ধৃষ্ট, বসন্তের দাগওয়ালা মুখখানা।

'ছি-ছি, লজ্জার কথা!' তারানেত্‌স বলল। মুখখানা তার সত্যি-সত্যিই রাগে লাল হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। 'আপনেদের-না বলা হয়েছিল যে এখেনে সামগোন না আনতি? আর আপনি... আমাদের নিজির লোক হয়েও কিনা? দ্যাখেন দেখি — আপনে নিজি সামগোন খেতেছেন! আর-কাউরে খেতি দেখেছেন আপনে?'

ঘাবড়ে গিয়ে ঘানি-চালক বললে, 'কী যে খালাম তা শয়তানই জানে! আমরা যে কিছু খায়েছি, তা মোটে বোঝতিই পারলাম না।'

'বুঝতে পারলেন না? বটে? কথা যা বললেন-না একখান! আসেন দেখি, শ্বাস ফেলেন তো একবার! আপনে মোটেও বুঝতে পারলেন না, তাই না? কিন্তু গন্ধ যা ছাড়তেছেন তা তো এক-পিপা সামগোনের সমান! ছি-ছি, কী লজ্জা — ওই জিনিস আপনে কলোনিতি নিয়ে এসেছেন!..'

'কী, এত গোরগোল কিসের লেগ্যে?' দূর থেকে কালিনা ইভানভিচ জিজ্ঞাসা করল।

'কিসির আবার, সামগোনের!' বোতলটা তুলে ধরে সকলকে দেখিয়ে দিল তারানেত্‌স।

ঘানি-চালকের দিকে রক্ত-জল-করা চোখে এবার তাকাল কালিনা ইভানভিচ। অনেকক্ষণ ধরেই গোটা নবম বাহিনী হাসতে-হাসতে ভিরমি খাবার যোগাড় হচ্ছিল, সন্দেহ নেই লাপত তাদের গালাতেঙ্কো সম্বন্ধে কোনো মজার কথা বলছিল বলেই। টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে বসে ছিল ছেলেরা — রসিকতার এত বেগ আর তাদের সহ্য হচ্ছিল না।

আমোদ-আহ্লাদের এমন বন্যা বইছিল ওই জায়গাটায় যে ভোজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তার জের চলল। এর একটা কারণ ছিল এই যে লাপত থেকে-থেকেই ঘানি-চালককে জিজ্ঞাসা করছিল:

'সামগোন চাখা যথেষ্ট হয় নাই বুঝি? আর কিছুটা বাকি নাই আপনের কাছে? খুব খারাপ!.. তা জিনিসটা খাতি লাগল কেমন? তেমন ভালো না?.. খুবই দুঃখের কথা যে ফিওদর বাধা দিল আপনেরে! আচ্ছা, ফিওদর, তোর কী বুদ্ধি বল্‌ তো? ওনাদেরে ছেড়ে দিতি পারলি না? হাজার হোক, ওনারা হলেন গিয়ি আমাদের আপন জন!'

'দূর, তা কী হয়!' গম্ভীরভাবে বলল তারানেত্‌স। 'ওনাদের দিকি তাকায়ে দ্যাখ দেখি একবার — চেয়ারে বসে থাকতি পারতেছেন না বলে।'

লাপতের মজাদার কর্মসূচি শেষ হয় নি তখনও। অনেক কাকুতিমিনতি করে ঘানি-চালককে টেবিলের ওধারে দাঁড় করাল ও, আর তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস করে সারাক্ষণ জপতে লাগল:

'আসেন, আপনেরে আমরা বাগিচার আড়াল দিয়ি বার করি নিয়ে যাব — লোকে আপনেরে লক্ষ্য করতেছে... দেখতেছেন তো?'

কারাবানভের অষ্টম বাহিনী ওইদিন শান্ত্রী হিসেবে পাহারায় ছিল, কিন্তু কারাবানভ নিজে প্রায়ই টেবিলগুলোর ধারেকাছে ঘুরঘুর করছিল। বিশেষ করে সেই জায়গাটায় বারে বারে আসছিল সে অমন একটা অসাধারণ ধরনের বিয়ে সংঘটিত হওয়ার ফলে দার্শনিক নানা তর্কবিতর্ক যেখানে সবচেয়ে বেশি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। জায়গাটায় গুলতানি করছিল কভাল, স্পিরিদোন,

কালিনা ইভানভিচ, জাদোরভ, ভের্শ্নেভ, ভোলিখভ আর লাল ছাগলদাড়িসহ লুনাচার্স্কি কমিউনের চেয়ারম্যান বিজ্ঞ নেস্তেরেঙ্কো।

নদীর ওপারের এই কমিউনটিতে তখন সবকিছু ঠিকমতো চলছিল না। জমি চাষ করায় ওরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারে নি, কাজকর্ম এবং সুযোগসুবিধে দানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ও তাদের যথাযথ পরিবেশনে অসমর্থ হয়েছিল, বিদ্রোহী ক্ষিপ্ত মেয়েদের বাগে আনতে পারে নি এবং কমিউনের সদস্যদের মধ্যে বর্তমানের ব্যাপারে ধৈর্য ও ভবিষ্যতে আস্থার সঞ্চার ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। সবকিছু বলার পর উপসংহার টানলেন নেস্তেরেঙ্কো করুণভাবে এই কথা বলে:

'আমাদের নূতন ধরনের মানুষ সংগ্রহ করতি হবে... কিন্তু এমন সব নূতন মানুষ পাই কোথায়?'

'কথাটা এভাবে কওন ঠিক হইতাছে না, কমরেড নেস্তেরেঙ্কো,' কথার মধ্যে বাধা দিয়ে উৎসাহভরে বলল কালিনা ইভানভিচ। 'এভাবে কওন ঠিক না, বোঝলেন! এই নূতন মানুষজন — অপদাত্থগুলা — কোনোকিছুই ঠিকমতন করতে জানে না। আপনের উচিত আরও বেশি কইর‍্যা পুরান লোকজন সংগ্রহ করা!..'

টেবিলগুলোয় হট্টগোল ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। আমাদের নিজেদের ফলানো আপেল আর নাশপাতি আনা হল টেবিলে আর দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতে থাকল আইসক্রিমের পিপেগুলো। আইসক্রিম তৈরি ছিল আমাদের ওইদিনের ডিউটির ভারপ্রাপ্ত দলের গর্বের বস্তু।

আর তারপর হঠাৎই একসময় বাড়ির পেছন থেকে অ্যাকর্ডিয়নের ফ্যাঁসফ্যাঁস আওয়াজ আর গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের ইনিয়ে-বিনিয়ে উ'চু গলায় গান গাওয়া — বিয়ের আসরের প্রথাসিদ্ধ একটা অভিশাপ হিসেবে আকাশ-বাতাস ভরে তুলল। দেখা গেল, জনা পাঁচ-ছয় স্ত্রীলোক ঝাপসা-চোখো, অল্প-মাতাল এক অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ের আগে-আগে ঘুরঘুর করে নাচতে-নাচতে আর পা দাপাতে-দাপাতে আস্তে-আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারানেত্স বলল, 'ওরা যৌতুকের দখল নিতি এসেছে।'

মুখে রক্ত-ফেটে-বেরনো, শুকনো চেহারার একটি স্ত্রীলোক মনে হল যেন বিশেষ করে আমারই উদ্দেশ্যে পা দাপিয়ে এগোচ্ছে। স্ত্রীলোকটি তার

কনুই দু'টো খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে দু-দিকে ছুড়ছিল আর প্রকাণ্ড জ্যাবড়া বুটজোড়া মাটিতে ঠুকে খুঁড়ে-খুঁড়ে বালি ওড়াচ্ছিল। গাইছিল:

'বাপধন গো, অ বাপধন। মদ নাও দ্যাও কন্যেদান। কন্যেমনি সাজায়ো দ্যাও...' ইত্যাদি।

আর কোত্থেকে যেন আচমকা তার হাতে এসে গেল সামগোনের একটা বোতল আর কেন যেন বাদামি রঙের পলতোলা একটা কাচের গেলাস। মাতালের বেপরোয়া ভঙ্গিতে স্ত্রীলোকটি গেলাসে মদ ঢালল আর ঢালতে গিয়ে বেশ খানিকটা মদ নিজের পোশাকে আর মাটিতে ফেলল। এমন সময় তারানেত্‌স এসে তার আর আমার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে গেল।

বলল, 'থাক, হয়েছে।'

বোতল আর গেলাসটা স্ত্রীলোকটির হাত থেকে সহজেই হস্তগত করে ফেলল সে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে আমার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গিয়ে মাতালের উল্লাস নিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওলিয়ার ওপর।

'ওল্‌গা পেত্রোভ্‌না, ও আমাদের মিষ্টি কনে! এডা কী করেছ তুমি? আর তো তুমি পিঠের উপরি বিনুনি ঝোলাত্যে পার না!.. আসচে কাল আমরা ঘোমটা দিয়ি তোমার মাথামুড় ঢাক্যে দেব-নে। ব্যাস, আর সবার মতন তুমিও এয়োস্তিরি হয়ি যাবা-নে।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত রকম কঠোর সুরে ওলিয়া বলে উঠল, 'আমি কিছুতি ঘোমটায় মাথা ঢাকব না!'

'ঢাকব্যে না? মাথা ঢাকব্যে না? বিনুনি ঝোলায়্যে বেড়াবে?'

'হ্যাঁ, বেড়াব!'

শুনে সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টি স্ত্রীলোক চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে আর কিচিরমিচির করতে-করতে ওলিয়াকে ছেঁকে ধরল। ক্ষিপ্ত, উত্ত্যক্ত ভোলখভ ধাক্কা দিয়ে তাদের সরিয়ে দিতে লাগল, তারপর তাদের শিরোমণি সেই স্ত্রীলোকটিকে খোলাখুলি শুধোল:

'ও যদি মাথায় ঘোমটা না দেয় তাইলি হবেটা কী?'

'না দিতি চায় তো না দিবে! তমরা যা ভালো বোঝব্যে তাই করব্যে! এয়াতে আর কওয়ার কী আছে! যতই যাই হোক, এয়া তো আর শাস্তরমতে বিয়া নয়!'

এই সময়ে গাঁয়ের বিচক্ষণ মোড়লরা এসে পড়ল আর মদে-টুপ্‌টুপে, হেসে

গড়িয়ে-পড়া স্ত্রীলোকগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। ওলিয়া আর আমি এরপর বাগান ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

হাঁটতে-হাঁটতে ওলিয়া বলল, 'আমি ওদেরে ডরাই না। তবে মনে নিতেছে জীবনটা কঠিনই হবে।'

আসবাবপত্র আর কাপড়জামার পুঁটুলি বয়ে কলোনি-বাসিন্দারা আমাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল। অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ে গোগলের 'বিবাহ' নাটকখানি মঞ্চস্থ হল। অভিনয়ের আগে জুরবিন 'বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিবাহের রীতিনীতি' সম্পর্কে পুরোদস্তুর একটি বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না উৎসব সাঙ্গ হওয়ার।

১১

কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস

ওলিয়ার বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনেকদিনের প্রত্যাশিত একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলুম আমরা -- অর্থাৎ আমাদের 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীদের কলোনি ছেড়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত হল। যদিও বহুদিন আগে থেকে, সেই রাইসার কলোনিতে থাকা ও তার বাচ্চা হবার সময় থেকেই 'রাব্‌ফাক' নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলুম এবং তার পর থেকে দিনে-দিনে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলুম আমরা, যদিও কলোনির মধ্যে থেকে 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রী গড়েপিটে তৈরি করার চেয়ে সাগ্রহ কামনার বস্তু আমাদের কাছে আর কিছুই ছিল না এবং যদিও এই পুরো ব্যাপারটাই ছিল আমাদের পক্ষে একান্ত আনন্দদায়ক ও গৌরবের -- তবু 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীদের বিদায় দেবার দিন ঘনিয়ে এল যখন তখন প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা দলা পাকিয়ে উঠল, চোখে জল এসে পড়ল সকলেরই। বোঝা গেল, কেউই এই ভয়ঙ্কর সত্যটার মুখোমুখি হতে চাইছিল না: গোটা কলোনি এতদিন একসঙ্গে জীবন কাটিয়েছে, কাজ করেছে, হাসি-তামাশায় মুখর হয়ে থেকেছে, আর এখন কিনা তার আপন সদস্যরা ছেড়ে চলল তাকে। কেমন করে যেন কেউই ঠিক আশা করে নি যে এই নিদারুণ ব্যাপারটা অমনভাবে বাস্তব হয়ে উঠবে।

উদ্বেগ আর ক্ষতিবোধের চাপা একটা অনুভূতি নিয়ে আমিও ঘুম থেকে উঠলুম ওই দিন।

সকালের জলযোগের পর প্রত্যেকে ওইদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে বাগানে ভোজের টেবিলগুলো পেতে ফেলল। ওদিকে পতাকা-বাহকরা আমার অফিস-ঘরে গিয়ে পতাকার ঢাকনিটা খুলল আর ড্রাম-বাজিয়েরা ড্রামগুলো ঝুলিয়ে নিল পেটের ওপর। কিন্তু উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যে এই ব্যস্ততাও বুকের মধ্যে বিচ্ছেদবেদনার ধিকিধিকি আগুন নেবাতে সমর্থ হচ্ছিল না। ভোরবেলা থেকেই সেদিন কেঁদে-কেঁদে নীল চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছিল লিদচ্‌কা আর কোনো রাখঢাক না-রেখে চোখের জলে বিছানা ভিজিয়ে চলেছিল অন্য মেয়েরা। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না নিজেই আবেগ দমন করতে পারছিলেন না, তবু তিনি অন্যদের সান্ত্বনা দেয়ার বৃথা চেষ্টা পেতে লাগলেন। ছেলেরা সবাই গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে ছিল, এমন কি অপরকে মাতিয়ে তোলার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে বসেছিল লাপতও। খুদে বাচ্চারা পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তারে সার-বেঁধে-বসা চড়ুইদের মতো অকল্পনীয় সব সরল রেখা বরাবর সার বেঁধে বসে ছিল সেদিন। কেমন একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে যতসব বেঞ্চ আর রেলিঙের ওপর চেপে বসে, হাত দুখানা দু'হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে আর চোখ দুটোকে উলটে তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিপথের অনেকখানি ওপরদিকের নানা জিনিস, যথা বাড়িঘরের ছাদ, গাছের মাথা আর আকাশের দিকে তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে স্থির হয়ে ছিল তারা। সেদিনকার মতো চারিদিকে অমন নাকঝাড়ার ঘটাও আর কোনোদিন দেখা যায় নি।

ওদের শিশুসুলভ হতবুদ্ধি ভাবের অংশভাক ছিলুম আমিও। আমিও ছিলুম ওদের বিচ্ছেদবেদনার অংশীদার — ন্যায়বিচারের প্রতি ছিল যাদের অপরিমেয় শ্রদ্ধা তাদের সেই বেদনা অর্শে ছিল আমাতেও। তোস্‌কা সলভিয়েভের সঙ্গে আমিও ছিলুম একমত — কী এমন ঘটেছে যে মাত্‌ভেই বেলুখিন পরের দিন থেকে আর কলোনিতে থাকবে না? ব্যাপারটার কি এমন যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত একটা নিষ্পত্তি করা যায় না যাতে মাত্‌ভেইকে কলোনি ছেড়ে যেতে না হয়, যাতে তোস্‌কাকে বইতে না হয় অপার, অপ্রতিকার্য, অকারণ দুঃখের ভার? তবে তোস্‌কাই তো একমাত্র বন্ধু ছিল না মাত্‌ভেই যাকে ছেড়ে যাচ্ছিল, তাছাড়া একমাত্র মাত্‌ভেই-ই যে কলোনি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল এমনও নয়। বুরুন, কারাবানভ, জাদোরভ, ক্রাইনিক, ভেরশ্‌নেভ,

গোলস, নাস্তিয়া নচেভ্নায়া — এরাও সবাই চলে যাচ্ছিল কলোনি ছেড়ে আর এদের প্রত্যেকেরই ছিল কয়েক ডজন করে দোস্ত। আর মাত্ভেই, সেমিওন, বুরুন, এরা ছিল সত্যিকার মানুষ বলতে যা বোঝায় তা-ই, এদের অনুকরণ করাও ছিল অপার্থিব আনন্দের ব্যাপার আর এদের অনুপস্থিতির অর্থ ছিল কলোনিতে আবার ফিরেফিরতি নতুন করে জীবন শুরু করা।

এই সব ভাবনাচিন্তাই যে গোটা কলোনিকে পীড়িত করে তুলছিল শুধু তা-ই নয়। আমার এবং কলোনি-বাসিন্দাদের উভয়ের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে কলোনি এবার মাথা দিতে যাচ্ছে জল্লাদের হাড়িকাঠে এবং খাঁড়াখানা তার মাথায় পড়ার জন্যে মুখিয়ে রয়েছে।

'রাব্ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও এমন ভাব করছিল যেন 'প্রয়োজন ও ভাগ্যের অসংখ্য দেবদেবী'র কাছে বলি দেয়ার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে তাদের। কারাবানভ কখনই আমার পাশ ছাড়ছিল না, হেসে-হেসে খালি বলছিল:

'জীবনটা এই রকমই, বোঝলেন -- সব সময়েই কিছু-না-কিছু গোলমাল ঘটবেই। যেমন, ধরেন, 'রাব্ফাক'-এ ঢুকতে পাওয়া মস্ত একটা ভাগ্যের ব্যাপার। বলতে পারেন এটা একটা স্বপ্ন। প্রত্যেকেই এতে ঢুকতে চায়, এ যে কী জিনিস তা ভগবানই জানে! কিন্তু যখন সত্যি-সত্যিই ঢোকার সময় আসে তখন মনে হয়, কে জানে, ব্যাপারটা হয়তো তেমন কিছু নয়! কে জানে, হয়তো আমাদের সুখের দিন আজই শেষ হতে চলেছে। কলোনি ছেড়ে যাওয়া বড় কষ্টের ব্যাপার, বড়ই কষ্টের... লোকে যদি না তাকায়ে থাকত তো আমি চিৎকার দিতাম। ওঃ, কী চিৎকারটাই-না দিতাম তাইলে!.. হয়তো চেঁচাতে পারলে আরেকটু ভালো বোধ করতাম!.. সত্যি, দুনিয়ায় সত্য বলে কিছু নাই!'

অফিস-ঘরের এক কোনায় বসে ক্রুদ্ধ চোখে আমাদের দেখছিল ভের্শনেভ। সে এবার বলে উঠল:

'একমাত্তর একটিই সত্য আছে — তা হল, মানুষ।'

'ওই, একখান কথা যা বললি-না!' হেসে ফেলল কারাবানভ। 'তুই কি বলতে চাস যে শেয়ালকুকুরের মধ্যিও তুই সত্যের সন্ধান করছিস?..'

'ন্-ন্-ন্-না, তা কেন... আমি বলতে চাই যে মানুষরে ভালো হতে লাগবে, তা নইলি স্-স্-সত্য দিয়ে কোন ক্-ক্-কামটা হবে আমাদের?

কেউ যদি শোরের সামিল হয় তাইলে সমাজতন্ত্রে পেঁছনোর পরেও সে উপদ্রব হয়ে দাঁড়াবে, বুঝলি? এটা আজই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।'

কথাটা শুনে তীক্ষ্ম চোখে নিকলাইয়ের দিকে তাকালুম। বললুম:

'কেন, মাত্র আজই কেন?'

'মানুষজনরে আজ আমি আয়নায় দেখার ম্-ম্-মতন করে দেখতে পাচ্ছি। কী করে যে এমনটা হল তা জানি না: এর আগে সবকিছুই ছিল কাজের ব্যাপার, প্রতিটা দিনই ছিল কাজের দিন আর আজকে হঠাৎ সবকিছু কে-কে-কেমন করে যেন প্-প্-পরিষ্কার হয়ে গেল। সত্যি কথাটা আগেই লিখে গেছেন গোর্কি কিন্তু আমি এর আগে কথাটা ঠিক বুঝি নাই, কিংবা বুঝেছিলাম হয়তো কিন্তু কথাটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আগে ধরতে পারি নাই। একজন মানুষ বলে কথা — সে তো আর যে-সে, বাজে লোক নয়! আর কথাটা কতই-না সত্যি! বেশ কিছু লোক আছে যারা একবারে সাধারণ এলেবেলে লোক, আর বাকি কিছু আছে যারা সত্যিকার মানুষ।'

এই ধরনের সব কথাবার্তা বলে 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা কলোনি থেকে তাদের বিদায়গ্রহণজনিত টাটকা ক্ষতগুলো সেদিন লুকনোর চেষ্টা করছিল। তবে এ-ব্যাপারে তাদের চেষ্টাটা আমাদের চেয়ে কম আয়াসসাধ্য ছিল, কারণ তাদের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল 'রাব্‌ফাক'-এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কিন্তু আমাদের সামনে দিশারী আলোর কোনো চিহ্ন ছিল না।

এর আগের দিন রাত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই এসে জড় হয়েছিলেন আমার ঘরের সামনে গাড়িবারান্দাটার নিচে। কেউ-কেউ বসে ছিলেন, অন্যেরা ছিলেন দাঁড়িয়ে, সবাই চিন্তা করছিলেন আর একসঙ্গে লজ্জিতভাবে জড়সড় হয়ে ছিলেন। কলোনির আর সবাই ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাতটা ছিল স্থির নিষ্কম্প, উষ্ণ আর তারায় ছাওয়া। পৃথিবীটাকে অত্যন্ত জটিল নানা উপাদানের এক মিশ্র, একধরনের একটা যাদু-শরবত বলে ঠেকছিল আমার কাছে, যার স্বাদ মনে হচ্ছিল যেমন চমৎকার তেমনই মনোহারি। আবার সেই সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছিল যে পানীয়টাকে তার উপাদানগুলিতে ভেঙে-ভেঙে দেখা একেবারেই অসম্ভব, ফলে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল না যে কোন-কোন তিক্তকষায় অনুপান মিশ্রিত ছিল পানীয়টার সঙ্গে। এমন সব মুহূর্তে মানুষ

আক্রান্ত হয় দার্শনিক নানা ভবিষ্যৎচিন্তায়, আচ্ছন্ন হয় অজ্ঞেয়কে জানার দুর্নিবার বাসনায়। আর যে-বন্ধুদের সামাজিক দিক থেকে বিকাশসাধনে, একেবারে বিশৃঙ্খল নৈরাজ্য থেকে যাদের গড়েপিটে তুলতে কষ্টস্বীকার করে সাহায্য করেছে একটা মানুষ, সেই বন্ধুরা যখন পরের দিনই 'চিরকালের মতো' কাছছাড়া হবার উপক্রম হয়, তখন ভাষা হারিয়ে শান্ত আকাশের দিকে শূন্যমনে তাকিয়ে থাকার অদম্য বাসনা পেয়ে বসে তাকে আর কোনো-কোনো মুহূর্তে যেন প্রায় বিশ্বাস করতেই সাধ জাগে যে আশপাশের পপ্‌লার, উইলো আর লাইম গাছগুলো বুঝি তার সমস্যার সমাধানই ফিস্‌ফিস শব্দে বাতলে দিয়ে চলেছে।

আর আমরা — কতগুলি নশ্বর মানুষের অসহায় দলা-পাকানো একটা পিণ্ড — প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আর সকলে মিলে একসঙ্গে স্তব্ধতা বজায় রেখে বসে-দাঁড়িয়ে ছিলুম আমরা। আমরা ছিলুম নিজ-নিজ চিন্তায় বিভোর হয়ে, গাছের পাতাদের ফিস্‌ফিসানির দিকে কান পেতে, চোখ রেখে তারাদের চোখে। শোনা যায়, শিকার-অভিযান অসফল হলে পরে বন্য বর্বররাও নাকি এইরকম আচরণ করে থাকে।

আর সেদিন আমিও ছিলুম ওইখানে। ভাবছিলুম। অন্যদের সঙ্গে আমিও নিবিষ্ট ছিলুম ভাবনায়। সেই বিশেষ রাত্রে, যে-রাত্রে আমি আমার প্রথম সত্যিকার স্নাতক ছাত্রছাত্রীর দলটিকে গড়েপিটে তৈরি করে জগৎ-সংসারে ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কত-যে অর্থহীন ভাবনাচিন্তায় আবিষ্ট হয়ে ছিলুম সেদিন যে কী বলি! ওই সমস্ত ভাবনার কথা সে-সময়ে কাউকেই বলি নি আমি। সম্ভবত সেদিন আমার সহকর্মীদের মনে হয়েছিল যে একমাত্র তাঁরাই দুর্বল হয়ে পড়েছেন আর আমি বুঝি রয়ে গেছি ওকগাছের মতোই অটল, প্রবল, দৃঢ়মূল। ফলে আমার উপস্থিতিতে দুর্বলতা প্রকাশ করতেও বোধহয় তাঁরা লজ্জা পাচ্ছিলেন।

আমি ভাবছিলুম, জীবনটা আমার কতই-না কষ্টে আর অন্যায়-অবিচারে ভরা। ভাবছিলুম, জীবনের সেরা সময়টা কীভাবে বিকিয়ে দিয়েছি ডজনখানেক 'কিশোর অপরাধী' যাতে 'রাব্‌ফাক'-এ ঢুকতে পারে নিছক সেই জন্যেই, 'রাব্‌ফাক'-এ এবং বড় শহরটায় থাকার সময়ে তারা যখন নিত্যি-নতুন প্রভাবের আওতায় আসবে আর আমি তার কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না তখনই-বা হবে কী... তাছাড়া এ-সবের শেষ পরিণতি যে কোথায় তা-ই বা কে বলতে

পারে? কে জানে, হয়তো আমার পরিশ্রম আর এত ত্যাগস্বীকার শেষপর্যন্ত বৃথা শক্তিক্ষয়ের নিছক অপ্রয়োজনীয় এক সমষ্টি বলে প্রমাণিত হবে!..

এছাড়া আরও অনেক কথা চিন্তা করছিলুম। ভাবছিলুম, আমার প্রতি এত অবিচার কেন?.. নিজে কি আমি সৎ কাজ কিছুই করি নি? কোনো ক্লাবের গাইয়েবাজিয়ে দলের হয়ে গান-বাজনা করা, কিংবা ভালো একটা নাটকে, এমন কি মস্কো আর্ট থিয়েটরের মতো অমন একটা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার চেয়েও শতগুণে কঠিন ও বেশি প্রয়োজনীয় কাজ করি নি কি আমি?.. তাহলে কেন বড়-বড় শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিনন্দন কুড়োবে অভিনেতারা, কেন মানুষের মনোযোগ ও কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হয়ে তারা নিজের-নিজের বাড়িতে অবসর ও বিশ্রামের জীবন যাপন করতে পাবে? আর আমাকে অন্ধকার রাত কাটাতে হবে পাণ্ডববর্জিত একটা শ্রম-কলোনিতে? কেন কেউ একজনও, এমন কি গনচারোভ্‌কার বাসিন্দারা পর্যন্ত অভিনন্দন জানায় নি আমাকে? এ-সব কোনো কিছু তো পাই-ই নি. উপরন্তু ফিরে-ফিরে বারবার উদ্বেগের সঙ্গে আমার মনে পড়ছিল যে 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীদের নতুন পোশাক-আশাক তৈরি করানো বাবদ আমি এর আগেই হাজারখানেক রুব্‌ল খরচ করে বসেছি অথচ আমাদের বাজেটে এ-বাবদে ব্যয়বরাদ্দের কোনো ব্যবস্থা নেই। মনে পড়ছিল, এ-সম্পর্কিত আমার প্রশ্নের জবাবে অর্থ-দপ্তরের ইন্‌স্পেক্টরটি আমার দিকে কড়া সমালোচনার চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন:

'ইচ্ছে করলে এ-বাবদে আপনি যত খুশি টাকা ঢালতে পারেন. তবে মনে রাখবেন বরাদ্দ টাকায় ঘাটতি পড়লে কিন্তু আপনার নিজের মাইনে থেকে তা পূরণ করতে হবে।'

কথাগুলো মনে পড়ায় হাসি পেল আমার। হঠাৎ আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন পুরো একটা দপ্তরের কাজ শুরু হয়ে গেল। দপ্তরের একটা ঘরে কেউ একজন ইন্‌স্পেক্টরটির বিরুদ্ধে হিংস্র শ্লেষাত্মক বক্তৃতা রচনা শুরু করে দিল, পাশের ঘরে সজোরে চিৎকার করে কে এক বেপরোয়া বলে উঠল, 'ধুত্তোর, থোড়াই কেয়ার করি!' আর তার পরের ঘরটায় মনে হল যেন একদল আজ্ঞাবহ ধূর্ত বদমায়েশ টেবিলগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে হিসেব কষে দেখছে আমার মাইনের টাকা থেকে এক হাজার রুব্‌লের ঘাটতি পূরণ করতে কত মাস সময় লাগবে। যদিও আমার মস্তিষ্কে আরও হরেকরকম দপ্তর কাজ করে যাচ্ছিল, তবু ওপরের ওই দপ্তরটি কাজ করছিল বেশ মনোযোগ দিয়েই। আবার ওর

পাশের আরেকটা বাড়িতে একই সময়ে একটা গুরুগম্ভীর সভার অনুষ্ঠান চলছিল এবং সেখানে মঞ্চে বসে ছিল আমাদের সব ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আর 'রাব্ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া শ-খানেক বাদ্যযন্ত্রীর একটা দল প্রচণ্ড আওয়াজে 'আন্তর্জাতিক' গানের সুর বাজাচ্ছিল সেখানে এবং একজন মহাপণ্ডিত শিক্ষা-বিজ্ঞানী বক্তৃতাও দিচ্ছিলেন।

ফলে আবার একবার হাসি পেল। ভাবলুম, মহাপণ্ডিত শিক্ষা-বিজ্ঞানী এমন কী কথা বলতে পারেন যা আমাদের কাজে লাগবে? রিভলবার-হাতে বড় রাস্তার ওপর আমাদের রাহাজান কারাবানভকে তো তিনি ঘুরে বেড়াতে দেখেন নি? কিংবা পাকা সিঁদেল চোর বুরুন — যার দুষ্কর্মের সঙ্গীসাথীরা একদা গুলি খেয়ে মরেছিল — তাকে তো দেখেন নি তিনি অপর কারো জানলার কার্নিসে গড়ি মেরে বসে থাকতে? তাহলে? কতটুকু দেখেছেন তিনি?

'সারাক্ষণ কী এত ভাবছেন আপনি?' হঠাৎ একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না আমায় শুধোলেন। 'ভাবছেন আর আপনমনে হাসছেন যে বড়?'

বললুম, 'একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সভার অনুষ্ঠান করছি।'

'তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু বলুন দেখি, নেতৃস্থানীয় একটা চালক-কেন্দ্র ছাড়া আমরা কাজ চালাই কী করে?'

'ওহো, তাই তো! ভবিষ্যৎ শিক্ষা-বিজ্ঞানের এটা হল গিয়ে নতুন একটা ক্ষেত্র — চালক-কেন্দ্রের ক্ষেত্র!'

'কিসের ক্ষেত্র?'

'আমি চালক-কেন্দ্রের কথা বলছি। যদি যৌথ-সংস্থা থাকতে হয় তাহলে তার একটা চালক-কেন্দ্র থাকতেই হবে। এই আর-কি।'

'চালক-কেন্দ্র কী ধরনের হবে তার ওপরই কিন্তু সবকিছু নির্ভর করে।'

'কী ধরনের আবার — আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই হবে। নিজেদের যৌথ-সংস্থা সম্পর্কে আমাদের আরও উঁচু ধারণা পোষণ করা উচিত, বুঝেছেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না? চালক-কেন্দ্র নিয়ে আমরা এখানে চিন্তা করছি, অথচ আমরা ভালোমতো খেয়াল করার আগেই আমাদের যৌথ-সংস্থা কিন্তু ইতিপূর্বেই একটা চালক-কেন্দ্র তৈরি করে ফেলেছিল। ভালো চালক-কেন্দ্র আপনা থেকেই বংশবৃদ্ধি ঘটায়। কথাটা নোটবইয়ে টুকে রাখুন, ভবিষ্যৎ শিক্ষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।'

'ঠিক আছে, তাই রাখব,' বিনা প্রতিবাদে রাজি হয়ে গেলেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভনা।

পরদিন শিক্ষক-যৌথকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকতে দেখা গেল। বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হল অত্যন্ত আড়ষ্ট, আনুষ্ঠানিক ধরনে। এই বিষাদের আবহাওয়া আরও ঘোরালো করে তোলার ইচ্ছে ছিল না আমার। তাই আগাগোড়া এমন এক হাসিখুশি লোকের ভূমিকায় অভিনয় করে গেলুম সবচেয়ে বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাপূরণের ফলে যার নাকি মনে আর আনন্দ ধরছে না।

ওইদিন দুপুরবেলা ভোজের টেবিলগুলোয় একসঙ্গে বসে সবাই খাওয়া গেল। সেখানে থেকে-থেকে এত হাসির রোল উঠতে লাগল যে আমরা নিজেরাই কিছুটা অবাক হয়ে গেলুম। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে লাপত আমাদের দেখাল — তখন থেকে সাত-আট বছর পরে 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীদের হাল কী রকম দাঁড়াবে। ও দেখাল, এঞ্জিনিয়র জাদোরভ যেন মারা যাচ্ছে যক্ষ্মারোগে আর দুই ডাক্তার বুরুন আর ভের্‌শ্‌নেভ তার বিছানার পাশে বসে ভিজিটের টাকা ভাগাভাগিতে ব্যস্ত. ওদিকে সঙ্গীতজ্ঞ ক্রাইনিক এসে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের জন্যে বাজানো বাবদ অগ্রিম টাকা চাইছে আর ভয় দেখাচ্ছে তখনই টাকা না-দিলে সে অন্ত্যেষ্টিসঙ্গীত বাজাবে না। তবু, সবকিছু সত্ত্বেও, কি আমাদের হাসিতে আর কি লাপতের রঙ্গরসিকতায় সত্যিকার খুশির মেজাজ যতটা-না প্রকট হয়ে উঠেছিল তার চেয়ে বেশি প্রকট হয়েছিল আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি।

বেলা তিনটের সময় আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালুম। পতাকাও বের করে আনা হল। 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ডানদিকে সারি দিয়ে দাঁড়াল। 'মলাদিয়েত্‌স'কে গাড়িতে জুতে আস্তাবল থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে এল আন্তন। বিদায়ী ছেলেমেয়েদের বাক্স-পেটরায় গাড়িখানা বোঝাই করে ফেলল খুদে বাচ্চারা। অতঃপর যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেয়া হল, ড্রাম বেজে উঠল গুরগুর করে, সারিবন্দীভাবে রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল। আধঘণ্টা হাঁটার পরে কলমাকের পাড়ের ঝুরঝুরে বালির পথ পেরিয়ে এসে শক্ত খাটো ঘাসের পথে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম আমরা। বহুদিন আগে এককালে এই ঘাসের পথটা ছিল একটা চওড়া বড় রাস্তা আর সেই রাস্তা ধরে যেত তাতার আর দ্‌নিপার-পারের কসাকরা। এই রাস্তায় ওঠার পর ড্রাম-

বাজিয়েরা ফের কাঁধ টানটান করে হাঁটতে লাগল আর তাদের হাতের ছড়িগুলো আরও হালকা চালে আর উৎসাহভরে শুরু করল দাপাতে।

'ঠিকমতো লাইন সাজাও! ঘাড় উঁচু রাখো!' কড়াভাবে হুকুম দিলুম আমি।

না-থেমে কিংবা পা ফেলার তালে গোলমাল না-করেই কারাবানভ ফিরে তাকাল। আর সহজ একটুখানি হাসির মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে গর্ব, আনন্দ, ভালোবাসা, নিজের শক্তি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আস্থা, এই সবকিছুর প্রকাশ ঘটাল সে নিজস্ব অনন্য অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। ওর পাশে-পাশে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিল জাদোরভ। কারাবানভের এই সামান্য নড়াচড়ার তাৎপর্যটুকু সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল সে, তারপর তার চিরকালের রীতি অনুযায়ী লজ্জিতভাবে মনের আবেগ লুকোতে উজ্জ্বল চোখে দ্রুত এক-নজর খালি দিগন্তের দিকে তাকাল, তারপর এক-নজর চোখ তুলে তাকাল আমাদের পতাকার দিকে। আর হঠাৎ গান ধরে দিল কারাবানভ উদাত্ত, উচ্ছল গলায়:

লতায়ো-লতায়ো যাও ওরে ফুল-পেরিউইংক্‌ল গাছ
ঘে'স্যে আস্যে বোস কসাক আমার কাছ।

অন্যেরাও খুশি হয়ে ওর গলায় গলা মেলাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটাও উৎসবের আবহাওয়ায় ভরে উঠল, মনে হল যেন মে-দিনের কুচকাওয়াজে যোগ দিয়েছি। কেমন যেন মনে হল কলোনি-বাসিন্দারাও আমার মেজাজের অংশভাক; আর হঠাৎই আমরা সবাই এই দারুণ ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি যে গোর্কি কলোনি তার প্রথম আর সবসেরা দলটিকে বিদায় দিচ্ছে। আর ওদেরই সম্মানে বুঝি রেশমী পতাকায় ঢেউ উঠছে, ড্রামগুলো বাজছে বজ্রগর্জনে, রাজকীয় কুচকাওয়াজে হেলছে দুলছে মানুষের সারি। সূর্যকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন সে আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। এইবার পশ্চিমে ডুব দিল সে, যেন জায়গা ছেড়ে দিল আমাদের, যেন আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল সে একটা মিষ্টি গান, একটা ভারি চালাকির গান। গান শুনে মনে হতে পারত সেটা বুঝি প্রেমে পাগল কোনো এক কসাককে নিয়ে লেখা, কিন্তু আসলে গানটা ছিল 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীদের যে-দলটি — তার আগের দিন দলপতি-পরিষদের জারি-করা নির্দেশ অনুযায়ী 'আলেক্‌সান্দর জাদোরভের নেতৃত্বে' যে 'সপ্তম মিশ্র বাহিনী'টি — খার্‌কভ রওনা হতে যাচ্ছিল তাদেরই নিয়ে।

নিজেদের গলার গান খুবই উপভোগ করছিল ছেলেরা আর বারে-বারে তেরছা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল — আমি যে ওদের সঙ্গ উপভোগ করছি এতে ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল ওরা।

অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলুম যে আমাদের পেছনে বহু দূরে ঘুরে-ঘুরে ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে। শিগ্‌গিরই ওই ঘূর্ণির মধ্যে এক ঘোড়সওয়ারকে আবিষ্কার করা গেল। ঘোড়সওয়ারটি ছিল আমাদের ওলিয়া ভোরনভা।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে সে আমায় ওর ঘোড়াটা দিতে চাইল। বলল:

'উঠে পড়েন! জিনটা ভালো — খাঁটি কসাক-জিন। আমার পেরায় দেরি হয়ে গেছিল আর-কি।'

বললুম, 'আমি জেনারেল নই। লাপত বরং ঘোড়াটায় চড়ুক। ও-ই তো এখন দ-প-স*।'

'ঠিক! ঠিক কথা!' বলেই লাপত হুড়মুদুড়ুম করে ঘোড়ার জিনে চেপে বসল। তারপর হেলেদুলে, অদৃশ্য মোচে তা দেয়ার ভঙ্গি করতে-করতে আমাদের সারির আগে-আগে যেতে লাগল।

অতঃপর 'সহজভাবে চলা'র হুকুম জারি করতে হল — অংশত ওলিয়াকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ দেয়ার জন্যে এবং অংশত লাপতের ভাঁড়ামিতে কলোনি-বাসিন্দারা হাসির চোটে স্থির থাকতে পারছিল না বলে।

স্টেশনে পেঁছনোর পর বিষণ্ণ মনমরা ভাবের সঙ্গে থেকে-থেকে বেপরোয়া হাসির দমক দেখা যাচ্ছিল আমাদের মধ্যে। বিদায়ী ছাত্রছাত্রীরা ট্রেনের কামরায় উঠে বসে আমাদের দলবলের ও প্ল্যাটফর্মের অন্যান্য লোকের দিকে গর্বভরে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ আমাদের স্টেশনে আসতে দেখে এই সব লোক কেন যেন কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

ট্রেন ছাড়ার দ্বিতীয় সংকেত জানান দিলে পর লাপত এইমর্মে সংক্ষিপ্ত একটা বক্তৃতা দিল:

'দেখো, ছেলেরা, আমাদের যেন বদনাম কোরো না! শুরকা, তুই অদেরকে শাসনে রাখবি কিন্তু, আর দ্যাখ, এই কামরাটারে যাদুঘরে পাঠাতে ভুলবি না। যাদুঘরে পাঠানোর সময় কামরাটার গায়ে এই কথা কয়টা খোদাই করে দিস: 'এই কামরায় চড়ে সেমিওন কারাবানভ রাব্‌ফাকে যোগ দিতে গেছিল'।'

* দ-প-স — দলপতি-পরিষদের সম্পাদক। — অনুঃ

আমরা ঘরে ফিরলুম মাঠের পথ ধরে, সরু-সরু পায়ে-চলা পথ আর নালার ওপরে-পাতা কাঠের তক্তা মাড়িয়ে, থেকে-থেকে কখনও-বা ছোটখাট নদী আর খাল লাফিয়ে পার হয়ে। এর ফলে অন্তরঙ্গদের ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে পড়লুম আমরা, আর পড়ন্ত সন্ধের অন্ধকারের আড়ালে হামবড়াই ভাব বর্জন করে নিজেদের মনগুলোকে উলটেপালটে দেখা আর প্রকাশ করে ফেলার পালা চলতে লাগল। গুত বললে:

'আমি বাবা 'রাব্‌ফাক'-টাকে যেতেছি না। জুতা তৈরির কারিগর হব আমি, ভালো-ভালো জুতা বানাব খালি। কাজটা কি এয়ার থেকে খারাপ? মোট্টেও না! কিন্তু ছোঁড়াগুলান যে আমাদের ছেড়ে গেল এটা খুবই দুঃখের, তাই না?'

বাঁকাঠেঙো, এবড়োখেবড়ো, প্রকান্ড চেহারার কুদ্‌লাতি কড়া চোখে গুতের দিকে তাকাল।

বলল, 'জুতা বানানোর কারিগরও তুই অতি রদ্দি হবি, বুঝলি! গত হপ্তায় আমার জুতায় একটা তালি দিইছিলি তুই, মনে পড়ে? তা, ওইদিন সন্ধের মধ্যিই তালিটা গেল খুলে। অমনধারা মুচি ডাক্তারের থেকেও খারাপ। ভালো মুচি হলে অবিশ্যি অন্য কথা, ডাক্তারের থেকে সে ভালো হলিও হতে পারে।'

ওইদিন সন্ধেয় অবসাদজনিত একটা স্তব্ধতা ছেয়ে রইল কলোনিকে। আর তারপর, 'শুতে যাওয়া'র বিউগ্‌ল-সংকেত বাজানো হল যখন, ঠিক তখনই কর্তব্যরত দলপতি অসাদ্‌চি গুতকে ধরে নিয়ে এল — মাতাল অবস্থায়। কিংবা হয়তো ঠিক ততখানি মাতাল নয় যতখানি কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল সে। সকলের বিরক্তি আর রাগ প্রকাশের দিকে কিছুমাত্র নজর না-দিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আর আমার দোয়াতটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সে ফিস্‌ফিস করে বলতে লাগল:

'আমি মদ খাচ্ছিলাম কারণ মদ খাওয়া ঠিক, তাই। জুতা বানানোর কারিগর হতে পারি আমি, কিন্তু তাই বলে আমার মন বলে কিছু নাই, নাকি? আমার মন আছে বৈকি। জাদোরভ আর এতগুলান ছেলেপেলে যখন (শয়তান জানে কোন চুলায়!) চলে গেল তখন আমি কি তা চুপচাপ মেনে নিতি পারি? না, চুপচাপ মেনে নিতি পারি না। তাই আমি চলে গিয়ে নিজির রোজগারের পয়সায় মদ খেলাম। ময়দা-কলের ঘানিওলার বুটজুতায় আমি কি সুকতলা লাগাই নাই? লাগায়েছি বৈকি। নিজির রোজগারের পয়সায় মদ খেয়েছি

আমি। আমি কি কারো গলায় কোপ দিছি? কাউরে অপমান করেছি? কোনো মেয়ার গায়ে আঙ্গুলটি ছোঁয়ায়েছি পের্যন্ত? না, আঙ্গুল পের্যন্ত ছোঁয়াই নাই। তাইলে? ও অমন চিৎকার জুড়ে দিল ক্যানে? ক্যানে বললে: আয় আন্তনের কাছে! আয়, বলতেছি! তা, এই আন্তনটা কেডা?.. আপনেই নাকি, আন্তন সেমিওনভিচ? তা, সেটা কেডা? জঙ্গলের জন্তু নাকি? না, জঙ্গলের জন্তু না। তাইলে কেমন ধাঁচের লোক সে -- অপদাথ্থ বাজে লোক, নাকি? নাঃ, অপদাথ্থ লোক তো নয়। ঠিক আছে, তাইলে। আমি এসেছি। এই তো খাড়ায়ে আছি। আপনে দেখতেছেন — সামনে খাড়ায়ে আছে বাজে জুতা বানানোর কারিগর গুত।'

'আমি যা বলব তা শোনার মতো অবস্থা আছে তো তোমার?'

'আছে বৈকি। যা বলবেন তা শোনার জন্যি আমি প্রস্তুত।'

'ভালো কথা। তাহলে, শোন! জুতো তৈরি অত্যন্ত দরকারি কাজ, অত্যন্ত ভালো কাজ। তুমি যদি মদ না খাও তাহলে একদিন তুমি জুতো বানানোর ভালো কারিগর হবে, এমন কি বুট তৈরির কারখানার ডিরেক্টর পর্যন্ত হতে পারবে।'

'যখন এত লোক আমাদেরে ছেড়ে যাবে তখনও মদ খেতে পারব না?'

'না। তখনও না।'

'তাইলে আপনের মতে, মদ খেয়ে ভুল করেছি আমি?'

'হ্যাঁ, ভুল করেছ।'

'তাইলে, এ-ব্যাপারের যখন আর কোনো চারা নাই,' এবার মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকিয়ে গুত বলল, 'তখন আমারে আপনের শাস্তি দেয়া লাগবে।'

'যাও, শুতে যাও। এবারের মতো তোমাকে মাফ করে দিলুম।'

'কেমন, বলেছিলাম-না?' চারপাশের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে গুত বলল। তারপর বিরক্তিভরা চোখে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে কলোনি-বাসিন্দার ভঙ্গিতে সেলাম ঠুকল ও:

'ঠিক হ্যায়, কমরেড!'

বাহুমূল চেপে ধরে বুঝিয়েসুঝিয়ে ওকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল লাপত। লাপতের ভাবখানা ছিল এইরকম যেন ওর মতে গুতই হচ্ছে কলোনির বিচ্ছেদবেদনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

এর আধঘণ্টা পরে কুদ্‌লাতি আমার অফিসে এল — শরৎকালের জন্যে

নতুন বুটজুতোর বিলিবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে। বাক্স থেকে নতুন বুটের জোড়াগুলো সস্নেহে সন্তর্পণে বের করে-করে ওর হাতের তালিকা মিলিয়ে কলোনি-বাসিন্দা বাহিনীগুলোর সদস্যদের নামে-নামে সেগুলো বাঁটোয়ারা করছিল সে। ওদিকে অনবরত তখন চেঁচামেচি চলছিল:

'তা, এ-জুতাজোড়া বদলায়ে দেবে কখন, শুনি? এ-জোড়া আমার পায়ে আঁটো হয়েছে যে!'

কুদ্‌লাতি বারে-বারে উত্তর দিচ্ছিল। শেষে আর ধৈর্য রাখতে না-পেরে চেঁচিয়ে উঠল:

'বারে-বারে তো তোদেরে বলতেছি আমি — আজ আর জুতাবদল হবে না, জুতা বদলাতে গেলি কাল আসতি হবে। মোটামাথা যত্তোসব!'

আর আমার ডেস্কে বসে ক্লান্ত লাপত চোখ কুঁচকে কুদ্‌লাতিকে বলল:

'বিক্রিওলা আর খদ্দের — দুই জনেরই দু'জনার প্রতি ভদ্র হওয়া দরকার, কমরেড।'

১২

হেমন্তে

আবার একবার শীত ঘনিয়ে এল। অক্টোবর মাসের মধ্যে গভীর 'বুর্তি'গুলো ভরে ফেলা হল পরপর একটা করে বীট আর একটা করে খড়ের স্তর দিয়ে। অতঃপর লাপত দলপতি-পরিষদের কাছে প্রস্তাব দিল:

'এইমর্মে প্রস্তাব নেয়া হোক যে এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা হবে।'

'বুর্তি' হল গভীর আর টানা একেকটা গর্ত বা ট্রেঞ্চ, প্রত্যেকটা বিশ মিটার করে লম্বা। আসন্ন শীতের জন্যে শেরে ডজনখানেক এইরকম ট্রেঞ্চ তৈরি করিয়েছিলেন এবং তারপরও বলছিলেন যে এও যথেষ্ট নয়। আমাদের নাকি বীটের খরচ কমাতে হবে।

প্রত্যেকটা বীটকে ট্রেঞ্চের মধ্যে তার নির্দিষ্ট জায়গায় এমন সাবধানে রাখতে হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সেটা বীট নয় চোখ-পরীক্ষার যন্ত্রপাতিই হবে বুঝি। যে-কোনো মিশ্র বাহিনীর পেছনে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত খাড়া একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে অনবরত টিকটিক করায় ক্লান্তি ছিল না শেরের।

যেমন, তিনি বলে চলতেন, ‘কমরেড-সব, ওভাবে ওগুলো ছুড়ে-ছুড়ে ফেলো না। দোহাই তোমাদের! মনে থাকে যেন, একটা বীটের গায়েও যদি জোরে ঘা দাও তাহলে সেটা থেঁতলে যাবে আর তারপর পচতে শুরু করবে। তারপর সেই পচন বাকি বীটগুলোতেও ছড়িয়ে যাবে। সবই যাবে নষ্ট হয়ে। অতএব, কমরেড-সব, সাবধান, খুব সাবধান!’

এ-ধরনের কাজের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত বলে এবং বীটে পুরোপুরি অরুচি ধরে যাওয়ায় কলোনির ছেলেমেয়েরা শেরের এই সব টিকটিক করাকে মনঃসংযোগ বিক্ষেপের আর বিশ্রামের অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করার একটা সুযোগও ছাড়ত না। বীটের গাদা থেকে সুন্দর চেহারার, গোলগাল, গোলাপিরঙের একটা বীট বেছে নিয়ে গোটা মিশ্র বাহিনী তার দলপতি কোনো একজন মিত্‌কা বা ভিত্‌কার নেতৃত্বে বীটটার চারপাশে জড় হয়ে যেত তখন। আর দলপতি তার হাত দুটো তুলে আর আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মঞ্চের নেপথ্য-উক্তির মতো করে বলত:

‘সাবধান, বেশি কাছে যাস না! দম বন্ধ করে রাখ্‌! হাত কার পরিষ্কার আছে — আয় দেখি?’

আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ডুলিজাতীয় একটা বস্তু এনে হাজির করত কেউ। তখন মিশ্র বাহিনীর দলপতি বীটটাকে সযত্নে গাদা থেকে তুলত। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন সভয়ে চেঁচিয়ে উঠত:

‘আরে, আরে, করতেছিস কী? করতেছিস কী?’

শুনে আতঙ্কে সবাই জমে যেত যেন আর খালি মাথা ঝাঁকাত সকলে। তখন আগের সেই গলা আবার শোনা যেত:

‘আরও সাবধান হওয়া দরকার তোর!’

হাতের কাছে একপ্রস্থ কাজের পোশাক যা পাওয়া যেত তা-ই পাকিয়েজুকিয়ে নরম আরামদায়ক একটা মাথার বালিশ বানিয়ে নেয়া হোত। তারপর বালিশটা ডুলির ওপর রেখে গোলাপি, গোলগাল, পুরুষ্টু বীটকে যখন তার ওপর শোয়ানো হোত তখন সত্যিই দেখবার মতো একটা দৃশ্য হোত বটে। হাসি লুকোতে শেরে ঘাসের একটা শিষ চিবোতে থাকতেন, ওদিকে ডুলিটাকে মাটি থেকে তোলা হোত আর মিত্‌কা ফিস্‌ফিস করে বলতে থাকত:

‘আস্তে, কমরেড-সব, খুব আস্তে! মনে রেখো, পচন শুরু হয়ে যেতে পারে...’

মিত্‌কার গলায় এ-সময়ে শেরের গলার সামান্য একটুখানি সাদৃশ্য ফুটে

উঠত। ফলে এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ মুখ থেকে ঘাসের শিষটা ফেলে দিতে তখনও সাহস পেতেন না।

শীত-ফসলের জন্যে জমি চষার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমরা সবেমাত্র ট্রাক্টরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি, ফলে একটা লাঙল আর দু'টো ঘোড়া দিয়ে দিনে আধা-হেক্টরের বেশি জমি চষা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। প্রথম আর দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনীর দৈনিক কাজের পরিমাণ দেখে শেরে তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। এই বাহিনীগুলোতে প্রায় আদিম পর্যায়ের মানুষ ফেদরেঙ্কো, কারিতো, চোবত ইত্যাদি 'ওকগাছের মতো কঠিন প্রাণ'দের নেতৃত্বে কাজ করত আমাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ কলোনি-বাসিন্দাদের কয়েকজন। এই কমরেডদের দৈহিক শক্তি লাঙলে জোতার উপযোগী জুড়িঘোড়ার চেয়ে বড় কম ছিল না, তাছাড়া জমিচষার কাজের নাড়িনক্ষত্র ছিল তাদের নখদর্পণে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জমিচষার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার ভারি সুন্দর একটা ধরন ছিল এদের। আমাদের যৌথ জীবনে, বন্ধুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও তারা পক্ষপাতী ছিল সরলরেখায় গভীর টানা সব গর্ত খুঁড়ে চলায়, মাটির ভারি ঝলমলে সব স্তূপ উলটে-উলটে পথ কাটায়। আর মনে হোত তাদের মস্তিষ্ক যেন কাজ করে চলেছে মাথার মধ্যে নয়, অন্য কিছু-কিছু জায়গায় — যেমন, লোহার শাবলের মতো তাদের দু'টো হাতে, বর্মের মতো কঠিন বুকখানায়, সুদৃঢ় স্তম্ভের মতো তাদের দু'টো উরুতে। কলোনিতে 'রাব্‌ফাক'-এর আকর্ষণকে আগাগোড়া প্রতিহত করে চলছিল তারা এবং লেখাপড়া-সংক্রান্ত সবরকম আলোচনা নিঃশব্দে অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে চলত। এ-সব ব্যাপারে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও মতামত ছিল অটল অনড়, অথচ তাদের মতো অমন মর্যাদাপূর্ণ ভালোমানুষি ভাবভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যয়ে-ভরা সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার ধরন অপর কোনো কলোনি-বাসিন্দার আয়ত্ত ছিল না।

প্রথম ও দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনীর সক্রিয় সদস্য হিসেবে উপরোক্ত কলোনি-বাসিন্দারা সকলের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তবু কিছু-কিছু রসিক ছেলে ওদের নিয়ে রসিকতা করার ঝোঁক সব সময়ে যে সামলাতে পারত তা নয়।

ওই বছর হেমন্তকালে প্রথম ও দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনী একটা প্রতিযোগিতার ব্যাপার নিয়ে বড়ই বেসামাল হয়ে পড়েছিল। তখনও পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সোভিয়েত সমাজের কাজের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় নি, তাই

কলোনিতে আগেভাগে এটা চাল্ হওয়ার কারণে জনশিক্ষা-দপ্তরের পীড়ন-কুঠুরিগুলোতে আমাকে দুর্ভোগ পর্যন্ত ভুগতে হয়েছিল। আত্মপক্ষ-সমর্থনে এ-ব্যাপারে আমার একমাত্র বক্তব্য ছিল এই যে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে আপনা থেকেই গজিয়ে উঠেছিল এবং এতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো হাত ছিল না।

প্রথম মিশ্র বাহিনী কাজ করত ভোর ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় মিশ্র দুপুর থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত। এই মিশ্র বাহিনীগুলো তৈরি হোত মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে। পরের সপ্তাহে বাহিনীগুলোতে কলোনির শক্তিসমাবেশে সর্বদাই এক-আধটুকু তারতম্য ঘটত, যদিও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কিছুটা বিশেষীকরণকে মূল্য দিয়েই এই পুনর্বিন্যাস ঘটানো হোত।

প্রতিদিন কোনো একটি মিশ্র বাহিনী যখন দিনের কাজ শেষ করব-করব করছে এমন সময় আমাদের সহকারী কৃষিবিৎ আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ তার দু'মিটার লম্বা মাপকাঠিটা নিয়ে মাঠে গিয়ে নামত। ওর কাজ ছিল ওই মিশ্র বাহিনী কত বর্গমিটার জমি চষেছে তা মেপে বের করা।

মিশ্র বাহিনীগুলো জমিচষার কাজ ভালোই করত, তবে মাটির প্রকৃতি, ঘোড়াগুলোর গুণাগুণ, জমিতে চালু এলাকার আয়তন, আবহাওয়া ও বাইরের অন্যান্য উপাদানের তারতম্য অনুযায়ী কাজের পরিমাণের হেরফের ঘটত। আর নানা ধরনের বিজ্ঞপ্তি লেখার জন্যে নির্দিষ্ট একটা ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর দিনের-পর-দিন আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ চক দিয়ে লিখে চলত নানারকম সংখ্যা। যেমন, একদিন সে লিখল নিচের সংখ্যাগুলো:

১৯ অক্টোবর:

প্রথম মিশ্র করিতো	২,৩৫০	বর্গমিটার
প্রথম মিশ্র ভেত্‌কোভ্‌স্কি	২,৩০০	,, ,,
দ্বিতীয় মিশ্র ফেদরেঙ্কো	২,৪১০	,, ,,
দ্বিতীয় মিশ্র নেচিতাইলো	২,২৭০	,, ,,

আর নিতান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছেলেরা তাদের কাজের ফলাফলের তুলনামূলক বিচারে আগ্রহী হয়ে উঠল। প্রতিটি বাহিনী চেষ্টা করতে লাগল তার আগের বাহিনীর কাজের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে। দেখা গেল সবচেয়ে

সেরা দুই দলপতি — যাদের নাম যে-কোনো তালিকার একেবারে গোড়ায় প্রায়ই দেখা যেতে লাগল — তারা হচ্ছে ফেদরেঙ্কো আর করিতো। বহুদিন ধরেই তারা ছিল পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবু তা সত্ত্বেও পরস্পরের কাজের ফলাফল ঈর্ষার চোখে খুঁটিয়ে দেখায় আর একে অপরের কাজের হাজারো খুঁত বের করায় তাতে কোনো বাধা ছিল না। এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত একটা নাটকীয় অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়ায় ফেদরেঙ্কোর মধ্যে তার যে-প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তার মনের জোরও যথেষ্ট। ঘটনাটার কিছুকাল আগে থেকেই সে অন্য বাহিনীগুলোর চেয়ে এগিয়ে থাকছিল, আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভের ব্ল্যাকবোর্ডে তার কাজের ফলাফল দিনের-পর-দিন ওঠানামা করছিল ২,৫০০ থেকে ২,৬০০ বর্গমিটারের মধ্যে। করিতোর বাহিনী চেষ্টা করছিল সাফল্যের এই সীমানায় পৌঁছে ফেদরেঙ্কোর বাহিনীর সমকক্ষ হতে কিন্তু তারা সব সময়েই এ-থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বর্গমিটার পিছিয়ে থাকছিল আর ফেদরেঙ্কো এ-নিয়ে মস্করা করছিল বন্ধুর সঙ্গে। ফেদরেঙ্কো বলত:

'আরে দোস্ত, বৃথা চেষ্টা! তুই যে এখনও আনাড়ি লাঙ্গলঠেলা চাষী রয়ে গেছিস তা সবাই বোঝতে পারতেছে...'

অক্টোবরের শেষে 'প্রভাতী' নামের ঘোড়াটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। শেরে অতঃপর মাত্র একজোড়া ঘোড়াকে মাঠের কাজের জন্যে বরাদ্দ করে দিলেন এবং দলপতি-পরিষদের কাছে আবেদন জানালেন ফেদরেঙ্কোকে করিতোর বাহিনীতে ঢুকিয়ে নিতে যাতে কাজটা আরও বেশি ফলপ্রদ হয়ে ওঠে।

গোড়ায় ফেদরেঙ্কো অবশ্য এই নতুন ব্যবস্থার নাটকীয় সম্ভাবনার কথাটা ভেবে দেখে নি, কারণ 'প্রভাতী'র অসুখ আর মাত্র একজোড়া ঘোড়া নিয়ে শীত-ফসলের জন্যে জমিচষার কাজটা জোর কদমে চালিয়ে শেষ করার প্রয়োজনীয়তা ওকে খুবই দুশ্চিন্তিত করে তুলেছিল। ফলে প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। ওর সংবিৎ ফিরল একমাত্র তখন, যখন আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখল:

২৯ অক্টোবর: দ্বিতীয় মিশ্র করিতো. ২,৭৩০ বর্গমিটার

এই জয়গৌরবে করিতো অহঙ্কারে ফুলে-ফেঁপে উঠল আর লাপত কলোনিময় বলে বেড়াতে লাগল:

'করিতোর সাথে ফেদরেঙ্কো এ'টে উঠবে কী করে? করিতো, যারে বলে, রীতিমতন একজন কৃষিবিৎ। ওর তুলনায় ফেদরেঙ্কো কী?'

'হুররে' ধ্বনি দিয়ে করিতোকে নিয়ে ছেলেরা লোফালুফি করতে লাগল। ওদিকে ট্রাউজার্সের দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে ঈর্ষায় ফ্যাকাশে মেরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ফেদরেঙ্কো।

'করিতো মস্ত কৃষিবিৎ! বটে!' মাঝে-মাঝে গর্জন করে বলতে লাগল সে। 'এমনধারা কৃষিবিৎ আমি বাপের জন্মে দেখি নাই!'

এদিকে অনবরত সবাই তাকে এই নিরীহ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল:

'করিতো যে জিতেছে তা মানিস তো তুই?'

কিন্তু ফেদরেঙ্কোর মাথায় তখন অন্য মতলব ঘুরছিল। দলপতি-পরিষদের সভায় সে বলল:

'করিতোর অত অহঙ্কার কিসির জন্যি, শুনি? তা, এ-হপ্তায়ও তো একটাই ঘোড়ার জুড়ি কাজ করবে। আমি বলি কী, এবার প্রথম মিশ্র বাহিনীতে আমার তাঁবে করিতোরে দেয়া হোক, আমি তোমাদেরে তিন হাজার বর্গমিটার চাষ করে দেখাব।'

ফেদরেঙ্কোর মতলব ধরতে পেরে খুশি হয়ে উঠল দলপতি-পরিষদ। তার অনুরোধ অনুমোদন পেল। দেখেশুনে করিতো মাথা নাড়ল।

বলল, 'ওহ্, ফেদরেঙ্কোরে নিয়ি আর পারা গেল না! ছোঁড়া ধূর্তের শিরোমণি একবারে!'

'সাবধান!' ফেদরেঙ্কো ওকে শাসনের ভঙ্গিতে বললে। 'আমি তোর হয়ি প্রাণ ঢেলে কাজ করেছি -- এখন তুই যদি কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা পাস তাইলে দেখাব-নে মজা!..'

পরদিনের কাজ শুরু হওয়ার আগেও করিতোকে স্বীকার করতে হল যে সে বিষম বিপাকে পড়েছে।

'কী করা যায়, ক'? ফেদরেঙ্কোর কথাটা ভাবতি হয়, তা বাদে জমিচষার ব্যাপারটা তো আছেই। আর ছোঁড়ারা যদি বলতি শুরু করে যে ভালোমতন কাজ না-করে আমি ফেদরেঙ্কোরে ফাঁসায়েছি, তাইলে সেটাও বড় ভালো ব্যাপার দাঁড়ায় না।'

পরদিন সকালে কাজে বেরনোর সময়ে ফেদরেঙ্কো হাসল, করিতোও

হাসল। লাঙলটার ওপর একটা প্রকান্ড ছপ্‌টি রেখে সেদিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফেদরেঙ্কো।

বলল, 'এইটা দেখতেছিস তো! মাঠে কাজ করার সময় আমি তোরে দুদু-ভাতু খেতি দিব না কিন্তু, মনে রাখিস!'

শুনে করিতো লাল হয়ে উঠল। প্রথমটায় গোটা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, পরে হাসির দমকে।

গজকাঠি-হাতে মাঠ থেকে ফিরে আলিওশ্‌কা যখন নিজের পকেটে চকের টুকরোর সন্ধানে ব্যস্ত হল সারা কলোনি তখন তাকে ছেঁকে ধরল এসে। ছেলেরা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল:

'তারপর — কী দাঁড়াল ব্যাপারটা?'

আর নিঃশব্দে আস্তে-আস্তে বোর্ডের ওপর লিখল আলিওশ্‌কা:

২৬ অক্টোবর: প্রথম মিশ্র ফেদরেঙ্কো... ৩,০১০ বর্গমিটার।

'ওঃ, দ্যাখো কান্ড! — ফেদরেঙ্কো — তিন হাজার বর্গমিটার চষেছে!' হুলুস্থুল পড়ে গেল কলোনিতে।

অবশেষে ফেদরেঙ্কো আর করিতো মাঠ থেকে ফিরে এল। ফেদরেঙ্কোকে বিজয়ীর সম্মান জানাল ছেলেরা। লাপত বলল:

'তখনই বলেছিলাম-না যে করিতো কখনই ফেদরেঙ্কোর সাথে এঁটে উঠবে না? আরে, ফেদরেঙ্কো তো রীতিমতন একজন কৃষিবিৎ!'

অবিশ্বাসভরা চোখে লাপতের দিকে তাকাল ফেদরেঙ্কো। কিন্তু লাপতের এই চালাকি সম্বন্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে ভরসা পেল না। কারণ, জায়গাটা ছিল আবাদ নয়, কলোনির উঠোন, আর লাঙলের মুঠির তীব্র থত্থর কাঁপুনি হাতের মুঠোয় চেপে ধরার সময় সে যতখানি আত্মবিশ্বাস অর্জন করত, কলোনির উঠোনে নিজের ওপর ততখানি আস্থা তার ছিল না।

'করিতো, তুই হার মানলি কী করে?' লাপত শুধোল।

'কমরেড কলোনি-বাসিন্দা সব, ব্যাপারটা নিয়মমাফিক ঘটে নাই। ব্যাপারটা কী হয়েছিল আমি বলতেছি — ফেদরেঙ্কো সাথে করে একখান লাঠি মাঠে নিয়ে গেছিল। তাই দিয়ি কাম ফতে করেছে!'

'নিশ্চয় আমি লাঠি নিয়ে গেছিলাম,' ফেদরেঙ্কো সায় দিল। 'লাঙ্গলখান মাঝে-মাঝেই পরিষ্কার করতে লাগে তো, তাই...'

'কিন্তু ও বলেছিল: 'আমি তোরে দুদু-ভাতু খেতি দিব না'।'

'তা তোরে দুদু-ভাতু খেতি দিবই-বা কেন? আমি তো আবারও বলতেছি — তোরে দুদু-ভাতু খেতি দিয়ে লাভ কী — তুই তো ছুঁড়ি নোস?'

ছেলেরা শুধোল, 'তা তোমারে ও কয়-ঘা লাঠির বাড়ি দেছে?'

'ওহ্, লাঠি দেখে আমি যা ভয় পেয়েছিলাম। তাই খুব খেটেছিলাম আর ওর লাঠি ব্যাভার করার দরকার পড়ে নাই। আচ্ছা, ফেদরেঙ্কো, তোরে একটা কথা শুধাই। কই, তুই তো ওই ছুপ্‌টিটা দিয়ি লাঙ্গল পরিষ্কার করিস নাই?'

'ওখান ছিল একখান বাড়তি ছুপ্‌টি। মাঠে আমি আর-একখান খুব — ওরে কী কয় — মনের মতন ছুপ্‌টি পেয়ে গেছিলাম।'

'ও যদি একবারও তোরে না মেরে থাকে, তাইলে তোর নালিশ-ফইরেদ করার কোনো যুক্তি নাই,' লাপত এবার তার অননুকরণীয় ব্যাখ্যা শুরু করল। 'গোড়া থেকেই তুই ভুল পথ ধরেছিলি, করিতো। তোর আস্তে-ধীরে কাজ করার দরকার ছিল, বুঝলি, আর দরকার ছিল দলপতির সাথে তক্ক জুড়ি দেয়ার। ও তাইলে তোরে ছুপ্‌টি দিয়ি খুব একচোট পিটুনি দিত। ব্যাস, তখন ব্যাপারখান অন্যরকম দাঁড়ায়ে যেত: পরের পর সভা ডাকতি হোত দলপতি-পরিষদের, কম্‌সমোলের কার্যনির্বাহী কেন্দ্রের, গোটা কলোনির, খুব একখান ঝঞ্ঝাট বেধে যেত আর-কি...'

করিতো বলল, 'অত সব আমি ভাবি নাই।'

এইভাবে দৃঢ়সংকল্প আর উদ্ভাবনী দক্ষতার দৌলতে ফেদরেঙ্কো জয়ী হল সেবার।

প্রাচুর্য, ঘন-সন্নিবেশ আর নির্ভরযোগ্যতার প্রসাদ বিতরণ করে হেমন্ত বিদায় নিল। খারকভে চলে গিয়েছিল যারা সেই সব কলোনি-বাসিন্দার অভাব আমরা বোধ করছিলুম ঠিকই, তবু জীবন্ত প্রাণবন্ত মানুষগুলো আর সারাদিনের কঠিন শ্রম আগেকার দিনগুলির মতোই অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসিখুশি আর আনন্দের বেশ ভালোরকম একটা ভাগ দিচ্ছিল আমাদের। এমন কি একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকেও স্বীকার করতে হল:

'বুঝলেন, আমাদের এই যৌথ সংস্থাটা-না, ভারি আশ্চর্য একটা বস্তু! দেখে মনে হচ্ছে যেন তেমন কিছুই ঘটে নি।'

আমারও তখন আগের চেয়ে আরও বেশি করে মনে হচ্ছিল যে সত্যি কথা বলতে গেলে বাস্তবিকই তেমন বিশেষ কিছু ঘটে নি। খার্কভে পরীক্ষাগুলোতে আমাদের 'রাব্ফাক' ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এবং প্রতিনিয়ত এই অনুভূতি যে অন্য একটা শহরে থেকে লেখাপড়া করলেও সপ্তম মিশ্র বাহিনীর কলোনি-বাসিন্দা হিসেবে তারা এখনও রয়ে গেছে -- এই দু'টি ব্যাপার কলোনির আশা-ভরসার ভাঁড়ারে অক্ষয় সম্পদ হয়ে ছিল। সপ্তম মিশ্র বাহিনীর দলপতি জাদোরভ তাদের কাজকর্মের নিয়মিত সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাত, আর সেই রিপোর্টগুলো আমাদের সভা-সমিতিতে পড়া হোত সম্মতিসূচক সানন্দ কলগুঞ্জনের মধ্যে। জাদোরভ তার রিপোর্টগুলো লিখত বিস্তারিত ভাবে, তাতে কে কী বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তার ইঙ্গিত যেমন থাকত তেমনই থাকত সব ব্যাপারে জাদোরভের নিজের মন্তব্য। যেমন:

> 'চের্নিগভের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ার কথা ভাবছে সেমিওন। ওকে চিঠি লিখে বলুন, এই সম্পর্ক কেটে দিতে। 'রাব্ফাক'-এ চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়ানো হয় না বলে ভের্শ্নেভ ঝামেলা করছে. বলছে ব্যাকরণ শিখতে-শিখতে ও নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওকে বলুন, চালিয়াতি একটু কম করতে।'

আরেকবার জাদোরভ লিখল:

> 'অক্সানা আর রাখিল প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমরা ওদের চর্বির ভাগ দিই, আর তার পাল্টা নানা ব্যাপারে ওরা আমাদের সাহায্য করে থাকে -- যেমন, ব্যাকরণ নিয়ে কোল্কার নানারকম অসুবিধে হয়, গোলস বিপদে পড়ে পাটিগণিত নিয়ে, আর তাদের এক-আধটুকু দেখাশোনা করে ওরা। কাজেই আমরা দলপতি-পরিষদের কাছে আবেদন জানাতে চাই যে অক্সানা আর রাখিলকে সপ্তম মিশ্র বাহিনীর সদস্য করা হোক। ওরা নিয়মকানুন মেনে চলে।'

আবার একবার ও লিখল:

'অক্‌সানা আর রাখিলের বুটজুতো নেই, বুট কেনার পয়সাও নেই ওদের। এদিকে আমাদের সকলের বুটজুতো মেরামত করতে হয়েছে, কারণ সারাক্ষণ ফুটপাথের ওপর দিয়ে অনেক হাঁটাচলা করতে হয় আমাদের। আন্তন সেমিওনভিচ যে-টাকা পাঠিয়েছিলেন তা সবই খরচ হয়ে গেছে, কারণ আমাদের সকলের পাঠ্যবই কিনতে হয়েছে, তাছাড়া আমার নিজের জন্যে কিনতে হয়েছে একসেট নক্‌শা আঁকার যন্ত্রপাতি। অথচ অক্‌সানা আর রাখিলের বুট কেনা দরকার। বাজারে একেক জোড়া বুটের দাম সাত রুব্‌ল। এখানে আমাদের খেতে দেয়া হয় বটে, তবে দুঃখের বিষয় তা দেয়া হয় দিনে মাত্র একবার। এদিকে পাঠানো চর্বিটুকু আমরা খেয়ে বসে আছি। সেমিওনটা বড্ড বেশি চর্বি খায়। আবার যদি আমাদের চর্বি পাঠান তাহলে সেইসঙ্গে সেমিওনকে লিখবেন অত বেশি চর্বি না-খেতে।'

কলোনির সাধারণ সভায় ছেলেমেয়েরা সোৎসাহে এইমর্মে একের-পর-এক প্রস্তাব নিল যে সপ্তম মিশ্রকে টাকা পাঠানো হবে, আরও খানিকটা চর্বিও পাঠানো হবে, অক্‌সানা আর রাখিলকে সপ্তম মিশ্রর সদস্য করে নেয়া হবে, ওদের জন্যে পাঠানো হবে কলোনি-বাসিন্দার পরিচায়ক ব্যাজ, সেমিওনকে চর্বি খাওয়া নিয়ে কিছু বলা হবে না -- ওদের তো দলপতি আছে, কাজেই দলপতির যেমন কর্তব্য সেইভাবে এবার থেকে সে নিজে চর্বি ভাগ করে দিক, ভেরশ্‌নেভকে লেখা হোক অযথা ঝামেলা না-করতে এবং সেমিওনকে লেখা হোক চের্নিগভের মেয়েটি সম্পর্কে সাবধান হতে ও ভাবোচ্ছ্বাসের খেয়ালে মাথাটা বোঝাই না-করতে। দরকার হলে চের্নিগভের মেয়েটি বরং নিজেই সরাসরি দলপতি-পরিষদের কাছে চিঠি লিখতে পারে।

আমাদের সাধারণ সভাগুলোকে আঁটোসাঁটো, প্রাণবন্ত, কাজের আলোচনায় পর্যবসিত করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি ছিল লাপতের। 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে চিঠিলেখার বিষয়গুলো চমৎকারভাবে সূত্রবদ্ধ করার ব্যাপারেও ও ছিল সিদ্ধহস্ত। চের্নিগভের মেয়েটি সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্রটি দলপতি-পরিষদের পছন্দসই ঠেকায় সকলেই খুশি হল। ভবিষ্যতে এই সূত্রটি আরও বিস্তারিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। সে পরের কথা।

খার্কভে আমাদের সপ্তম মিশ্রর জীবনযাত্রা আমাদের ইশ্কুলের জীবনেও মৌল পরিবর্তন এনে দিল। সকলের মনেই এই বিশ্বাস শিকড় গাড়ল যে 'রাব্ফাক' সত্যিই একটা অর্জনযোগ্য বাস্তব ব্যাপার -- ইচ্ছে থাকলে যে-কেউ তাতে ভর্তি হতে পারে। ফলে সেবারের হেমন্ত থেকেই ইশ্কুলের পড়াশুনোর ব্যাপারে রীতিমতো লক্ষণীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটতে দেখলুম। 'রাব্ফাক'-এ ঢোকার জন্যে ব্রাত্চেঙ্কো, গেওর্গিয়েভ্স্কি, অসাদ্চি, শনাইদের, গ্লেইসের আর মারুসিয়া লেভ্চেঙ্কো সত্যি-সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশুনো শুরু করে দিল।

ইতিমধ্যে মারুসিয়ার হিস্টিরিয়ার ঢঙ সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছিল এবং একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নার রীতিমতো ভক্ত হয়ে পড়েছিল সে। সর্বত্র তাঁর পিছুপিছু ঘুরত মারুসিয়া, ডিউটিতে বহাল থাকার সময়ে তাঁকে সাহায্য করত, যেখানেই যেতেন তিনি দু'চোখ মেলে তাঁকে সেখানেই অনুসরণ করত আকুলভাবে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে পরিচ্ছন্নতার দারুণ পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল মারুসিয়া, শক্ত উঁচু কলার আর সবচেয়ে কেতাদুরস্ত কাটছাঁটের ব্লাউজ পরতে শিখেছিল সে। এ-সব দেখেশুনে আমি খুশিই হয়েছিলুম। আমাদের সকলের চোখের সামনে মারুসিয়া রীতিমতো সুন্দরী হয়ে উঠছিল।

এমন কি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের দলগুলোতেও -- তাদের কাছে তখনও পর্যন্ত যা ছিল সুদূর সেই 'রাব্ফাক'-এর সৌরভ চুঁইয়ে পেঁছতে শুরু করেছিল। প্রায়ই শোনা যেত আগ্রহী খুদেরা একে-ওকে জিজ্ঞাসা করছে কোন ধরনের 'রাব্ফাক'-এ ঢোকার জন্যে তাদের তৈরি হওয়া উচিত হবে।

নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কো এতখানি উদ্দীপনা নিয়ে পড়াশুনোয় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে সকলেরই নজরে পড়ছিল তা। ওর বয়স হয়েছিল প্রায় ষোল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত নিরক্ষর ছিল ও। স্কুলে পড়ার একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকেই ও কিন্তু অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিতে শুরু করল। তাই সেবারের শীতকালে একসঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করার দায়িত্ব ওর ওপর চাপিয়ে দিলুম আমি। চোখের পাতা দু'টো একলহমা পিটপিট করার মধ্যে দিয়েই আমাকে ধন্যবাদ জানাল নাতাশা, মুখে সংক্ষেপে বলল:

'তা নয়ই-বা ক্যানে?'

ওরই মধ্যে সে আমায় 'খুড়ো' বলে ডাকা বন্ধ করেছিল এবং যৌথ জীবনের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। ওর স্বভাবের এক অনির্দেশ্য সৌন্দর্য, শান্ত আন্তরিক হাসিটি, ওর কথাবলার মিষ্টি ধরন, সবকিছু মিলিয়ে সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিল ও। তখনও পর্যন্ত চোবতের সঙ্গে ও পুরনো বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছিল, আর নিঃশব্দে, বিষণ্নমুখে চোবতও এই সুকুমার প্রাণটিকে শত্রুর হাত থেকে পাহারা দিয়ে চলছিল। কিন্তু ওর এই বিশেষ ভূমিকা পালনের ব্যাপারটা দিনের-পর-দিন ক্রমশ অবাস্তব ও চোবতের পক্ষেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কারণ নাতাশার চারপাশে কোনো শত্রুর চিহ্নমাত্র তো ছিলই না, বরং অন্যান্য মেয়ে এমন কি ছেলের সঙ্গেও নাতাশা বন্ধুত্ব পাতাতে শুরু করে দিল। স্বয়ং লাপতই নাতাশাকে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল যেন। নাতাশার সঙ্গে আচরণে তার ঠাট্টাবিদ্রূপ বা খুনসুটির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, বরং তার প্রতি একান্ত মনোযোগ ও সস্নেহ উপরোধ-অনুরোধের ভাবই প্রকাশ পেতে লাগল লাপতের মধ্যে। ফলে নাতাশা কখন একটু একা হবে এই আশায় চোবতকে সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকতে হোত, প্রতীক্ষা করতে হোত কখন মেয়েটার সঙ্গে দু'টো কথা বলার, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, একেবারে গোপন কিছু প্রাণের কথার নিঃশব্দ আদানপ্রদানের ফুরসত মিলবে।

চোবতের হাবেভাবে কেমন একটা উদ্বেগবৃদ্ধির লক্ষণ নজরে পড়তে লাগল আমার। তাই আমি অবাক হলুম না একদিন সন্ধেবেলা ও যখন এসে বললে:

'আন্তন সেমিওনভিচ, ভাইয়ের সাথে দেখা করব, তাই আমারে কয়েক দিনির জন্যি একটু যদি ছাড়েন!'

'তোমার যে ভাই আছে তা তো জানতুম না।'

'তা, আছে একটা। বগদুখভের কাছাকাছি কোথাও একটা খামার আছে তার। তার কাছ থেকে একখান চিঠি পেয়েছি। দেখবেন?'

চিঠিখানা এগিয়ে দিল চোবত। দেখলুম তাতে লেখা আছে:

'তর অবস্তার কথা যা লিখ্যেছিস তাতে আমার মনে নেয় কী, তুই আমার কাছে চল্যে এলি ভালো হয়। মিকোলা ফিওদরভিচ, ভাইরে আমার, আমার কাছে এস্যে থাক তুই। আমার কুঁড়্যেখান বেশ বড়সড়, আমার মতন এমনধারা খামার খুব অল্প লোকেরই আছে। তা বাদে

ভাইরে বুকে ফিরি পেলি বুকখান আমার ভর্যো ওঠবে-নে। আর তুই যখন মেয়্যাডারে ভালোবাসিস, তখন তারেও সাথে কর্যো নিয়ি আয়-না ক্যানে।'

'তাই আমার মনে নিচ্ছে, ওখেনে গিয়ি ব্যাপারস্যাপার একবার দেখেই আসা যাক।'

'নাতাশার সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলেছ তুমি?'

'বলেছি।'

'তা, সে কী বলে?'

'নাতাশা ভালোমন্দের বোঝে কী? আমার গিয়ি সবকিছু একবার নিজির চক্ষে দেখে আসা দরকার -- ঘর ছাড়ার পর ভাইয়ের সাথে আর তো দেখা হয় নাই।'

'ঠিক আছে, ভাইয়ের কাছে গিয়ে সব দেখেশুনে এস তাহলে। তোমার ভাই সম্ভবত কুলাক, তাই না?'

'আগে যে কুলাক ছিল তা বলব না, একটা মাত্তর ঘোড়া ছিল তার। তবে এখন তার অবস্তা যে কেমন তা অবিশ্যি বলতি পারব না।'

ডিসেম্বরের গোড়ায় চোবত চলে গেল। অনেকদিন বাইরে রইল তারপর।

ওর অনুপস্থিতি নাতাশা বিশেষ লক্ষ্য করল বলে মনে হল না। আগের মতোই শান্ত আর চুপচাপ হয়ে রইল সে, আর কষ্ট করে অধ্যবসায় নিয়ে নিয়মিত পড়াশুনো করে চলল। পরে বুঝলুম, জোর করে ভার চাপিয়ে দিলে মেয়েটা এক শীতের মধ্যে তিনটে ক্লাসের পাঠই সাঙ্গ করতে পারত।

ইশ্‌কুল সম্বন্ধে কলোনি-বাসিন্দাদের এই নতুন মনোভাব কলোনির চরিত্রই পালটে দিল একেবারে। কলোনির চালচলন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসভ্য হয়ে উঠল, নিয়মিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের খুব কাছাকাছি ধরনের একটা চেহারা পেল তা। ওই সময়ে এমন একজনও কলোনি-বাসিন্দা পাওয়া শক্ত হোত পড়াশুনোর প্রয়োজনীয়তা আর গুরুত্ব সম্বন্ধে যার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে মাক্সিম গোর্কি সম্পর্কে কলোনিতে সর্বজনীন আবেগ এই নতুন মানসিকতাকে আরও উঁচু তারে বেঁধে দিল।

কলোনি-বাসিন্দাদের কাছে একখানা চিঠিতে আলেক্সেই মাক্সিমভিচ ওই সময়ে লিখেছিলেন:

'আমি চাই যে 'আমার ছেলেবেলা' বইখানা কলোনি-বাসিন্দারা হেমন্তের এক সন্ধেয় পড়ে ফেল্নক। বইটি থেকে ওরা দেখতে পাবে যে আমিও ঠিক ওদের মতোই ছিলন্ম, কেবল একেবারে ছেলেবেলা থেকে পড়াশ্ননো করার ঝোঁকটা আগাগোড়া টিকিয়ে রাখার মতো বন্দ্ধি ছিল আমার। আরেকটা ব্যাপার হল এই শ্রে কাজকে আমি কখনও ভয় পাই নি। চিরকালই আমি বিশ্বাস করে এসেছি যে 'কামড়ে লেগে থাকলে ফল পাওয়া যাবেই'!'

কলোনি-বাসিন্দারা অনেকদিন ধরেই গোর্কির সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করে আসছিল। আমাদের যে-প্রথম চিঠিখানা 'ইতালিয়া, সোরেন্তো, মাস্‌সিমো গোর্কি' এই আজগবি, সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লিখে পাঠানো হয়েছিল, আমাদেরই অবাক করে দিয়ে সে-চিঠিখানা তাঁর হাতে পেঁাছেছিল। একখানি সন্দর, সহৃদয়, বন্ধন্ত্বপর্ণ চিঠি লিখে আলেক্সেই মাক্সিমভিচ সঙ্গে সঙ্গে তার একটা জবাবও দিয়েছিলেন। আর গোটা একটা সপ্তাহ ধরে অসংখ্যবার পড়ে-পড়ে চিঠিখানাকে আমরা একেবারে জীর্ণ করে ফেলেছিলন্ম। তার পর থেকে আমাদের মধ্যে নিয়মিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলছিল। কলোনি-বাসিন্দারা তাদের নিজ-নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে গোর্কিকে চিঠি লিখত, তারপর 'সম্পাদনা'র জন্যে নিয়ে আসত আমার কাছে। কিন্তু আমার মনে হোত কোনোরকম সম্পাদনা করারই দরকার নেই, বরং চিঠিগন্লো যত বেশি স্বাভাবিক হবে ততই গোর্কি সেগন্লো পড়ে উপভোগ করবেন বেশি। তাই চিঠির সম্পাদক হিসেবে আমার কাজ প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকত এই ধরনের মন্তব্য করায়, যেমন:

'চিঠিলেখার এর চেয়ে ভালো কাগজ আর খ্ঁজে পেলে না তোমরা?'

কিংবা:

'কই? সকলের সই কোথায় চিঠির নিচে?' ইত্যাদি।

ইতালি থেকে যখনই চিঠি এসে পেঁাছত তখনই প্রতিটি কলোনি-বাসিন্দা চাইত চিঠিখানাকে মিনিটখানেকের জন্যে নিজের হাতে ধরে থাকতে, লেফাফার

ওপর গোর্কি স্বয়ং যে ঠিকানা লিখেছেন এই ব্যাপারটায় একেবারে তাজ্জব বনে যেতে এবং ডাকটিকিটে রাজার ছবির দিকে বারেক তেরছা চোখে তাকাতেও।

ওরা বলত, 'ওয়ারা ব্যাপারটা এতদিন সহ্য করতেছে কী বলে? ওই ইতালিয়ানগুলো? দেশে রাজা বহাল রাখার দরকারটা কী?'

একমাত্র আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছিল গোর্কির চিঠি খোলার। প্রত্যেকটা চিঠি খোলার পর একবার বা দু'বার জোরে-জোরে চেঁচিয়ে পড়তে হোত আমাকে। তারপর চিঠিখানা দিতে হোত দলপতি-পরিষদের সেক্রেটারির হাতে। আর তখন মুগ্ধ ভক্তরা প্রাণভরে বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়ত সেখানা। এই পড়ার ব্যাপারে লাপত কেবল একটিমাত্র শর্তই আরোপ করে ছিল। তা এই:

'খবরদার, লেখার শব্দগুলোর নিচি আঙ্গুল বুলাবি না। তোদের সক্কলের তো চোখ আছে, নাকি? কাজেই আঙ্গুলের সাহায্য ছাড়াই চিঠি পড়তি লাগবে।

গোর্কির চিঠির প্রতিটি পংক্তি থেকে ছেলেরা একেকটা গোটা জীবনদর্শনই আবিষ্কার করে বসত। যেহেতু পংক্তিগুলো বিন্দুমাত্র দ্ব্যর্থবোধক ছিল না সেইহেতু এই সব আবিষ্কার আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য ঠেকত। ছেলেদের কাছে বইয়ের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা মনে করত বই নিয়ে তর্ক করা চলে, বইয়ে খাঁটি কথা লেখা না-থাকলে তার কড়া সমালোচনা করতেও বাধা নেই। কিন্তু এটা বইয়ের ব্যাপার ছিল না, এ ছিল স্বয়ং মাক্সিম গোর্কির নিজ হাতে লেখা সত্যিকার জীবন্ত সব চিঠি।

প্রথম-প্রথম ছেলেরা গোর্কির নামকে প্রায় পুজো করত, মনে করত তিনি অন্য সক্কলের ওপরে, তাঁকে অনুকরণ করার চিন্তাও তারা পাপ বলে গণ্য করত। 'আমার ছেলেবেলা' বইটিতে যে গোর্কির নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথাই লেখা হয়েছে তা তারা যেন বিশ্বাস করতে পারত না। বলত:

'ওনার মতন লেখক আর আছে কোথাও? আশ্চর্যি, জীবনের কত দিকই না দেখেছেন উনি! শুধু দ্যাখেন নাই, লিখেওছেন সে-সমস্ত কথা — এমন কি যখন উনি খুদে বাচ্চা ছিলেন তখনও আর পাঁচজনার মতন সাধারণ ছিলেন না।'

কলোনির ছেলেদের এই শাদা কথাটা বোঝাতে আমাকে একেবারে হিমসিম খেতে হয়েছিল যে গোর্কি তাঁর চিঠিতে সত্যি কথাই লিখেছিলেন এবং একজন প্রতিভাধর মানুষের পক্ষেও কঠিন পরিশ্রম ও পড়াশুনো না-করে

উপায় নেই। জীবন্ত একটি মানব-শিশুর — বইয়ের সেই আলিওশা যার জীবন নাকি বহু কলোনি-বাসিন্দার জীবনের অনুরূপ ছিল — তার প্রাণবন্ত নানা চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য আমাদের সকলের কাছে ক্রমশ বেশ পরিচিত আর বোধগম্য ঠেকতে লাগল। আর এর ফলে হল কী, ছেলেরা আলেক্সেই মাক্সিমভিচকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে আরও বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠল। তারা স্বপ্ন দেখতে লাগল একদিন-না-একদিন তিনি কলোনিতে আসবেনই, আবার একই সঙ্গে যেন পুরো বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না যে এরকম অঘটন কোনোদিন ঘটতে পারে।

'কলোনিতি আসবেন ওনি? তোরা নিজিদের কী ভাবিস বল্ তো? আর সকলের থেকে সেরা, নাকি? গোর্কি'র চেনাজানা তোদের মতন হাজার-হাজার — অমন দশ-বিশ হাজার ছেলে আছে... বুঝলি!'

'তাতে হলটা কী? তুই কি মনে করিস তিনি তাদের সক্কলের কাছে চিঠি লেখেন?'

'কী ভাবিস তুই, লেখেন না তিনি! দিনে তিনি অমন খানবিশেক চিঠি লেখতি পারেন - তাইলে হিসাব কর্ মাসে কয়খান চিঠি হয়! ছয়-শো! এবার বুঝলি ব্যাপারখান!'

এ-ব্যাপারে ওরা রীতিমতো খোঁজখবর নিতে শুরু করল। বিশেষ করে আমার কাছে এল জানতে যে গোর্কি দিনে ঠিক ক'খানা করে চিঠি লেখেন বলে আমার ধারণা।

বললুম, 'আমার তো মনে হয়, একখানা বা দুখানা। তাছাড়া, রোজ নয় নিশ্চয়ই।'

'এয়া হতিই পারে না! ওনি নিশ্চয়ই আরও বেশি চিঠি লেখেন!'

'না, তা কী করে হবে? ও'কে অনেক বই লিখতে হয়, তার জন্যে তো সময়ের দরকার, নাকি? তাছাড়া কত লোক রোজ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তার কোনো আন্দাজ আছে তোমাদের? এর পরও কী মনে কর? তাঁর কিছুটা বিশ্রামের তো দরকার আছে, নাকি নেই?'

'তাইলে, আপনের মতে, ওনি যখন আমাদেরে চিঠি লেখেন তখন বলতি হবে আমরা ওনার বন্ধু — গোর্কি'র বন্ধু?'

বললুম, 'না ঠিক বন্ধু নয়, আমরা হলুম গিয়ে গোর্কিপন্থী। উনি আমাদের প্রধান। তবে, হ্যাঁ, আমরা যদি ও'কে এইরকম চিঠিপত্র লিখে যেতে

থাকি আর চাই-কি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি, তাহলে একদিন আমরা ওঁর বন্ধু হলেও হতে পারি। গোর্কির তেমন বেশি বন্ধু তো নেই।'

কলোনির যৌথ জীবনে গোর্কির মনগড়া প্রতিরূপ অবশেষে যথাযথ স্বাভাবিক আকার ধারণ করল। আর একমাত্র তখনই আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম যে এক বিরাট পুরুষের সামনে ভয়ে নতজানু হওয়া নয়, এক মহৎ লেখকের প্রাপ্য শ্রদ্ধানিবেদনও ঠিক নয়, এই সুদূর, বরেণ্য তবু সবকিছু সত্ত্বেও মূলত মানবিক এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি গোর্কিপন্থীদের সত্যিকার কৃতজ্ঞতাবোধ, আলেক্সেই মাক্সিমভিচের প্রতি খাঁটি, আবেগকম্পিত ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে ছেলেদের মধ্যে।

কিন্তু এই ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো কলোনি-বাসিন্দাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। চিঠিতে কী করে ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয় তা ওরা জানত না, এমন কি তা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠা ছিল ওদের। যে-কোনো ধরনের মানসিক আবেগকে চেপে রাখার ব্যাপারে কঠোর সংযম অভ্যেস করার ফলে ঘটেছিল এটা। অবশেষে গুত ও তার বাহিনী এ-সমস্যার একধরনের একটা সমাধান বের করে ফেলল। আলেক্সেই মাক্সিমভিচের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে তারা ওঁর পায়ের মাপ চেয়ে পাঠাল, লিখল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একজোড়া হাইবুট তৈরি করে পাঠাতে চায় ওঁকে। প্রথম বাহিনী এ-বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল যে গোর্কি তাদের অনুরোধ রাখবেন, কারণ একজোড়া বুটের মূল্য সর্বদাই স্বীকার্য। অবশ্য খুব কম লোকই আমাদের জুতো তৈরির কারখানা থেকে বুটজুতো বানানোর অর্ডার দিত। আর যখন সত্যিই অর্ডার পেতুম তখন অত্যন্ত ঝামেলায় পড়ে যেতুম আমরা, কারণ উপযুক্ত মালমশলা কিংবা পায়ের ভালো ছাঁচ বা লাসের সন্ধানে বাজারে প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হোত, তাছাড়া চামড়াও কিনতে হোত সুকতলা আর অস্তর হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। যা পায়ে আঁটো হবে না আবার একই সঙ্গে দেখতেও হবে কেতাদুরস্ত এমন বুটজুতো বানাতে হলে জুতো তৈরির ভালো কারিগর হওয়া দরকার। তবু আমাদের প্রথম বাহিনীর দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে একজোড়া হাইবুট গোর্কির সর্বদাই কাজে লাগবে, তদুপরি তিনি এই ভেবে আনন্দ পাবেন যে বুটজোড়া কোনো ইতালিয়ান মুচির তৈরি নয় আমাদের কলোনি-বাসিন্দাদের নিজ হাতে তৈরি।

মস্ত কারিগর হিসেবে নামডাক আছে এমন আমাদের পরিচিত শহরের এক

মুচি একবার কলোনিতে এল একবস্তা দানা-ফসল ভাঙিয়ে নিতে। সে-ও কলোনি-বাসিন্দাদের উপরোক্ত মতে সায় দিল। বলল:

'ইতালিয়ান আর ফরাসিরা আমাদের মতন হাইবুট পায়ে দেয় না। হাইবুট কী কর্‌ন্যে বানাতি হয় তা-ও জানে না তারা। কিন্তু গোর্কির জন্যি তমরা কেমনধারা বুট বানাতি চাও, তা-ই কও দেখি? ওনার কেমনধারা পছন্দ তা-ই আগে জানা দরকার — গোটাটা এট্টা টুকরা চামড়া দিয়ি তৈরি, নাকি আগায় আলাদা চামড়ার ঢাকনি পরানো? তা বাদে গোড়ালি আর মাথাডাই-বা কোন প্রেকারের? ওগুলান যদি নরম চামড়ায় বানানোর দরকার পড়ে তো সে এক প্রেকার হয়, কিন্তু কিছু লোক আবার বুটের মাথাডা শক্তমতন চায়। তারপর, ধর না ক্যানে চামড়া নিয়ি সমিস্যে — বুট অবিশ্যি তোমাদের বানাতি লাগবে ছাগলছ্যানার চামড়া দিয়ি আর মাথার দিকটা বাছুরের ক্রোমলেদার দিয়ি। এ বাদে লম্বার দিকটে আবার আরেক সমিস্যে।'

ব্যাপারটার এতসব জটিলতার কথায় বিহ্বল হয়ে পড়ে গুত আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এল। বলল:

'ধরেন যদি বুটজোড়া ভালো না হয়? তাইলে সবকিছু ভেস্তে যাবে-নে। তাছাড়া বুট বানাব কী দিয়ি — ছাগলের চামড়া, না পেটেন্ট লেদার? তাছাড়া পেটেন্ট লেদার খুঁজে বার করবেটা কেডা? আমি? কে জানে, হয়তো কালিনা ইভানভিচ পারতি পারেন। কিন্তু উনি তো খালি এককথাই বলতেছেন, গোর্কির জন্যি বুট বানানোর তোরা কে, অপদাথরা? উনি বলতেছেন, ইতালির রাজার মুচিই নাকি গোর্কির বুটজুতা বানায়ে দেছে।'

কালিনা ইভানভিচের কথা থেকে বোঝা গেল গুত সত্যি বিবরণই দিয়েছে। কালিনা বলল:

'তা আমি মিছা কথা বলছি নাকি? এখনও পর্যন্ত 'গুত কোম্পানি' নামে কোনো জুতার দোকান হয় নাই। এ বাদে তমরা ঠিকমতো বুটজুতা বানাইতেই শিখ নাই। গোর্কির এমন একজোড়া বুট চাই যা মোজার উপর পরন চলব, তাঁর পায়ে কড়া ফালাইলে চলব না। আর তমরা কেমনধারা জুতা বানাও তার হিসাব রাখ কিছু? পায়ে তিন পট্টি তেনা জড়াইলেও জুতা পায়ে বেন্ধে। অপদাথ যত্তোসব! এখন গোর্কির পায়ে কড়া না বাধান পর্যন্ত তোমাগো শান্তি নাই দ্যাখতাছি!'

একেবারে মরমে মরে গেল গুত। এত সব সমস্যার কথা ভেবে-ভেবে সে সত্যিই শুকিয়ে যেতে লাগল।

গোর্কি'র জবাব মিলল একমাস পরে। তিনি লিখলেন:

'বুটজুতোর দরকার হয় না আমার। প্রায় গ্রামে থাকি বলতে গেলে। বুট ছাড়াই এখানে দিব্যি চলে যায়।'

পাইপে আগুন দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ঘাড় টানটান করে কালিনা ইভানভিচ বললে:

'বলছিলাম-না. উনি হইলেন গিয়া প্রাজ্ঞ লোক, ঠিকই বোঝছেন উনি যে তমার বুটজুতা পায়ে দেয়নের থেইক্যা বুট ছাড়াই চলাফিরা করা মঙ্গল। এই ধর না ক্যান, সিলান্তি। সে তো সবকিছুতেই অভ্যস্ত, তবু তমার বানানো বুটজুতা-জোড়া পায়ে দিয়া সে দেখি ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ত্যাছে।'

চোখ পিটপিট করে গুত বলল:

'কারিগর এখেনে আর খদ্দের ইতালিতে বসি থাকলে অবিশ্যি ভালো বুটজুতা কোনোদিনও বানানো যায় না। তবে ঘাবড়ায়েন না, কালিনা ইভানভিচ, এখনও সামনি যথেষ্ট সময় পড়ি আছে! গোর্কি যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন আমাদের এখেনে আসেন তবে দ্যাখবেন কেমন একজোড়া বুট ওনারে বানায়ে দিই আমরা!..'

এইভাবে হেমন্তের বাকি দিনগুলো কেটে গেল শান্তিতে।

শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের ইন্‌স্পেক্টর লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না দ্‌জুরিন্‌স্কায়ার কলোনিতে আগমন ছিল একটা ঘটনাবিশেষ। খার্‌কভ থেকে অতখানি পথ ভেঙে তিনি এসেছিলেন কলোনি দেখতে, আর সাধারণত ইন্‌স্পেক্টরদের যেভাবে আমি অভ্যর্থনা জানাতুম সেইরকম, বারবার শিকারির ফাঁদে-পড়া নেকড়ের সতর্কতা নিয়ে, এবারও তাঁকে অভ্যর্থনা জানালুম। গোলাপি গাল আর হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নাও তাঁর সঙ্গে এলেন।

'আসুন, এই বুনো মানুষটির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই,' মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না বললেন। 'আগে ভেবেছিলুম ইনি বুঝি বেশ রসিক লোক। ওমা, কোথায় যাব, পরে জেনেছি ইনি একেবারেই সাধুসন্ত। আমার মনমেজাজ

একদম বিগড়ে দিয়েছেন ইনি — এখন বিবেক-দংশন অনুভব করতে শুরু করেছি।'

হাত দিয়ে বোকভার দুই কাঁধ চেপে ধরে দ্‌জুরিন্‌স্কায়া বললেন:

'যাও, এবার ভাগো দেখি — তোমার ছ্যাবলামি ছাড়াও আমাদের চলবে।'

'সানন্দে রাজি!' স্নেহভরে, গালের টোল দুটি ফুটিয়ে তুলে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। 'আমার ছ্যাবলামিকে মূল্য দেয়ার মতো যথেষ্ট লোক মিলবে এখানে। তা, আপনার বাচ্চারা কোথায়? দেখছি না যে! নদীর ধারে নাকি?'

আর সত্যিই একেবারে নদীর পাড় থেকে এই সময়ে শেলাপুতিনের চড়া রিন্‌রিনে গলা ভেসে এল, 'মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না! মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না! এদিকে আসেন — ভারি সোন্দর এট্টা স্লেজগাড়ি পেয়ে গেছি আমরা!'

নদীর দিকে যেতে-যেতেই মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু আমাদের দু-জনের জায়গা হবে তো ওতে?'

'যথেষ্ট, যথেষ্ট! কোল্‌কাও আসতেছে! কিন্তু আপনে দেখি স্কার্ট পরে আছেন, পড়ি গেলে কিন্তু মুশকিল বাধবে।'

'ভয় নেই — আমি ঠিকমতো পড়তেও জানি,' দ্‌জুরিন্‌স্কায়ার দিকে চকিতে একটা দৃষ্টি হেনে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে বললেন।

কলমাকের তুষারে-জমাট ঢালু পাড়ের দিকে ছুটে চললেন উনি। ওঁর গতিপথের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দ্‌জুরিন্‌স্কায়া বললেন:

'আশ্চর্য মেয়ে! আপনাদের এ-জায়গাটা ওর একেবারে ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে দেখছি।'

বললুম, 'অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। অতিরিক্ত গোলমাল করার জন্যে আমার শিগ্‌গিরই ওঁকে পেনাল্টি ডিউটি দিতে হবে মনে হচ্ছে।'

'বাঃ, আপনি দেখছি আমার ডিউটির কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমি কিন্তু এখানে এসেছি শৃঙ্খলার বিষয়টা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। তাহলে অস্বীকার করছেন না যে আপনি শাস্তি দিয়ে থাকেন, এই সব 'পেনাল্টি ডিউটি'ফিউটি দেন... তাছাড়া শোনা যায় যে এখানে নাকি আরও কিছু-কিছু নিয়ম চালু আছে — যেমন, গ্রেপ্তার করা... আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে রক্ষণাধীন ছেলেদের শাস্তি দিতে আপনি তাদের শুধু রুটি-জল খাইয়ে রাখেন?'

দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া মহিলাটি দেখল্‌ম বেশ লম্বা, ম্‌খে খোলা মনের ছাপ স্পষ্ট, চোখ দ্‌'টি স্বচ্ছ, তার্‌ণ্যে-ভরা। হঠাৎ কেমন যেন মনে হল যে কূটনৈতিক ধরনধারণ সম্প্‌র্ণ বাদ দিয়ে ওঁর সঙ্গে চলা সম্ভব। বলল্‌ম:

'কাউকে শ্‌ধ্‌ র্‌টি-জল খাইয়ে অবশ্য রাখি না, তবে কখনও-সখনও এদের একবেলার খাওয়া বন্ধ করে দিই। হ্‌ঁ, পেনাল্টি ডিউটিও দিয়ে থাকি। কখনও-কখনও গ্রেপ্তারও করি। তবে হাজত-ঘরে নয় অবশ্যই, আমার অফিস-ঘরে আটক রাখি মাত্র। আপনি যে খবর পেয়েছেন তা ঠিকই।'

'দেখ্‌ন — এ-সবকিছ্‌ই কিন্তু করা নিষিদ্ধ।'

'এর কোনো কিছ্‌ই আইন অন্‌যায়ী নিষিদ্ধ নয়। তবে, বলতে পারেন, পাঁচমিশেলি হরেকরকম কলমপিষিয়েদের লেখা আমি পড়ি না।'

'অর্থাৎ শিশ্‌জীবন-সম্পর্কিত বিজ্ঞানের বইপত্র আপনি পড়েন না! এ-কথাই বলতে চান তো?'

'ওসব পড়া বছর তিনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত! পড়াশ্‌নো মোটেও করেন তো?'

'যথেষ্ট পড়াশ্‌নো করি। আর আমি মোটেও লজ্জিত নই — কথাটা মনে রাখবেন! আর যারা শিশ্‌জীবন-সম্পর্কিত বিজ্ঞানের বই পড়ে তাদের প্রতি আমার খ্‌বই কর্‌ণা হয়।'

'আপনার এই মতের পরিবর্তন ঘটাতে হবে আমায় — সত্যি, এটা আমি করবই! সোভিয়েত শিক্ষা-বিজ্ঞান আমাদের চাই-ই চাই।'

মনে-মনে স্থির করল্‌ম, আলোচনাটার এইখানেই ইতি টানা যাক। লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌নাকে বলল্‌ম:

'দেখ্‌ন, আমি তর্ক করতে চাই না! কেবল বলতে চাই, আমার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস যে এখানে — এই কলোনিতে — সত্যিকার সোভিয়েত শিক্ষা-বিজ্ঞান গড়ে তুলেছি আমরা। শ্‌ধ্‌ তাই নয়, আমাদের এখানকার পদ্ধতি একেবারে কমিউনিস্ট শিক্ষাদান-পদ্ধতি। এ-বিষয়ে আপনার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাতে পারে হয় নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, আর নয়তো বিষয়টা সম্পর্কে ঐকান্তিক গবেষণাভিত্তিক কোনো লেখা পড়ে। শ্‌ধ্‌মাত্র আলোচনার মধ্যে দিয়ে এ-জিনিস সম্পর্কে ধারণা করা যাবে না। আপনি কি বেশিদিন থাকতে এসেছেন?'

'দ্‌'দিন মাত্র।'

'চমৎকার! ওতেই হবে! আপনার হাতে প্রয়োগের জন্যে নানারকম পদ্ধতি থাকবে। ঘুরে-ঘুরে চারিদিক দেখতে পারেন আপনি, কলোনি-বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, কাজকর্ম, বিশ্রাম সবকিছুই একসঙ্গে করতে পারেন। তারপর আপনার যা খুশি সিদ্ধান্ত টানতে পারেন, ইচ্ছে করলে আমাকে এই পদ থেকে ছাঁটাই করতেও পারেন। এমন কি আপনি আপনার সবরকম সিদ্ধান্ত লিখেও ফেলতে পারেন আর আপনার পছন্দসই যে-কোনো পদ্ধতি আমার ওপর চাঁপিয়েও দিতে পারেন। সে-অধিকার আপনার আছে। তবে আমি কিন্তু যা উপযুক্ত মনে করব সেইভাবে কাজ করে যাব এবং যথাসাধ্যই করে যাব। শাস্তি না-দিয়ে কীভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়া যায় তা আমার অজানা। ওই কায়দাটা আমার এখনও শেখা বাকি।'

লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না দু'দিন নয়, দিন চারেক আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলেন, এবং ওই চার দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা প্রায় হলই না বলতে গেলে। ওঁর সম্পর্কে ছেলেদের মন্তব্য ছিল এইরকম:

'ওঃ, ভারি কড়া ঠাকরুন একবারে — কত ধানে কত চাল তা ওনার জানা!'

লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না কলোনিতে থাকার সময়ই ভেত্‌কোভ্‌স্কি একদিন আমার কাছে এল। বলল:

'আমি কলোনি ছেড়ে চলে যেতেছি, আন্তন সেমিওনভিচ...'

'যাবে কোথায়?'

'এট্টা জায়গা খুঁজি নেব কোথাও। এখেনে জীবন একঘেয়ে হয়ি ওঠতেছে। আমি 'রাব্‌ফাক'-এ ভর্তি হতি চাই না, ছুতোর-মিস্ত্রিও হতি মন চায় না। আমি এমনে এদিক-সেদিক ঘুরি বেড়াব আর দুনিয়াটারে এক-নজর ঠাহর করি দেখব, এই আর-কি।'

'আর তারপর? তারপর কী হবে?'

'সে দেখা যাবে-নে। আপনে আমার কাগজপত্তর দিয়ি দেন।'

'ঠিক আছে। আজ সন্ধের দলপতি-পরিষদের মিটিঙ হবে। তোমাকে সবাই যেতে দেবে কিনা তা দলপতি-পরিষদই ঠিক করবে।'

দলপতি-পরিষদের সভায় ভেত্‌কোভ্‌স্কি একদম বিগড়ে যাওয়ার মনোভাব দেখাল এবং কেবলমাত্র যেটুকু না-বললে নয় সেই আনুষ্ঠানিক উত্তরটুকুর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেল। বলল:

'আমার ভালো লাগতেছে না এখেনে। জোর করি আমারে ধরে রাখতি চায় কে? আমার যেখেনে খুশি সেখেনে যাব আমি। কী করব না-করব সে সম্পন্ন আমার নিজির ব্যাপার... কে জানে, হয়তো-বা চুরিই করব।'

শুনে কুদ্‌লাতি খেপে গেল একেবারে। বলল:

'তুই বলতি চাস এয়া আমাদের মাথাব্যথার ব্যাপার না? তুই গিয়ি চুরি করবি, আর আমরা তা নিয়ি মাথা ঘামাব না? বটে? আর ধর্‌ যদি এই ধরনের কথাবাত্তা বলার জন্যি আমি হঠাৎ উঠি তোর থুতনিতে সজোরে একখান ঘুসো কষাই, তাইলেও কি তুই মনে করবি যে এয়া আমাদের ব্যাপার না?'

শুনে লিউবোভ সার্ভেলিয়েভ্‌না কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেলেন। মনে হল যেন কিছু বলতে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু একটু দেরি করে ফেলায় তার আগেই উত্তেজিত কলোনি-বাসিন্দারা চেঁচামেচি করে ভেত্‌কোভ্‌স্কিকে ধমকাধমকি করতে লাগল। ভোলখভ গিয়ে কোস্তিয়ার সামনে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল:

'তোরে হাসপাতালে পাঠানো উচিত! এই হল গিয়ে আসল কথা! ওনারে সব কাগজপত্তর দিয়ে দিতি হবে, মাইরি আর-কি!.. তা তুই আসল সত্যি কথাটা বলে ফ্যাল-না? তুই অন্যত্তর কাজ পেয়েছিস, তাই না?'

রাগে সবচেয়ে বেশি দাপাদাপি করল গুত। বলল:

'আমাদের কলোনির চারপাশে তো বেড়া দেয়া নাই? বেড়া আছে কি? না, নাই! তা তুই যখন এমন এক হতচ্ছাড়া — তোর হাত থেকে মুক্তি পেলি ভালো! তুই কি ভাবতেছিস যে 'মলদিয়েৎস'রে গাড়িতে জুতি আমরা তোর পিছুপিছু ধাওয়া করব? মোট্টেও না! যা, তোর যে-চুলায় ইচ্ছা চলে যা! এখেনে তুই মরতি এসেছিলিই-বা কেন?'

লাপত আলোচনার অবসান ঘটাল এইভাবে:

'থাক, মতামত দেয়া যথেষ্ট হয়েছে। যাই হোক, এইটা পরিষ্কার হয়েছে যে কোস্তিয়া তোরে আমরা কোনো কাগজপত্তর দিব না।'

মাথাটা বুকের ওপর নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল কোস্তিয়া:

'কাগজপত্তর চাই না আমি — কাগজ ছাড়াই চলি যাব। আমারে খালি রাহাখরচ বাবদ দশ রুব্‌ল দে।'

'আমরা দিব কি?' লাপত প্রশ্ন করল।

সকলে চুপ মেরে গেল। চোখ বুজে সোফার পিঠে মাথাটা হেলিয়ে দেয়া

সত্ত্বেও দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া কান খাড়া করে রইলেন। এবার কভাল কথা বললে:

'কম্‌সমোল সংগঠনের কাছে এ-ব্যাপারে ও আবেদন জানিয়েছিল। আমরা ওরে কম্‌সমোল থেকে বার করে দিয়েছি! কিন্তু আমার মনে হয় ওরে দশ রুব্‌ল দেয়া চলে।'

'ঠিক আছে!' কে যেন বলে উঠল। 'ওরে দশ রুব্‌ল দিতি আমাদের আপত্তি নাই।'

আমি এবার পকেটবইখানা বের করলুম। বললুম:

'আমি ওকে কুড়ি রুব্‌ল দেব। একখানা রসিদ লিখে দাও।'

সকলের নিস্তব্ধতার মাঝখানে কোস্তিয়া খসখস করে একখানা রসিদ লিখে দিল। তারপর নোটগুলো পকেটে ঠেসে গুঁজে দিয়ে মাথায় টুপি চড়াল।

'বিদায়, কমরেড-সব!'

কেউ উত্তর দিল না। তারপর ও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন লাপত হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল:

'হেই! যখন তোর বিশ রুব্‌ল খরচা হয়ি যাবে তখন লজ্জা পাস না, কলোনিতি ফিরে আসিস! কাজ করে টাকাটা শোধ দিলি চলবে তখন!'

সভা ভাঙল। বিরক্তভাবে দলপতিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এতক্ষণে লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। বললেন:

'কী সাংঘাতিক! কারও একজনের ছেলেটার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল বোধহয়...'

তারপর এক মুহূর্ত চিন্তা করে ফের বললেন:

'তবে আপনার এই দলপতি-পরিষদ এক সাংঘাতিক শক্তি! উঃ, কী সব ছেলে!..'

পরদিন সকালে কলোনি ছাড়লেন তিনি। স্লেজখানা তৈরি করে নিয়ে এল আন্তন। স্লেজের ওপর কিছু নোংরা খড়কুটো আর কাগজের টুকরো পড়ে ছিল। লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না ইতিমধ্যেই স্লেজে উঠে বসে ছিলেন। আন্তনকে শুধোলুম:

'স্লেজে এত জঞ্জাল কেন?'

'আমি ঠিক সময় পাই নাই,' লাল হয়ে উঠে বিড়বিড় করে বলল আন্তন।

'শহর থেকে আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত নিজে গ্রেপ্তার হয়ে থাক।'

আন্তন বলল, 'ঠিক হ্যয়!' তারপর প্লেজের কাছ থেকে সরে গিয়ে শুধোল, 'কোথায়? আপিসে?'

'হ্যাঁ।'

আমার কঠোর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পায়ে-পায়ে অফিসের দিকে হেঁটে গেল আন্তন। আমরাও রওনা হয়ে গেলুম কলোনি থেকে। আগাগোড়া চুপচাপ রইলেন লিউবোভ সার্ভেলিয়েভ্না। একেবারে স্টেশনের কাছাকাছি চলে আসার পর তবে তিনি আমার বাহুমূল চেপে ধরে বললেন:

'এত কঠোর কেন আপনি? আপনার যৌথ সংস্থা তো অতুলনীয়। এ এক অলৌকিক কাণ্ড, বলতে গেলে। আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি... আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আপনার ওই ছেলেটি... কী যেন নাম ওর? আন্তন? -- হ্যাঁ, আন্তন এখনও গ্রেপ্তার হয়ে আছে?'

কথাটা শুনে দ্জুরিন্স্কায়ার দিকে অবাক হয়ে তাকালুম।

বললুম, 'অত্যন্ত আত্মসম্মানী ছেলে আন্তন। অবশ্যই ও এখনও গ্রেপ্তার হয়ে আছে। তবে সবাইকে একসঙ্গে ধরলে... ওরা একপাল বাঘের বাচ্চা ছাড়া কিছু নয়!'

'অমন কথা বলবেন না! এ-সবই আপনার কোস্তিয়ার জন্যে হচ্ছে! আমার ধারণা, ছেলেটা নির্ঘাত ফিরে আসবে। এ-সবই যেন অবিশ্বাস্য! ভারি চমকপ্রদভাবে সবকিছু চালাচ্ছেন আপনি! আর আপনার কোস্তিয়াই হল এদের মধ্যে সবসেরা...'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললুম খালি। কোনো উত্তর দিলুম না।

১৩

প্রেম ও কাব্যিভাবের নোংরা দিক

১৯২৫ সাল শুরু হল। বছরটা শুরুই হল অপ্রীতিকর একটা ঘটনা দিয়ে।

দলপতি-পরিষদের সভায় অপ্রিশ্কো ঘোষণা করল যে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু বুড়ো লুকাশেঙ্কো তার হাতে মারুসিয়াকে দেবে না যদি-না

কলোনি তাকে ওলিয়া ভোরনভার মতো অত ভালো 'যৌতুক' দেয়। তবে ওই পরিমাণ বিষয়-আশয়ের মালিক হলে অবশ্য লুকাশেঙ্কো তাকে নিজের বাড়িতে স্থান দিতে আর তাকে নিয়ে একত্রে জমিজিরেত চাষ-আবাদ করতে রাজি আছে।

দলপতি-পরিষদের সভায় অপ্রেশ্‌কো এমন অপ্রীতিকর ভাবভঙ্গি করতে লাগল যে মনে হল যেন সে ওরই মধ্যে লুকাশেঙ্কোর উত্তরাধিকারী আর বিত্তবান বনে গেছে।

গোটা ব্যাপারকে যে কীভাবে নেয়া উচিত তা বুঝে উঠতে না-পেরে দলপতিরা চুপ করে রইল। অবশেষে লাপত হাতে-ধরা পেন্সিলটার চোখা মুখের ওপর দিয়ে অপ্রেশ্‌কোর দিকে তাকাল। শান্তভাবে বলল:

'ঠিক আছে, দ্‌মিত্র, কিন্তু তুই নিজে কী মনে করিস? যদি তুই গিয়ি লুকাশেঙ্কোর সাথে থাকিস, তাইলে তার অর্থ কি এই দাঁড়াবে যে তুই গাঁয়ের লোকদের একজনা বনে যাবি?'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় কাত করে লাপতের দিকে তাকাল অপ্রেশ্‌কো। ব্যঙ্গের সুরে হেসে বলল:

'তা তোর নিজির মতন করে বললি তা-ই দাঁড়ায় বটে -- গাঁয়ের লোক।'

'তা তোর মতন করে বললি কী দাঁড়ায়?'

'কী দাঁড়ায় তা সময় এলিই দেখা যাবে-নে!'

'হুঁ, বোঝলাম,' লাপত বলল। 'আচ্ছা, এবার কে বলতি চায়?'

ষষ্ঠ বাহিনীর দলপতি ভোলখভ এবার উঠে দাঁড়াল। বলল:

'ছেলেপিলেদের অবশ্যিই নিজিদের জীবনের কথা ভাবতে হবে। কেউই কলোনিতি সারাটা জীবন কাটাবে না। তাছাড়া আমাদের কীই-বা বিশেষ যোগ্যতা আছে? ষষ্ঠ, চতুর্থ কিংবা নবম বাহিনীতে আছে যারা তাদের অবস্তা কমবেশি ঠিক আছে -- ইচ্ছা করলি তারা ছুতার-মিস্ত্রি, কামার কিংবা ময়দা-কল মজুর হতে পারবে। কিন্তু যে-সকল বাহিনী মাঠে কাজ করতেছে তাদের কোনো ছেলে বিশেষ কোনো যোগ্যতা অর্জন করে না। কাজেই অপ্রেশ্‌কো যদি চাষী বনতি চায় তো বনুক-না। কিন্তু কেন জানি মনে নিচ্ছে অর এই ব্যাপারের মধ্যি সন্দেহজনক কিছু আছে। তুই তো কমসমোল-সদস্য, তাই না?'

'তা কম্‌সমোল-সদস্য আছি তো হয়েছেটা কী?'

ভোলখভ বলতে লাগল, 'আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা নিয়ি গোড়ায় কম্‌সমোল সংগঠনে আলাপ করলি ক্ষেতি নাই। কম্‌সমোল এ-ব্যাপারে কী মনে করে দলপতি-পরিষদকে তা আগে তাদের জানানো উচিত।'

'এ-ব্যাপারে কম্‌সমোল-কেন্দ্রের মত হল এই,' কভাল জানাল, 'গণ্ডায়-গণ্ডায় কুলাক-বাচ্চা জম্মো দেয়ার জন্যি গোর্কি কলোনি তৈরি হয় নি। লুকাশেঙ্কো তো কুলাক।'

'ওনারে কুলাক বলতেছেন ক্যানে?' অপ্রিশ্‌কো আপত্তি জানিয়ে বলল। 'ওনার ঘরের চাল যে লোহার পাত দিয়ি তৈরি তাতে কিছুই বোঝায় না।'

'কিন্তু ওর কি দুটো ঘোড়া নেই?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'আর একজন দিনমজুর?'

'না। তা নাই।'

'তাইলে সের্গেই কে?'

'জনশিক্ষা-দপ্তর এট্টা অনাথ-আশ্রম থেকে সের্গেইরে ওনার কাছে পাঠায়েছিল দত্তক নেয়ার জন্যি।'

'ও একই কথা,' কভাল বলল। 'জনশিক্ষা-দপ্তরের কাছ থেকে কিংবা অন্য কোথা থেকে যেখান থেকেই পেয়ে থাকুক ওরে, ও খামারখোলার দিনমজুর ছাড়া আর কী?'

'তা ওয়ারা যদি ওনারে দিয়ি থাকে...'

'দিয়ে থাকে! দিলেও কোনো ভদ্দরলোক হাত পেতে তা নেয় না, বোঝলে!'

ওর প্রস্তাবে যে এই ধরনের সাড়া মিলবে অপ্রিশ্‌কো তা মোটেই আশা করে নি। তাই ও কেমন হতচকিতভাবে বলে ফেলল:

'সবাই তোমরা এমনধারা কথাবাত্তা বলতেছ ক্যানে? ওলিয়ারে তো তোমরা সবকিছু দিইছিলে?'

এর উত্তর কভালের যেন তৈরি করাই ছিল। সে বলল:

'ওলিয়ার ব্যাপার সম্পন্নে আলাদা। প্রথমত, সে বিয়া করেছে আমাদের নিজেদেরই একজনরে, সে আর পাভেল এখন কমিউনে যোগ দিতে যাচ্ছে, ফলে আমাদের সম্পত্তি ভালো কাজে লাগবে। এছাড়া, দ্বিতীয়ত, কলোনি-বাসিন্দা হিসাবে ওলিয়া তোমার থেকে অনেক তফাত। তৃতীয়ত, আমাদের মধ্যে থেকে কুলাকের জম্মো দেয়া আমাদের পক্ষে ভালো দেখায় না।'

'তাইলে, আমি এখন কী করি?'

'তোমার যা খুশি!'

'না, এ-কাজটা ঠিক হয় না!' স্তুপিত্‌সিন বাধা দিয়ে বলল। 'একে-অপররে যদি ভালোবাসে ওরা, তাইলে বিয়া করুক। বিয়াতে দ্‌মিত্রও 'যৌতুক' পাইতে পারে যদি সে লুকাশেঙ্কোর ঘরে না উঠে কমিউনে যোগ দেয়। কমিউনে ওলিয়াই সবকিছু দেখাশোনা করবে।'

'মারুসিয়ার বাপ ওরে কমিউনে যোগ দিতি দিবে না।'

'তাইলে বাপেরে চুলার দোরে পাঠাক মারুসিয়া।'

'তা সে পারে না।'

'এর অর্থ, সে তোরে যথেষ্ট ভালোবাসে না... যতই যাই হোক, সে-ও তো কুলাক ছাড়া কিছু নয়!'

'সে আমারে ভালোবাসে কি বাসে না তাতে তোদের কী!'

'তাতে আমাদের কিছু একটা আছে বৈকি, বুঝলি! এর অর্থ, সে তোরে স্বার্থসিদ্ধির জন্যি বিয়া করতেছে। যদি সে তোরে ভালোবাসত...'

'কে বলতি পারে, সে হয়তো আমারেও ভালোবাসে আবার বাপেরেও মান্যি করে। তাছাড়া সে কমিউনে যোগ দিতি পারে না।'

'অ, পারে না বুঝি! তাইলে দলপতি-পরিষদ তারে নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?' রূঢ়ভাবে পালটা জবাব দিল কুদ্‌লাতি। 'তুই চাস কুলাকের ঘরজামাই হয়ে ঢুকতি আর লুকাশেঙ্কো তার কুঁড়েয় ধনী জামাই পেতি চায়। এয়াতে আমাদের কী এসে-যায়? পরিষদের সভা শেষ হল বলে ঘোষণা করে দে...'

আনন্দে লাপত কান-এঁটো-করা হাসি হাসল।

বলল, 'মারুসিয়ার পিরিতের ম্যাজমেজে ভাবের জন্যি পরিষদের সভা বন্ধ হল।'

অপ্রিশ্‌কো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। বর্ষার বজ্রগর্ভ মেঘের মতো কলোনিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে আর খুদে বাচ্চাদের ওপর অকারণে উৎপীড়ন শুরু করল। পরদিন মাতাল হয়ে এসে শোবার ঘরে সে তুমুল হট্টগোল জুড়ে দিল।

মাতলামির জন্যে অপ্রিশ্‌কোর বিচারের উদ্দেশ্যে দলপতি-পরিষদ আবার সভা ডাকল।

সকলেই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ছিল, অপ্রিশ্‌কোও গোমড়া-মুখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লাপত বলল:

'তুইও অবিশ্যি দলপতি, তবু আজ এখেনে তুই হাজির হয়েছিস ব্যক্তিগত অভিযোগের দায়ে। কাজেই তোরে ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়াতি হবে।'

আমাদের রীতিই ছিল তাই — অভিযুক্তকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতে হোত।

অপ্রিশ্‌কো তার বিষণ্ণ চোখ দু'টো চেয়ারম্যানের মুখের ওপর বুলিয়ে নিল একবার। তারপর বিড়বিড় করে বললে:

'আমি চুরিও করি নাই, ডাকাতিও করি নাই, ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়াতি যাব কোন দুঃখে?'

খুব আস্তে বলল লাপত, 'তোরে দাঁড়াতি বাধ্য করব আমরা।'

পরিষদ-সদস্যদের দিকে একঝলক তাকিয়ে অপ্রিশ্‌কো বুঝল ওরা সত্যিই ওকে বাধ্য করবে। দেয়াল থেকে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে এনে গুড়ি মেরে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ও।

'ঠিক আছে, তারপর বল্‌।'

'খাড়া হয়ি দাঁড়া!' হুকুম করল লাপত।

কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে অপ্রিশ্‌কো কাষ্ঠহাসি হাসল। তবে হাত দু'টো দু'পাশে নামিয়ে সোজা হয়েও দাঁড়াল।

'এখন বল্‌ দেখি কী করে তুই সাহস পেলি মদ খেতি আর শোবার ঘরে গিয়ি হৈ-হল্লা বাধাতি? কম্‌সমোল সদস্য, দলপতি আর কলোনি-বাসিন্দা হয়ে কী করে এ-সব পারলি তুই? বল্‌ দেখি আমাদের!'

অপ্রিশ্‌কো সর্বদাই একই সঙ্গে আচরণের দু'টো ধরনের চর্চা করে আসছিল — যখন প্রয়োজন বোধ করত তখন যে-কোনো ওস্তাদের মতো চরম বেপরোয়া ভাব জাহির করে হামবড়াইয়ের একেবারে পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারত সে, কিন্তু আসলে সব সময়েই সে ছিল অত্যন্ত সাবধান ও বিচক্ষণ কূটনীতিবিৎ। কলোনি-বাসিন্দারা তার ধরনধারণ ভালো করেই জানত, তাই অপ্রিশ্‌কোর এই ভালোমানুষি ভাব দেখে কেউই অবাক হল না। জোর্‌কা ভোল্‌কভ খুব সম্প্রতি সপ্তম বাহিনীর দলপতিপদে উন্নীত হয়েছিল — পদটি আগে ছিল

ভেত্‌কোভ্‌স্কির। সে এবার আপ্রেশ্‌কোর দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে হাতখানা নাড়তে-নাড়তে বললে:

'আবার ঢঙ শুরু করেছে দ্যাখো! বলা-নাই-কওয়া-নাই হঠাৎ ওর চরিত্র সংশোধন হয়ে গেছে! এখন একবারে ভিজা বিড়ালটি, ভাজা মাছ উলটায়ে খাতি জানে না, আবার কাল হয়তো দেখা যাবে বারফট্টাই শুরু করে দেছে।'

'চুপ — ওরে কথা বলতি দে!' গর্‌গর করে উঠল অসাদ্‌চি।

'আমারে দিয়ি কী বলাতি চাস তোরা? আমি অনেয্য কাজ করেছি, ব্যাস, ফুরায়ে গেল -- এয়ার বেশি আর কী বলতি পারি?'

'না। বল্‌ কী করে তোর সাহস হল এতটা?'

আপ্রেশ্‌কোর চোখ দুটোকে তোযামোদে তৈলসিক্ত লাগছিল। পরিষদ-সদস্যদের দিকে হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে সে বললে:

'এয়াতে সাহসের কী আছে আবার? দুঃখু ভুলতি আমি মদ খায়েছিলাম। আর মানুষে মাতাল হলি কী করে না-করে তার জবাবদিহি সে করতি পারে কি?'

'অ, পারে না, তাই না?' আন্তন বলল। 'কিন্তু তোরে জবাবদিহি করতে হবে! তোর জবাবদিহির দরকার নাই এটা যদি মনে করে থাকিস তো খুব ভুল করেছিস। ওরে কলোনি থেকে বার করে দেয়া হোক, এটাই আসল কথা! যে মদ খাবে তারেই বার করে দেয়া হোক... কাউরে যেন প্রশ্রয় দেয়া না-হয়!'

'কিন্তু তাহলি ওর যে সব্বোনাশ হয়ে যাবে-নে!' চোখ বড়-বড় করে গেওর্গিয়েভ্‌স্কি বলল। 'রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি ও যে মারা পড়বে!'

'তা কী করা যাবে, মারা পড়ুক!'

'এ-সবই মনোকষ্ট থেকে হয়েছে, বোঝলে! তোরা ছোঁড়াটার উপর এত নিষ্ঠুর ব্যাভার করতেছিস কেন? ছোঁড়ার মনে বলে ঘা লেগেছে, আর তোরা কিনা দলপতি-পরিষদের সভাটভা ডেকে তারে ঝামেলায় ফেলতেছিস!' আপ্রেশ্‌কোর ভালোমানুষিতে-ভরা মুখখানার দিকে স্পষ্ট বিদ্রূপের চোখে তাকিয়ে অসাদ্‌চি বলল।

'কিন্তু লুকাশেঙ্কো-যে কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্তর ছাড়া ওরে ঘরেই নিবে না,' তারানেত্‌স বলল।

'তাতে আমাদের কী?' চেঁচিয়ে উঠল আন্তন। 'লুকাশেংকো যদি ওরে জামাই না করে তাইলে অপ্রেশ্‌কো শ্বশুর করার জন্যি অপর কোনো কুলাক খুঁজে নিক গিয়ে!..'

'ওরে বার করে দিয়ি লাভ কী?' গেওর্গিয়েভ্‌স্কি আবার শুরু করল। তবে তার গলায় তেমন জোর ছিল না। বলল, 'যতই যাই হোক, ও তো পুরানো কলোনি-বাসিন্দা। এয়া সত্যি যে ও অনেয্য কাজ করেছে, কিন্তু ওর সংশোধন তো হতি পারে। তাছাড়া আমাদের ভুললি চলবে না যে ও আর মারুসিয়া একে অপররে ভালোবাসে। ওদের কোনোভাবে সাহায্য করা তো দরকার।'

'ও কী — অনাথ বাচ্চা নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল লাপত। 'ওরে সংশোধন করার দরকার পড়বে কেন? ও তো কলোনি-বাসিন্দা।'

এবার বলতে উঠল শনাইদের — অষ্টম বাহিনীর নতুন দলপতি এবং এই বীর-বাহিনীতে কারাবানভের উত্তরসাধক। এই বাহিনীতে ফেদরেংকো ও কারিতোর মতো দৈত্যসদৃশ শক্তিশালী ছেলেপিলে ছিল বলে অষ্টম বাহিনীর রীতিমতো গর্ব ছিল। কারাবানভ যখন বাহিনীটির দলপতি ছিল তখন এই দুটি ছেলে একে অপরের চরিত্রের জটিলতা-কুটিলতাগুলোকে সফলভাবে মেজে-ঘসে সাফ করে দিত, আর যত কঠিনই হোক-না কেন যে-কোনো কাজেই কারাবানভ তাদের ঠিকমতো চালনা করতে পারত। আর ওই ছেলেরা সব দায়িত্বই পালন করত কসাকসুলভ প্রাণশক্তি নিয়ে, কলোনির মর্যাদার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। বাহিনীটিতে শনাইদেরকে প্রথম-প্রথম কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকত। বাহিনীতে যখন প্রথম যোগ দেয় তখন ও ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ছোটখাট, ক্ষীণজীবী, নিষ্প্রভ আর গুটিশুটি-মারা। অসাদ্‌চিকে জড়িয়ে সেই পুরনো ঘটনাটার পর ইহুদি-বিদ্বেষ আর কখনও কলোনিতে মাথা তোলে নি বটে, তবে তার পরেও বহুদিন ধরে শনাইদেরের প্রতি অন্য ছেলেদের মনোভাবে বিদ্রূপের তেরছা দৃষ্টি মিশে থাকত। তার মুখের রুশ বুলিতে সময়-সময় শব্দযোজন আর বাক্যগঠন এত অদ্ভুত শোনাত যে সত্যিই হাসি পেত, তাছাড়া মাঠের কাজে তার বিশেষ কোনো দক্ষতাও ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম বাহিনীতে ক্রমশ নতুন ধরনের সম্পর্কসূত্র গড়ে উঠতে শুরু করল: কালক্রমে শনাইদের হয়ে দাঁড়াল বাহিনীর সকলের প্রিয়পাত্র, কারাবানভের দলের বীরবৃন্দের কাছেও ও হয়ে

উঠল গর্বের বস্তু। গভীর ও সংবেদনশীল আত্মিক প্রকৃতির এক বুদ্ধিমান ছেলে হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করে তুলল শ্নাইদের। সবচেয়ে জটিল যে-সব সমস্যার মুখোমুখি হোত বাহিনী বড়-বড় কালো চোখের দ্যুতিতে তাদের আলোকিত করে তুলত শ্নাইদের, সব সময়েই ঠিক যথাযথ সমাধানটি সে খুঁজে বের করত। এবং কলোনিতে কাটানোর গোটা সময়টার মধ্যে যদিও মাথায় সে ইঞ্চিখানেকও বেড়েছিল কিনা সন্দেহ, তবু গায়েগতরে তার মাংস লেগেছিল যথেষ্ট। পেশীবহুল আর অত্যন্ত শক্তিশালী চেহারা হওয়ায় গ্রীষ্মকালে হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়াতে সে কিছুমাত্র লজ্জা পেত না। লাঙলের থত্থর-কম্পমান মুঠিখানা শ্নাইদেরের হাতে তুলে দেয়ার পর কাউকে এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করতেও হোত না। অষ্টম বাহিনী সর্বসম্মতিক্রমে তাকে দলপতির পদে নিযুক্ত করেছিল। ওকে হঠাৎ দলপতি করার এই ব্যাপারটাকে কভাল আর আমি ব্যাখ্যা করেছিলুম এই বলে যে 'বাহিনীটাকে আমরা সবাই মিলে চালাব তবে দলপতি শ্নাইদের থাকবে বাহিনীর অলঙ্কার হিসেবে'।

কিন্তু দলপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার দিনটি থেকেই শ্নাইদের প্রমাণ দিল যে কারাবানভের শিক্ষানবিশি সে বৃথাই করে নি, মনে হল নিজের অর্জিত পদটি বজায় রাখতে ও সেই সঙ্গে তাকে অলঙ্কৃত করতেও সে দৃঢ়সংকল্প। কারাবানভের তর্জনগর্জনে অভ্যস্ত ফেদরেঙ্কোও মাঝে-মাঝে তার প্রতি উদ্দিষ্ট এই নতুন দলপতির শান্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ উপরোধ-অনুরোধেও বড় কম অভ্যস্ত হয়ে উঠল না।

এহেন যে শ্নাইদের সে এবার বলল:

'অপ্রেশ্কো যদি নূতন ছেল্যা হোত তাইলে এরে ক্ষমা করা চলতি পারত। কিন্তু এখন এরে কোনোরকমেই ক্ষমা করা চলে না। অপ্রেশ্কো প্রমাণ করেছে যে সে আমাদের যৌথ জীবনরে থোড়াই কেয়ার করে। তোরা কি মনে করিস যে সে আবার এমন কাজ করবে না? সবাই জানে যে সুযোগ পেলি সে আবার এমনধারা করবে। অপ্রেশ্কো অসুখী হোক এয়া আমি চাই না। এয়াতে লাভ কী আমাদের, বল্? কিন্তু ওরে আমাদের যৌথ সংস্থার বাইরি থাকতে দেয়া হোক, তাইলে ও বোঝবে কত ধানে কত চাল। তাছাড়া অন্যেরেও জানান দেয়া দরকার যে আমরা এমনধারা কুলাকসুলভ

ধাপ্পায় ভোলার পাত্তর নই। অষ্টম বাহিনী দাবি করতেছে যে অপ্রেশ্‌কোরে কলোনি থেকে বার করি দেয়া হোক।'

অষ্টম বাহিনীর দাবি এসব ক্ষেত্রে ছিল একটা নির্ধারক ব্যাপার, কারণ এই বাহিনীতে নতুন সদস্য বলতে গেলে ছিলই না। অতএব দলপতিরা সবাই এবার আমার দিকে তাকাল। লাপত বলল:

'মামলাটা পরিষ্কার হয়ি গেছে এবার। আন্তন সেমিওনভিচ, এখন বলেন আপনি এ-সম্বন্ধে কী মনে করেন?'

সংক্ষেপে বললুম, 'ওকে বের করে দাও তাহলে।'

অপ্রেশ্‌কো বুঝল যে তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। কূটনৈতিক সংযমের পোশাক এবার খুলে ফেলল সে। বলল:

'আমারে বার করি দিবে মানে? তাইলে কনে যাব আমি? তমরা কি চাও যে আমি চুরির পেশা নিই? কী ভাবো তমরা, তমাদের উপর কোনো বড়কত্তা নাই? খার্‌কভে যাব আমি, দেখাব মজা!..'

শুনে পরিষদের সভায় হাসির রোল উঠল।

'তা-ই ভালো! তুই বরং খার্‌কভেই যা! ওরা তোরে কিছু কাগজপত্তর দিবে আর তা-ই নিয়ি কলোনিতি ফিরে এসে পূর্ণ সদস্য হয়ি থাকবি এখেনে। খুব ভালো সময় কাটবে তোর, খুব ভালো!'

অপ্রেশ্‌কো অবশেষে বুঝল যে সে অর্থহীন প্রলাপ বকছে। ফলে একেবারে চুপ মেরে গেল।

পরিষদের সভার চারদিকে চোখ বুলোতে-বুলোতে লাপত বলল, 'তাইলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র গেওর্গিয়েভ্‌স্কিই এয়ার বিরুদ্ধে। যাই হোক, পাহারাদার দলপতি!'

'এই-যে!' এই হুকুমে সাড়া দিয়ে টানটান খাড়া হয়ে জবাব দিল সেই গেওর্গিয়েভ্‌স্কিই।

'অপ্রেশ্‌কোরে কলোনি থেকে বার করি দাও!'

'ঠিক হ্যয়!' অনুমোদিত ভঙ্গিতে স্যালুট দিল গেওর্গিয়েভ্‌স্কি তারপর অপ্রেশ্‌কোর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল তার পিছুপিছু দরজার দিকে যেতে।

এর একদিন পরে আমরা শুনলুম যে অপ্রেশ্‌কো লুকাশেঙ্কোর কুঁড়েয় বাস করছে। তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার চুক্তিটা যে কী হয়েছিল সে-সম্পর্কে

আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না, তবে ছেলেরা বললে যে এ-ব্যাপারে মারুসিয়ার মতামতই নাকি শেষ কথা ছিল।

শীত শেষ হতে চলেছিল। মার্চ মাসে খুদে বাচ্চারা বাতাসের ধাক্কায় ভাসন্ত তুষারের চাঙড়গুলোয় চেপে কলমাকের স্রোতে ভাসাভাসির খেলা খেলতে লাগল। দেয়ালপঞ্জির তারিখ অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও ছেলেরা সর্বদাই ভারি অবাক হয়ে যেত যখন হঠাৎ-হঠাৎ বাতাস, তুষার-ঝড় ইত্যাদির মতো প্রকৃতির আদিম শক্তিগুলোর ধাক্কায় পুরো পোশাকপরা অবস্থাতেই যেমন-তেমন করে বানানো ভেলা, তুষারের চাঙড় আর নদীর ওপর ঝুলন্ত গাছের ডালপালা থেকে জলে পড়ে যেত তারা। ফলে সচরাচর যেমন দেখা যায় সেবারও তেমনই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের কিছু শিকার জুটে গেল।

কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জের কেটে গেল, শুরু হল কুয়াশার দিন, আর এরপরই উঠোনের মাঝখানে তুলোর অস্তর-দেয়া কোটগুলো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে থাকতে দেখে কুদ্‌লাতি তার চিরকেলে বসন্তকালীন নাটকের মহড়া শুরু করে দিল — সকলকে এই বলে ভয় দেখাতে লাগল সে যে ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত দু'সপ্তাহ আগেই তাহলে খাটো প্যান্ট আর কলারছাড়া শার্টের পোশাক বরাদ্দ করা হবে।

১৪

নাকী কান্না চলবে না!

এপ্রিলের মাঝামাঝি আমাদের 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীরা বসন্তকালীন ছুটি কাটাতে আমাদের কাছে এল।

রোগা আর ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে হাজির হল তারা। খাওয়ানোর বিভাগে খাইয়েদাইয়ে মোটা করার জন্যে লাপত সঙ্গে সঙ্গে তাদের দশম বাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার সুপারিশ করলে। কলোনি-বাসিন্দাদের সামনে শহুরে ছাত্রসুলভ ধরনধারণ দেখিয়ে এই ছেলেমেয়েরা যে চাল দেয়ার চেষ্টা করল না তা দেখে আমি খুশিই হলুম। কারাবানভের এমন কি সকলের সঙ্গে রীতিমাফিক দেখাসাক্ষাৎ করারও তর সইছিল না, খামারে আর ওয়ার্কশপগুলোয় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল সে। আসামাত্রই বেলুখিনকে

ঘিরে ধরেছিল খুদে বাচ্চার দল। সে আমাদের খার্কভ আর সেখানকার ছাত্রজীবনের নানা খবরাখবর দিল।

সেদিন সন্ধেবেলা আমরা সবাই মিলে তারাভরা আকাশের নিচে বসে আগেকার সেই পুরনো দিনগুলোর মতোই কলোনির সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করলুম। আমাদের সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর কথা শুনে ভারি অখুশি হল কারাবানভ।

বলল, 'যা করা হয়েছে তা অবিশ্যি ঠিকই হয়েছে। কোস্তিয়া যখন বলেছে যে তার এখেনে থাকতে ভালো লাগছে না তখন আপনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন — চুলায় যাক সে, পারলে ভালো কিছু খুঁজে নিক গিয়ে! আর অপ্রিশ্‌কো যে কুলাক এ তো স্পষ্ট, ওর জায়গা কুলাকদের মধ্যি, আর কোথাও না। তবু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলি কেমন যেন মনে হয় কোথাও একটা-কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। সেটা যে কী তা নিয়েও ভাবা দরকার। খার্কভে আমরা আরেক ধাঁচের জীবন দেখে এসেছি, বুঝলেন। জীবনটাও সেখেনে পৃথক, মানুষগুলোও পৃথক।'

'তাহলে এখেনে কলোনিতি — আমাদের লোকেরা সব খারাপ?'

'না-না, কলোনির মানুষজন তো ভালো,' কারাবানভ বলল। 'খুবই ভালো। কিন্তু একবার চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ্, দেখবি দিনে-দিনে কুলাকের সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। কলোনি এখেনে তিষ্ঠুবে কী করে বল্? সব সময় তোদেরে লোক ছাঁটাই করে আর মাথা গরম করে চলতে হবে, আর তা না হলে লেজ গুটিয়ে পালাতে হবে এখেন থেকে।'

'আসল কথা তা না, বুঝলি,' চিন্তিতভাবে টেনে-টেনে বলল বুরুন, 'আসল কথা হল, কুলাকদের সাথে লড়াই করতে লাগবে আমাদের সবারে। এটা হল গিয়ে একটা বিশেষ ব্যাপার। তবে ঠিক আজকের সমস্যা তা না। আজকের সমস্যা হল, কলোনিতে এখন করার মতন কোনো কাজ নাই। কলোনির সদস্য হল এক শো বিশজন — অর্থাৎ কর্মী অনেক, কিন্তু কাজটা কী? না, কাজটা হল খালি বীজ বোনো আর ফসল কাটো, বীজ বোনো আর ফসল কাটো। এক সমুদ্দুর ঘাম ঝরিয়ে তার ফলটা কী — না, এই এতটুক। এ-সবই এত তুচ্ছ কাজ! আর-একবছর এমনধারা কাজ করতে হলে ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠবে-নে আর এর থেকে আরও-কিছু ভালো জিনিসের জন্যে ব্যাকুল হতে শুরু করবে...'

এবার বেলুখিন আমার পাশে ঘেঁসে এসে বসল। বলল, 'গ্রিশা ঠিক কথা কয়েছে। আমাদের ছেলেরা -- যাদেরে বলা হয় অনাথ নিরাশ্রয় -- তারা আসলে প্রোলেতারিয়ান, তাদের দরকার কারখানার কাজ। অবিশ্যি খেতে-খামারে কাজ করতে খুবই মজা তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু খেত থেকে আমরা পাচ্ছি কী? আমরা যদি গাঁয়ে গিয়ে বসবাস শুরু করি তার অর্থ দাঁড়াবে আমরা পেটিবুর্জোয়ার দলভারি করছি। সে তো এমনিতেই লজ্জার কথা, তার উপর ওদের দলে মিশতে গেলে খালি-হাতে যাওয়া চলে না, সাথে উৎপাদনের নানা উপায় থাকাও দরকার — যেমন, একখান মাথাগোঁজার কুঁড়ে, একটা ঘোড়া. একখান লাঙ্গল, এই সব আর-কি। অপ্রেশ্কোর মতন কুলাক-পরিবারে ঘরজামাই হলে তো চলবে না। তাহলে আমরা যাই কোথায়? কিন্তু ইঞ্জিন-মেরামতি কারখানা ছাড়া আর কিছু তো নাই, তা-ও সেখেনে আবার মজুররা নিজেরাই ঠিক পাচ্ছে না তাদের ছেলেপেলেদের কী গতি করা যাবে।'

কলোনিতে আসার পর 'রাব্ফাক'-এর সব ক'টি ছাত্রছাত্রীই মাঠের কাজে সানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দলপতি-পরিষদও সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধের পরিচয় দিয়ে তাদের মিশ্র বাহিনীগুলোর দলপতি নিযুক্ত করে দিল। মাঠ থেকে প্রথম দিনের কাজ সেরে কারাবানভ ফিরল দারুণ খুশি আর উত্তেজিত হয়ে। বলল :

'ওহ্. খেতে কাজ করতে কী ভালোই-না লাগে! এ-কাজের যে কোনো অর্থ নাই তা ভাবতেও ভারি খারাপ ঠেকে, ধুত্তোর ছাই! আচ্ছা, ব্যাপারটা এমনধারা হলে দাঁড়াত কেমন. যদি আমরা মাঠে কাজ করতাম, ফসল কাটতাম. আর মাঠে-মাঠে গজিয়ে উঠত থান-থান কাপড়. বুটজুতা, আর মাঠভরা যন্তরপত্তর, ট্রাক্টর, অ্যাকর্ডিয়ন. চশমা, ঘড়ি. সিগ্রেট এসব হাওয়ায় দোল খেত... আহা. ভাবতেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়!.. আচ্ছা. দুনিয়াটারে বানাবার সময় অপদার্থগুলো আমার সাথে একবার পরামর্শ করল না কেন?'

'রাব্ফাক' ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সঙ্গে পয়লা মে কাটাবে স্থির হল। পয়লা মে এমনিতেই আমাদের কাছে ছিল আনন্দের উৎসব, ওরা যোগ দেয়ায় তা আরও আনন্দময় হয়ে উঠল।

আগের মতোই কলোনি তখনও ভোরবেলায় বিউগ্লের আওয়াজে জেগে

উঠছিল, আর একবারের তরেও পেছনদিকে ফিরে না-তাকিয়ে কিংবা জীবনের বিশ্লেষণে অযথা শক্তিক্ষয় না-করে আমাদের মিশ্র বাহিনীগুলো সার বেঁধে কুচকাওয়াজ করে কাজ করতে যাচ্ছিল মাঠে। এমন কি যারা ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া — যেমন, এভ্‌গেনিয়েভ, নাজারেঙ্কো, পেরেপেলিয়াত্‌চেঙ্কো এবং অপর কয়েক জন — তারাও বাকি সকলের সমকক্ষ হয়ে উঠতে শুরু করল, আমাদের আর মাথাব্যথার কারণ হয়ে রইল না তারা।

১৯২৫ সালের গ্রীষ্ম লাগাদ আমাদের কলোনি পুরোপুরি সংহত একটি যৌথ সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠল। তদুপরি, অন্তত বাইরে থেকে বিচার করলে, তার মনমেজাজ রীতিমতো সু-স্বাস্থ্যে ভরা বলে বোধ হতে লাগল। একমাত্র চোবতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায়বিশেষ, কিছুতেই তাকে বাগ মানাতে পারছিলুম না আমি।

ভাইয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে মার্চ মাসে ফিরে এল চোবত। জানাল, তার ভাইয়ের অবস্থা মোটের ওপর ভালোই তবে তার খামারে কোনো দিনমজুর খাটে না — ভাই তার মাঝারি কৃষক মাত্র। কলোনির কাছে চোবত আর কোনো সাহায্য চাইল না, কেবল নাতাশাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটা তুলল।

আমি বললুম, 'এ-নিয়ে আমার সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কী? কী করবে না-করবে নাতাশা নিজেই তা ঠিক করুক...'

এর এক সপ্তাহ পরে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় চোবত ফের এল আমার কাছে। বলল:

'নাতাশারে ছাড়া আমি থাকতি পারব না! ওর সাথে আপনে কথা বলেন — ওরে বলেন আমার সাথে যাতি!'

'শোন, চোবত, তুমি তো আচ্ছা মজার কথা বলছ দেখছি! ওর সঙ্গে তোমারই কথা বলা উচিত — আমার নয়!'

'ওরে একমাত্তর আপনে যাতি বললি ও যাবে। আমি যতই কথা বলতেছি তাতে কিছুই ফল হতেছে না।'

'কী বলছে ও?'

'সে কিছুই বলে না, খালি কান্দে।'

অত্যন্ত তীব্র সজাগ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল চোবত। এই

খবর আমার মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে তা বোঝা তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খবরটা যে আমার মনে যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে আমিও সেটা ওর কাছ থেকে লুকোতে পারলুম না।

বললুম, 'এ তো ভালো কথা না... ঠিক আছে, আমিই ওর সঙ্গে কথা বলব'খন।'

লাল টকটকে রক্ত-ছোটা চোখে আমার দিকে তাকাল চোবত, যেন আমার অন্তরের অন্তস্থলে তাকাল। তারপর ধরাগলায় বলল:

'ওর সাথে কথা বলেন। তবে মনে রাখবেন ·· নাতাশা যদি আমার সাথে না-যায় তাইলে আমি এ-জীবন আর রাখব না!'

ধমক দিয়ে বললুম, 'মুখ্যুর মতো কী যা-তা বকছ? তুমি কি পুরুষমানুষ, না দুর্বল মেয়েছেলে? এসব চিন্তা করার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!'

কিন্তু চোবত আমায় কথা শেষ করতে দিল না। ধপ করে একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে ভাষায় যা প্রকাশ করা চলে না এমন অসহনীয় দুঃখ আর হতাশার কান্নায় ভেঙে পড়ল। কী আর করব, ওর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলুম আমি, ওর উত্তপ্ত কপালে হাত বুলোতে লাগলুম। হঠাৎ একসময় লাফিয়ে উঠে আমার কনুইটা চেপে ধরে দ্রুত এলোমেলোভাবে একগাদা কথা বলে গেল ও:

'আমি দুঃখিত... জানি আমি উপদ্রব হয়ি দাঁড়ায়েছি... কিন্তু এছাড়া আমার আর কিছুই করার নাই... আপনে তো দেখতেছেন আমি কেমনধারা মানুষ... আপনে তো সবই দেখতি পান, সবই বোঝেন... আমি এই হাঁটু গাড়্যে বসি আপনেরে বলতেছি... নাতাশারে ছাড়া আমি বাঁচব না!'

সারারাত সেদিন ওর সঙ্গে কথা বলে কাটালুম। আর গোটা রাত্তির ধরে অনুভব করছিলুম, আমি কত অসহায়। আমাদের ভবিষ্যৎ মহৎ জীবন, উজ্জ্বল নানা সম্ভাবনা, মানবিক সুখের বহু বিচিত্র দিকের উন্মোচন — সারারাত ধরে এসব কথাই শোনাচ্ছিলুম ওকে। আমি ওকে বলছিলুম জীবনটাকে সতর্কভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলার দরকারের কথা; নাতাশার যে লেখাপড়া শেখা দরকার, এ-ব্যাপারে তার যে অসামান্য দক্ষতা আছে, লেখাপড়া শিখলে সে যে ওকেও নানাভাবে সাহায্য করতে পারবে, সুদূর বগদুখভ গ্রামে নাতাশাকে পাথরচাপা দিয়ে রাখাটা উচিত হবে না — রাখলে যে জীবনের একঘেয়েমিতেই মারা পড়বে বেচারা, এমন বহু

কথাই বলছিলুম ওকে। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই চোবতের চেতনার তারে ঘা দিতে সমর্থ হল না। বিষণ্ণভাবে আমার সব কথা শুনে গেল ও, আর খালি ফিস্‌ফিস করে বলতে লাগল:

'কাজ করে আমি জানটা দিয়ি দোব, সবকিছু করব আমি -- শুধু ও আমার সাথে চলুক!..'

মানসিক দিক থেকে আগেকার সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই ওকে রেখে চলে এলুম আমি। মনে হল, আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সকল উপায়ই ওর হাতছাড়া হয়ে গেছে। পরদিন সন্ধেবেলা নাতাশাকে আমার কাছে আসতে ডাকলুম। ও এলে পর আমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা ওর কাছে করাতে চোখের পাতার সামান্যতম কাঁপুনির মধ্যে দিয়ে তা বুঝে নিল, তারপর আমার মুখের দিকে চোখ তুলে লজ্জার লেশমাত্র না-দেখিয়ে একেবারে তাক-লাগানো স্বচ্ছগলায় বললে:

'চোবত আমারে বাঁচায়েল একদিন... কিন্তু এখন আমি লেখাপড়া শিখতি চাই।'

'তাহলে তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও না? যেতে চাও না ওর সঙ্গে?'

'আমি লেখাপড়া শিখতি চাই... তয় আপনে যদি অর সাথে আমারে যাতি কন, আমি যাব-নে।'

ফের একবার আমি ওই দু'টো স্বচ্ছ, খোলামেলা চোখের গভীরে তাকালুম। একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করি চোবতের মানসিক অবস্থার খবর ও রাখে কিনা। কিন্তু কেন যেন তা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, পরিবর্তে খালি বললুম:

'ঠিক আছে। চুপচাপ ঘুমোতে চলে যাও।'

'তাইলি, আমারে যাতি হবে না তো?' ঘাড়টা একদিকে একটুখানি কাত করে একেবারে শিশুর মতো শুধোল নাতাশা।

'না, যেতে হবে না, তুমি এখানে থেকে লেখাপড়া শিখবে,' বিষণ্ণভাবে কথা ক'টা বলে আমি চিন্তায় ডুবে গেলুম। ও যে কখন নিঃশব্দে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল তা পর্যন্ত খেয়াল রইল না।

পরদিন সকালে চোবতের সঙ্গে দেখা করলুম। শ্বেত প্রাসাদের সদর গেটে দাঁড়িয়ে ছিল ও। স্পষ্টত, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই অপেক্ষা করছিল ওখানে। ঘাড় নেড়ে ওকে আমার অফিস-ঘরে ডাকলুম। টেবিলে বসে ড্রয়ার

আর চাবিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম যতক্ষণ আমার প্রতিটি নড়াচড়া নিঃশব্দে ততক্ষণ ও লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। অতঃপর নিজের মনেই একসময়ে হঠাৎ ও বলে উঠল:

'নাতাশা তাইলে যাতিছে না?'

ওর দিকে তাকালুম। মনে হল, নিজের সব-হারানোর চেতনাটুকু ছাড়া আর কোনো কিছু সম্বন্ধেই ও সচেতন নয়। দরজার গায়ে একটা কাঁধ উঁচু করে হেলান দিয়ে রেখে আর জানলার সবচেয়ে উঁচুতে কোণের একটা শার্সির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস করে কী যেন বলছিল ও।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'চোবত!..'

আমার কথা ও শুনতে পেল বলে মনে হল না। তবে হঠাৎ গা-নাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আর আমার দিকে একবারও ফিরে না-তাকিয়ে নিঃশব্দে, ছায়ার মতো হালকা পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওর দিকে নজর রাখতে লাগলুম। দুপুরের খাওয়ার পর একটা মিশ্র বাহিনীর কাজে যোগ দিল ও। সন্ধেবেলা ওর স্থায়ী বাহিনীর দলপতি শনাইদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম:

'চোবতের খবর কী?'

'চুপচাপ আছে।'

'কাজ কেমন করেছে আজ?'

'মিশ্র বাহিনীর দলপতি নেচিতাইলো তো বলতেছে যে ও নাকি কাজ ভালোই করেছে।'

'যাই হোক. দিনকয়েক ওর দিকে সারাক্ষণ নজর রাখতে ভুলো না। অস্বাভাবিক যদি কিছু নজরে ঠেকে তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তা জানিও।'

'জানি — হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নজর রাখব,' শনাইদের বলল।

কয়েক দিন ধরে বোবা হয়ে রইল চোবত, তবে কাজকর্ম করে যেতে লাগল, তাকে দেখা যেতে লাগল খাবার-ঘরেও। মনে হল, আমাকে যেন এড়িয়ে চলছে সে। উৎসবের আগের দিন সন্ধেবেলা এক নির্দেশনামা জারি করে ব্যক্তিগতভাবে তার ওপর ভার দিলুম সব ক'টা দালানের ওপর স্লোগানগুলো লটকিয়ে দিতে। নিয়মমাফিক মইখানা বের করে সে আমার কাছে এল অনুরোধ নিয়ে। বলল:

'পেরেক নেয়ার একটা নির্দেশ দ্যান আমারে।'

'কত পেরেক?'

ঘরের ছাদের দিকে চোখ দুটো তুলে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে। তারপর জবাব দিল:

'মনে হয় এক কিলোগ্রামেই কাজ হবে-নে...'

ওর কাজের তদারক করতে গিয়ে দেখলুম, নিষ্ঠার সঙ্গে সতর্কভাবে স্লোগান-লেখা কাপড়গুলো দেয়ালের গায়ে টানটান করে ধরছে চোবত আর পাশের মইতে-চড়া তার সঙ্গীকে বলছে:

'উঁচা কর্... আরেটু... ঠিক আছে এইবার... আচ্ছা, পেরেক ঠোক্ দেখি!'

উৎসবের প্রস্তুতিতে মেতে উঠতে খুবই ভালোবাসত আমাদের কলোনি-বাসিন্দারা। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত তারা পয়লা মে'র উৎসব উদ্যাপন করতে, কারণ সেটা ছিল বসন্ত উৎসবও। কিন্তু ওই বছর পয়লা মে এসে উপস্থিত হল শোচনীয় সাজে সেজে। আগের দিন ভোরবেলা থেকেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। বৃষ্টি পড়ছিল মাঝে-মাঝে আধ-ঘণ্টাখানেকের মতো থেমে-থেমে, তারপর আবার শুরু হচ্ছিল ঝিরঝিরে, একঘেয়ে, একনাগাড়ে বৃষ্টি একেবারে শরৎকালের মতোই। কিন্তু ওইদিন সন্ধেবেলা আকাশে আবার তারা চমকাতে শুরু করল, কেবল পশ্চিম-দিকে একটিমাত্র জায়গা নিষ্প্রভ, কালচে-নীল একটা কালশিরার দাগে ঘোলাটে হয়ে রইল। আর ওই দাগটা কলোনির ওপর ছড়িয়ে দিল অ-বন্ধুসুলভ মলিন ছায়া। আর সারা কলোনি জুড়ে কলোনি-বাসিন্দারা দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে লাগল সাধারণ সভা শুরু হওয়ার আগেই যাতে নানা ধরনের টুকিটাকি কাজ — যেমন উৎসবের পোশাক-আশাক তৈরি করে রাখা, চুলবাঁধা আর চুলছাঁটা, স্নান সারা, জামাকাপড় কাচা, ইত্যাদি — সেরে রাখতে পারে। ওদিকে দ্রুত-শুকিয়ে-আসা গাড়িবারান্দাটার নিচে বসে ড্রাম-বাজিয়েরা তাদের বাজনার পেতলের মোড়ক, হাতল, ইত্যাদি খড়িমাটি দিয়ে মেজেঘষে ঝকঝকে করে তুলতে লেগে গেল। ওরাই ছিল পরের দিনের আসল নায়ক।

আমাদের ড্রাম-বাজিয়েরা ছিল সত্যিই ভারি অসামান্য। পাইওনিয়র বাহিনীগুলোর যে-সব ড্রাম-বাজিয়ে এলোমেলো নানা আওয়াজের কিম্ভুত বন্যা বওয়াত, আমাদের ড্রাম-বাজিয়েরা তাদের মতো কাঁচা বাজনদার ছিল না।

গোর্কিপন্থী ড্রাম-বাজিয়েরা বৃথাই ছ'মাস ধরে সামরিক বাজনদারদের কাছে বাজনার শিক্ষা পায় নি। একমাত্র ইভান ইভানভিচ বাদে আর কেউ কোনোদিন তাদের বাজনার ব্যাপারে আপত্তি তোলে নি।

ইভান ইভানভিচ খালি একবার আমায় বলেছিলেন, 'ওদের বাজানোর পদ্ধতি ভয়াবহ, বুঝলেন — রীতিমতো ভয়াবহ!'

আতঙ্কে চোখ দু'টো স্থির করে আমার কাছে এই পদ্ধতিটির বর্ণনা দিয়েছিলেন ইভান ইভানভিচ। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আপত্তিটা উঠছিল কেবল ভারি চমৎকার একটা রুনঝুন আওয়াজ নিয়ে — যার মধ্যে নাকি এক ছেনাল মেয়ে, তামাক, পনির, আলকাতরা আর অশ্রাব্য একটা কথা, এইসব কী-কী যেন মিলিয়েমিশিয়ে একটা গপ্পো ফাঁদা হয়েছিল। কিন্তু এই বিশেষ বাজনাটা আবার আমাদের বাজনদারদের দারুণ কাজে লেগেছিল। এই 'ভয়াবহ পদ্ধতি'টির কলকাঠি নাড়ায় যতটা কাজ হবার তা তো হয়েই ছিল, তদুপরি আমাদের ড্রাম-বাজিয়েদের কুচকাওয়াজও সৌন্দর্য ও ভাবপ্রকাশের দিক থেকে হয়ে উঠেছিল অনবদ্য। ড্রাম-বাজিয়েদের বাজনা ছিল কয়েকরকমের — যেমন, 'কুচকাওয়াজ', 'নিদ্রাভঙ্গের সংকেত', 'পতাকা-অভিবাদন', 'পরিদর্শক-অভিবাদন' ও 'যুদ্ধযাত্রার কুচকাওয়াজ'-সম্পর্কিত বাজনা। আর প্রতিটি ধরনের সঙ্গীতের ছিল নিজস্ব সুরের গমক, তীক্ষ্ন পরিচ্ছন্ন কাটা-কাটা তাল, চাপা কোমল গুরুগুরু আওয়াজ, হঠাৎ-হঠাৎ সুর-বিস্ফোরণের দমক আর হালকা নাচের ছন্দ। আমাদের ড্রাম-বাজিয়েরা তাদের কাজ এত ভালোভাবে নিষ্পন্ন করত যে এমন কি জনশিক্ষা-দপ্তরের ইন্‌স্পেক্টররা পর্যন্ত তা শুনে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন, ড্রাম-বাজিয়েরা সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বিরূপ মতাদর্শের আমদানি করছে না।

ওইদিন সন্ধেবেলা কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভায় পরদিনের উৎসবের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি কতখানি সবাই মিলে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম। একটিমাত্র ব্যাপারে কেবল শেষপর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেল না, সেটা হল এই যে আসচে কাল বৃষ্টি হবে কী না! ইয়ার্কি করে কেউ-কেউ প্রস্তাব করলে যে পরদিনের নির্দেশনামায় এই কথাটাও ঢুকিয়ে নেয়া হোক: ডিউটির ভারপ্রাপ্ত দলের কাছে আশা করা হচ্ছে যে তারা ভালো আবহাওয়া নিশ্চিত করে তুলবে। আমি বললুম, পরদিন যে বৃষ্টি হবেই সে-ব্যাপারে

আমি নিশ্চিত। কালিনা ইভানভিচ, সিলান্তি ও অন্যান্য আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞও একই রকম মত দিলে। কিন্তু কলোনি-বাসিন্দারা আমাদের এই আশঙ্কাপোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চিৎকার করে বললে:

'তা, বিষ্টি যদি হয়ই তাতে হয়েছেটা কী?'

'আমরা ভিজব, এই আর-কি।'

'আমরা তো চিনির পুতুল না, তাই নয় কি?'

অতএব, পরদিন সকাল থেকে যদি বৃষ্টি হয় তাহলেও আমরা শহরে যাব কিনা এই প্রশ্নে ভোট নিতে বাধ্য হলুম। যাওয়ার বিরুদ্ধে তিনটে হাত উঠল, তার মধ্যে একখানা ছিল আমার। ফলে গোটা সভা জয়োল্লাসে হৈ-হৈ করে হেসে উঠল, কে একজন যেন চেঁচিয়ে বলল:

'আমাদের পক্ষ জিতেছে!'

অতঃপর আমি বললুম:

'তাহলে মনে রেখো, প্রস্তাব নেয়া হয়েছে যে আসচে কাল আমরা যাবই, তা সে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও।'

'হ্যাঁ, আকাশ ভেঙে পড়লেও!' লাপত চিৎকার করে বলল।

'দেখো, তাহলে নাকী কান্না জুড়ো না যেন! আজ তো সবাই খুব বীরত্ব ফলাচ্ছ, কিন্তু কাল হয়তো দেখা যাবে ল্যাজ গুটিয়ে কেঁউ-কেঁউ জুড়ে দিয়েছ: ওহ্, বড্ড বিষ্টি যে! ওহ্, বড্ড যে ঠাণ্ডা!..'

'আমরা কি কখনও নাকী কান্না কেঁদেছি?'

'তাহলে ওই ঠিক রইল — নাকী কান্না চলবে না!'

'ঠিক হ্যয় — নাকী কান্না চলবে না!'

ছাইরঙা, ঘন-মেঘে-ঢাকা আকাশ নিয়ে দেখা দিল পরদিনের সকাল। ভোর থেকেই শুরু হল ঝিরঝিরে, একটানা বৃষ্টির ছলনা। কখনও তার বেগ বাড়ছিল আর ঝাঁঝরি-কল থেকে পড়া জলের ফোয়ারার মতো তা ভাসিয়ে দিচ্ছিল মাটি, আবার কখনও আগের মতো নিঃশব্দে ঝিরঝির করে ঝরছিল। সূর্যের দেখা পাওয়ার বিন্দুমাত্র ভরসা রইল না সেদিন।

শ্বেত প্রাসাদে গিয়ে কুচকাওয়াজের জন্যে তৈরি, সারিবাঁধা কলোনি-বাসিন্দাদের দেখা পেলুম। কৌতূহল নিয়ে ওরা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু আমি মুখখানাকে পাথরের মূর্তির মতো নির্বিকার করে রাখলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই এখান-ওখান থেকে রসালো মন্তব্য কানে আসতে

লাগল, মজা করে পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল ছেলেরা: 'নাকী কান্না চলবে না কিন্তু!'

কলোনির পতাকা-বাহককে আমার কাছে পাঠানো হল, স্পষ্টতই আমার মতিগতি বোঝার জন্যে।

'আমরা কি নিশানখান নিয়ে যাব?'

'প্রতীক-পতাকা ছাড়া আমরা যাই কী করে?'

'দেখতেছেন তো — বিষ্টি পড়তেছে...'

'একে কি বৃষ্টি বলে নাকি? যাই হোক, শহরে পৌঁছনো পর্যন্ত নিশানখানা ঢেকে রেখো, তাহলেই হবে।'

'ঠিক হ্যয়!' নম্রভাবে জবাব দিল পতাকা-বাহক।

সকাল সাতটায় বিউগ্ল-সংকেত বাজানো হল। কর্মসূচি অনুযায়ী কাঁটায়-কাঁটায় সার বেঁধে শহরমুখো যাত্রা শুরু করলুম আমরা। কলোনি থেকে শহর-কেন্দ্র ছিল পাক্কা দশ কিলোমিটার পথ, আর প্রতিটি কিলোমিটার পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগও লাগল বাড়তে। শহরের প্রধান চত্বরে পৌঁছে জনমানিষ্যির দেখা মিলল না, বোঝা গেল সভা আর মিছিলের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেছে। ফেরার পথে বৃষ্টি পড়তে লাগল মুষলধারে, কিন্তু তখন আর আমাদের ভ্রূক্ষেপ করার মতো কিছু ছিল না: প্রত্যেকেই তখন টুপটুপে হয়ে ভিজে গিয়েছিলুম. আমার বুটজোড়াকে মনে হচ্ছিল যেন কানায়-কানায় ছাপাছাপি জলভর্তি দুটো মগ। ছেলেদের সারিকে দাঁড় করিয়ে একসময়ে আমি বললুম:

'ড্রামগুলো ভিজে গেছে - কাজেই গান শুরু করা যাক। একটা ব্যাপারে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল সারির কোনো কোনো অংশ এলোমেলো হয়ে চলছে, বেতালে হাঁটছে। আরেকটা কথা — তোমরা ঘাড় আরও সোজা টানটান করে হাঁটো।'

কলোনি-বাসিন্দারা হেসে উঠল হৈ-হৈ করে। বৃষ্টির জল ওদের মুখের ওপর দিয়ে নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে তখন।

'ফর্ওয়ার্ড - মার্চ!'

কারাবানভ গান ধরল:

> গাড়োয়ান, ওরে গাড়োয়ান!
> তোর কুত্তালাহান জান...

গানটা আমাদের ওই অবস্থার সঙ্গে এতটা খাপ খেয়ে গেল বলে মনে হল যে গান শুনেও হেসে উঠল ছেলেরা। ফিরেফিরতি দ্বিতীয়বার গাইবার মুখে সকলেই ধরে দিল গানটা। জনশূন্য, বৃষ্টির জলে-ভাসা রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে গানটা হাওয়ায় ভেসে চলল।

প্রথম সারিতে আমার পাশে-পাশে হাঁটছিল চোবত। ও গানও গাইছিল না, বৃষ্টির দিকেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না ওর, কেবল সামনের দিকে ড্রাম-বাজিয়েদের ছাড়িয়ে কোথাও একটা বিন্দুতে চোখ দুটোকে সমানে আটকে রেখেছিল। আমি যে ওকে আগাগোড়া লক্ষ্য করে যাচ্ছি তা পর্যন্ত টের পাচ্ছিল না।

স্টেশন পেরিয়ে আসার পর সারি ভেঙে ছেলেদের সহজভাবে হাঁটার অনুমতি দিলুম। কারো কাছেই তখন একটা শুকনো সিগারেট কিংবা শুকনো একদলা জমাট তামাক ছিল না, তাই সকলেই আমার চামড়ার সিগারেট কেসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে ছেলেরা বেশ গর্বের সঙ্গেই মনে করিয়ে দিল:

'এখনও পর্যন্ত আমরা কিন্তু কেউ নাকী কান্না জুড়ি নাই!'

'দাঁড়াও এখনই হয়েছে কী? সামনের ওই মোড়টা ঘুরলেই দেখবে আকাশ থেকে পাথর পড়ছে — তখন কী বলো দেখা যাবে'খন!'

'পাথরের অত সুবুদ্ধি হবে না নিশ্চয়ই,' লাপত বলল। 'তবে পাথরের থেকে আরও ঢের-ঢের খারাপ জিনিস আছে — যেমন, মেশিনগান।'

কলোনির এলাকায় ঢোকার আগে আমরা আবার লাইন করে দাঁড়ালুম, থাকে-থাকে সারি বাঁধলুম, তারপর আগের জের টেনে ফের গান ধরে দিলুম। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ক্রমশ-বেড়ে-ওঠা আওয়াজকে চাপা দেয়া যদিও গায়কদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হচ্ছিল, তবু। আর হঠাৎ এই সময়ে আমাদের মনে খুশির চমক লাগিয়ে, যেন ভালোয়-ভালোয় ফিরে আসায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাতেই সে-বছরের প্রথম বাজ পড়ল। কলোনিতে ঢুকলুম আমরা গর্বভরে মাথা খাড়া রেখে জোর কদমে কুচকাওয়াজ করতে-করতে। প্রতিবারের মতো সেবারেও পতাকাকে অভিবাদন জানালুম প্রথমে, আর তার পরই সবাইকে তাড়া লাগালুম ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলাতে। তবে ছেলেরা ঘরে যাবার আগেই পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলুম:

'পয়লা মে জিন্দাবাদ! হুর্‌রে!'

ভিজে টুপিগুলো ছুড়ে-ছুড়ে লোফালুফি করতে-করতে, চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচা
আর আমার হুকুমের তোয়াক্কা না-রেখেই ছেলেরা ফের ছুটে এল আমা
দিকে। তারপর আমাকে নিয়েই ছুড়ে-ছুড়ে লোফালুফি জুড়ে দিল তারা, আ
নিজের বুটজোড়া থেকে বেরনো জলের ধারায় আবার একবার আমি স্না
সেরে উঠলুম।

এর একঘণ্টা পরে নতুন একটা স্লোগান ক্লাবঘরের দেয়ালে লটকিয়ে দেয়া হল। মস্ত লম্বা একখানা কাপড়ের ওপর দেখা গেল লেখা আছে মা গুটিচারেক শব্দ:

'নাকী কান্না চলবে না!'

১৫

দুঃসময়

৩ মে রাত্রে গলায় দড়ি দিল চোবত।

পরদিন খুব ভোরে রাতের পাহারাদার-বাহিনী আমাকে ঘুম থেকে তুলল। ঘরের জানলার শার্সিতে বাইরে থেকে টোকা দেয়ার আওয়াজ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করলুম কী হয়েছে। সেইমাত্র দড়ি কেটে আস্তাবলের কাছাকাছি একটা জায়গায় ওরা চোবতকে নামিয়েছিল আর লণ্ঠনের আলোয় তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না আর ছেলেরা মিলে তার শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারলেন বটে, কিন্তু একবারের জন্যেও জ্ঞান ফিরল না তার। ওইদিন সন্ধের দিকে মারা গেল চোবত। শহর থেকে কল্-দিয়ে-আনা ডাক্তাররা আমাদের বললেন যে চোবতের প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব ছিল। আস্তাবলের চালা থেকে আড়াআড়িভাবে বেরিয়ে-থাকা খুঁটোয় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল সে। বোঝা গেল, ওই খুঁটোর ওপর উঠে দড়ির অপর প্রান্ত নিজের গলায় শক্ত করে কষে বেঁধেছিল, তারপর নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই পড়ার ফলে তার ঘাড়ের পেছনে শিরদাঁড়ার ভেতরের সুষুম্নাকাণ্ডটিই গিয়েছিল ছিঁড়ে।

চোবতের আত্মহত্যার খবর ছেলেরা কিছুটা সতর্কভাবে গ্রহণ করল। বিশেষ কোনো শোক প্রকাশ করল না কেউ, তবে ফেদরেঙ্কো বলল:

'আহা, বেচারা কসাক — বেঁচে থাকলি ও বুদিয়োনির বাহিনীতে ভালো সেপাই হতি পারত!'

কিন্তু লাপত তার জবাবে বলল:

'ও কোনোদিনই বুদিয়োনির বাহিনীতে সেপাই হতি পারত না! কুলাকের মতন ও জীবন কাটাতেছিল, মরেছেও কুলাকের মতন। অতি লোভই ওর কাল হল আর-কি।'

যে-ক্লাবঘরে চোবতের কফিনটা রাখা ছিল রীতিমতো রাগ আর ঘেন্না নিয়ে সেদিকে তাকাতে লাগল কভাল। কফিনের চারপাশে সম্মানসূচক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও সে অস্বীকার করল, এমন কি অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানেও এল না। ওর বক্তব্য ছিল:

'চোবতের মতন ছোকরাদের আমি নিজেই ফাঁসি দিতে পারলে বাঁচি। আহাম্মকের মতন কাজকর্ম করে ওরা খালি লোকের পথের কাঁটা হতেই জানে।'

একমাত্র মেয়েরাই শুধু চোখের জল ফেলল। এমন কি তাদের মধ্যেও মারুসিয়া লেভ্‌চেঙ্কো একসময়ে চোখ মুছে রীতিমতো রাগত স্বরে বলল:

'মুখ্যু, মুখ্যু, একবারে আহাম্মক! ব্যাপারখান কেমন বোঝ — অর সাথে গিয়ি নাকি ঘর করতি লাগবে! তাই বটে! নাতাশার ভাগ্যি ভালো যে অর সাথে যায় নাই সে! দুনিয়ায় অমন চোবত ঢের-ঢের আছে — নাতাশার পক্ষি তাদের সব কয়টারে সুখী করা সম্ভব না! কাজেই অদের আরও কয়টা গলায় দড়ি দিক গিয়ি!'

নাতাশা কিন্তু কাঁদছিল না। আমি যখন মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে তাদের শোবার ঘরে গেলুম সে তখন আতঙ্কিত বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিচু গলায় শুধোল:

'আমি এখন কী করি?'

আমার হয়ে মারুসিয়াই তাকে উত্তর দিলে:

'কী আবার! তুইও কি গলায় দড়ি দিতি চাস নাকি? আহাম্মকটা যে তোর পথ থেকে সরে যাওয়ার মতন কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেছে তার জন্যি

তোর কপালরে ধন্যবাদ দে! যদি ও বাঁচত তাইলে সারা জীবন জ্বালায়ে মার্ত তোরে। কী করবি তাই নিয়ি আবার ভাবনা! যখন এরপর 'রাব্‌ফাক'-এ ঢুকবি তখন এ-নিয়ি চিন্তা করার বহুত সময় পাবি...'

ক্রুদ্ধ মারুসিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাল নাতাশা। তারপর প্রীতিভরে তার কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বলল:

'ঠিক আছে, তাইলে তাই।'

'আমিই নাতাশার গার্জেন হব,' উদ্ধত, জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মারুসিয়া বলল।

রসিকতা করে পায়ে পা ঠুকে নিচু হয়ে অভিবাদন করলুম ওকে।

তারপর বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হোয়ো কমরেড লেভ্‌চেংকো। আচ্ছা, এ-ব্যাপারে আমি কি তোমার সহযোগী হতে পারি?'

'পারেন, যদি আপনে কথা দ্যান যে নিজি গলায় দড়ি দিবেন না। আপনে তো জানেন এমন অনেক গার্জেন আছে যারা বিলকুল অপদার্থ। আর এক-আধজনাকে বাদ দিলি গার্জেনগুলা প্রায়ই উপদ্রব হয়ি দাঁড়ায়।'

'ঠিক হ্যয়!' সেলাম ঠুকে বললুম আমি। 'ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করব'খন।'

মারুসিয়ার কাছ থেকে সরে এসে নাতাশা এবার তার দুই নতুন গার্জেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর মুখে একটু যেন রক্তসঞ্চারও হল বলে মনে হল।

খুশির সুরে মারুসিয়া ওকে বলল, 'চল্, আমাদের সাথে জলখাবার খাবি। আহা, বেচারা বাচ্চা মেয়েটা রে!'

ব্যাপারটার এই দিকটা সম্পর্কে অতঃপর আমার মন কিছুটা ঠাণ্ডা হল। সন্ধেবেলা তদন্তকারী করোনার আর মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না এসে হাজির হলেন কলোনিতে। করোনার ভদ্রলোককে আমি বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করালুম নাতাশাকে জেরা না-করতে। দেখা গেল লোকটি পরের মন বুঝে চলতে জানেন। কেবল সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতি লিখে এবং আমাদের দেয়া রাতের খানা খেয়ে আস্তে-আস্তে চলে গেলেন তিনি। মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না রয়ে গেলেন অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে। সেদিন অনেক রাত্রে কলোনিতে সবাই ঘুমোলে পর কালিনা ইভানভিচকে সঙ্গে করে তিনি অফিসে এলেন। ক্লান্তভাবে সোফায় বসে পড়ে বললেন:

'আপনার কলোনি-বাসিন্দারা সবাই অমানুষ, বুঝলেন! তাদের একজন সাথী মারা গেল আর তারা কিনা দিব্যি হেসেখেলে বেড়াচ্ছে! আর আপনার ওই লাপত, আগের মতোই ও ভাঁড়ামি জুড়ে দিয়েছে।'

পরের দিন আমাদের 'রাব্ফাক' ছাত্রছাত্রীদের বিদায় দিতে সঙ্গে গেলুম আমি। স্টেশনে যাওয়ার পথে ভের্শ্নেভ তার ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করল এইভাবে:

'ব্যা-ব্যা-ব্যাপারখান যে কী, তা ছোঁড়ারা মো-মো-মোট্টে বো-বোঝে না। জীবনটা ভালো ঠেকছিল না বলেই একটা মা-মা-মানুষ মরবে বলে মনস্থ করেছিল। আর ছোঁড়ারা মনে করেছে বুঝি না-না-নাতাশার জ-জন্যিই মরেছে। আসলে ও মরেছে জী-জী-জীবনটারে আর সহ্য করতে পারছিল না বলি।'

শুনে বেলুখিন আপত্তিসূচক মাথা নাড়ল। বলল:

'মোটেও তা না! চোবতের পক্ষে ভালোভাবে জীবন কাটানো সম্ভবই ছিল না। ও মানুষের মতন মানুষ ছিল না, ছিল ক্রীতদাসের সামিল। আজকাল তো আর মালিক নাই, তাই ও চেষ্টা পাচ্ছিল নাতাশারে দেবতা বানাতি।'

'ইয়ার, তোরা বড্ড বেশি গভীরে যাবার চেষ্টা পেতেছিস,' সেমিওন বলল। 'এটা আমার পছন্দ না! একটা ছোঁড়া গলায় দড়ি দেছে তো ঠিক আছে — মন থেকে তার নামটা কেটে দে! ব্যস, ফুইরে গেল! আমাদের তো আসচে কালের কথা ভাবতে হবে, নাকি! তবে আমি এই বলে থুলাম: তোরা সকলে গলায় দড়ি দিতে শুরু করার আগে কলোনি যত তাড়াতাড়ি এখেন থেকে উঠে যায় ততই ভালো।'

ফেরার পথে সারাটা রাস্তা আমি ভাবতে-ভাবতে এলুম: আমাদের কলোনির সামনে এখন কোন পথ খোলা? আমাদের মাঝখানে মস্ত বড় একটা সংকট ঘনিয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছিল, আর যে-সব জিনিসকে আমি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করছিলুম তারা যেন তলিয়ে যেতে বসেছিল অতলস্পর্শ গহ্বরে — হারিয়ে যেতে বসেছিল উজ্জ্বল আর জীবন্ত সেই সব বস্তু, আগের পাঁচ বছর ধরে যৌথ জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রায় অলৌকিকভাবে আবির্ভাব ঘটেছিল যাদের, কোনো প্রথাসিদ্ধ বিনয়ের বশেও যাদের অপরিসীম মূল্য আমি আমার নিজের কাছ থেকে লুকোতে ছিলুম অপারগ।

আমাদের মতো একটি যৌথ সংস্থায় ব্যক্তিগত জীবনপথের দুর্বোধ্য সংকটের জন্ম দিতে পারত না। ব্যক্তিগত জীবনের পথকে কখনই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাছাড়া স্পষ্টভাবে চিহ্নিত জীবনপথের তাৎপর্যই-বা কী হতে পারে? যৌথ জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, ঘনীভূত তুচ্ছতা ছাড়া তা আর কিছুই নয় — আসচে কাল কোথা থেকে রুটির সংস্থান হবে সেই চিরকেলে ক্লান্তিকর চিন্তা, সেই চিরকেলে যোগ্যতার বড়াই ছাড়া কিছু নয় তা। আর সে কেমন যোগ্যতা? না, ছুতোর-মিস্ত্রি, জুতো তৈরির কারিগর আর ঘানিচালক হওয়া... না-না, এ-বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমাদের এই সোভিয়েত জীবনে ষোল বছরের একটি ছেলের পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান ব্যাপার হল যোদ্ধা ও সত্যিকার মানুষ হওয়ার যোগ্যতা।

কলোনি-বাসিন্দাদের যৌথ জীবনের শক্তি যে কোথায় নিহিত সে-কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল ভুলটা কোথায় ঘটেছে। আরে, তাই তো — ভাবলুম, এটা আবিষ্কার করতে আমার এত সময় লাগল কেন? আসলে এত সব গণ্ডগোল ঘটেছে এই কারণে যে আমরা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেছি। অথচ যৌথ সংস্থার জীবনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়াকে কোনোক্রমেই বরদাস্ত করা চলে না।

একেবারে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠলুম। কী অপূর্ব ব্যাপার! কী চমৎকার, সর্বব্যাপী দ্বন্দ্বতত্ত্ব! মুক্ত-স্বাধীন, কর্মরত কোনো যৌথ সংস্থা কখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সাধারণ বিকাশের সর্বজাগতিক নিয়ম একমাত্র ওই আলোচ্য সময়েই তার আসল ক্ষমতার পরিচয় দিতে শুরু করেছিল। মুক্ত, মানবিক যৌথের অস্তিত্বের নিয়ামক ধরনগুলির অন্তর্নিহিত কথাই হল অগ্রগতি। আর মৃত্যুর নিয়ামক ধাঁচ — থমকে দাঁড়িয়ে পড়া।

হ্যাঁ, এর আগের প্রায় বছর দুই ধরে আমরা একই জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ছিলুম — সেই এক খেতখামার, একই যতসব ফুলের কেয়ারি, এক ছুতোরশাল আর সেই একই বাৎসরিক পরিক্রমা।

দ্রুত পা চালিয়ে সেদিন কলোনিতে ফিরে এলুম কলোনি-বাসিন্দাদের চোখের গভীরে একবার ভালো করে তাকাতে আর আমার এই বিরাট আবিষ্কারের যথাযথতা পরীক্ষা করে দেখতে।

ফিরে এসে দেখি শ্বেত প্রাসাদের গাড়িবারান্দার নিচে দ্'খানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। লাপত এসে খবর দিল:

'খার্কভ থেকে একটা কমিশন এসেছে।'

ভাবল্ম, 'ভালোই হল। ব্যাপারটার এখ্নি একটা ফয়সলা হয়ে যাবে'খন।'

আমার অফিস-ঘরে তখন তিন ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা হলেন, যথাক্রমে লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না দ্জ্রিন্স্কায়া; উজ্জ্বল, স্থির দৃষ্টি, আনকোরা নতুন নয় পরনে এমন একপ্রস্থ গাঢ় লালরঙের পোশাক, মোটাসোটা এবং এখন আর য্বতী নন এমন অপর একজন মহিলা; এবং লালচে ও ঈষৎ হল্দের মাঝামাঝি চুলের রঙ এমন একজন বিশেষত্বহীন প্র্ষ, যাঁর হয় একেবারেই দাড়ি ছিল না কিংবা থাকলেও তা খ্বই ছোট্ট একটুখানি ছিল। এই শেষের ভদ্রলোকটির এক হাতে ধরা ছিল একটা ব্রিফকেস, আর তাঁর চশমাজোড়া নাকের ওপর এতখানি ত্রিভঙ্গ হয়ে চেপে বসে ছিল যে অপর হাতখানা দিয়ে সারাক্ষণই তাঁকে চশমা সামলাতে হচ্ছিল।

জোর করে একটুখানি অমায়িক হাসি হেসে লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না আমার সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'এই যে কমরেড মাকারেঙ্কো এসে গেছেন! আস্ন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই! ইনি হলেন ভার্ভারা ভিক্তরভ্না ব্রেগেল, আর ইনি সের্গেই ভাসিলিয়েভিচ চাইকিন।'

ভার্ভারা ভিক্তরভ্নার কলোনিতে আসার বির্দ্ধে আমার কিছ্ বলার ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন আমার ওপরে সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি। কিন্তু এই চাইকিন লোকটি এল কেন? আমি তো শ্নেছিল্ম ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক। তাহলে? লোকটি আবার কোনো শিশ্-সদনের ম্যানেজারও বনে গেল নাকি?

'আমরা বিশেষ করে আপনার শিক্ষা-পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে দেখতে এসেছি,' বললেন ব্রেগেল।

বলল্ম, 'আমি জোর আপত্তি জানাচ্ছি। আমার পদ্ধতি বলে কোনো বস্তু নেই।'

'তাহলে আপনি কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন?'

'প্রচলিত সোভিয়েত পদ্ধতি।'

ব্রেগেল তেতো হাসি হাসলেন। বললেন:

'পদ্ধতিটা সোভিয়েতের হতে পারে তবে কোনোক্রমেই সেটা প্রচলি‍ত কোনো পদ্ধতি নয়। ব্যাপারটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

অতঃপর শুরু হল সেই ধরনের অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা আলোচনা যাতে লোকে এই সরল বিশ্বাসে পরিভাষা নিয়ে লোফালুফি খেলতে থাকে যে পরিভাষা বুঝি বাস্তব অবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ। অবশেষে আলোচনাটা থামিয়ে দেয়ার জন্যে বললুম:

'এভাবে কথা চালিয়ে যেতে আমি রাজি নই। আপনারা যদি চান তাহলে আমি একটা রিপোর্ট পেশ করতে পারি। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু — রিপোর্ট পেশ করতে ঘণ্টা তিনেকের কম সময় লাগবে না।'

ব্রেগেল এতে রাজি হলেন। দরজায় তালা লাগিয়ে তখনই অফিস-ঘরে বসে গেলুম আমরা। আর, তার আগের পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে একটু-একটু করে জমে-ওঠা যতসব অনুভব, ধ্যানধারণা, দ্বিধা-সন্দেহ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ভাষায় রূপদানের মরিয়া চেষ্টায় প্রাণপণে আমি আত্মনিয়োগ করলুম। আমার নিজের মনে হতে লাগল চমৎকার বাকপটুতার পরিচয় দিচ্ছি. অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমস্ত ধ্যানধারণা প্রকাশের উপযোগী একেবারে লাগসই ভাষা উদ্ভাবন করে চলেছি, তখনও পর্যন্ত রহস্যে-ঢাকা আলোচনার এমন সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ সতর্কতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি শব-ব্যবচ্ছেদের ছুরি আর ভবিষ্যতের জন্যে, ভবিষ্যতের নানা অসুবিধা অতিক্রমের উদ্দেশ্যে নীতিনির্দেশ করে যাচ্ছি হেলায়ফেলায়। সে যাই হোক, আমি কিন্তু কর্তব্য-সম্পাদনে পুরোপুরি আন্তরিক ছিলুম. কারও কুসংস্কারকে খাতির করে চলছিলুম না এবং 'তত্ত্বকথা'র কিছু-কিছু দিক একই সঙ্গে অ-কার্যকর ও বেমানান হয়ে উঠেছে বলে আমার যে মনে হচ্ছিল তা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছিলুম না।

খুশিভরা প্রদীপ্ত মুখ নিয়ে আমার কথা শুনছিলেন দ্‌জুরিন্‌স্কায়া, ব্রেগেলের মনোভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না আর চাইকিনকে নিয়ে আমারই কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

আমার বলা শেষ হলে মোটা-মোটা আঙুলগুলো দিয়ে টেবিলের ওপর চাপড় মারলেন ব্রেগেল। তারপর এমন এক ভঙ্গিতে কথা বললেন যে তিনি আন্তরিকভাবে বলছেন নাকি ব্যঙ্গ করছেন তা ঠিক বুঝে ওঠা গেল না:

'আহা... ভারি আগ্রহোদ্দীপক তো। সত্যি, বলতেই হয়, অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক। তাই নয় কি, সের্গেই ভাসিলিয়েভিচ?'

চশমাজোড়া আবার নাকের ওপর সোজা করে বসাতে প্রয়াস পেলেন চাইকিন তারপর লেখার প্যাডের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। আর পণ্ডিত-জনোচিত অত্যন্ত সৌজন্যসহকারে, নানা ধরনের মোলায়েম মুখভঙ্গি করে আর সম্মানপ্রদর্শনের সামান্য একটুখানি ভান দেখিয়ে নিচের এই বক্তৃতাটি ঝাড়লেন:

'অবশ্যই এই সবকিছুর বিশদ ব্যাখ্যা দরকার... তবে এমনিতে এমন কি আপাতদৃষ্টিতেও কিছু-কিছু -- ওকে কী বলে -- উপপাদ্য সম্পর্কে আমার কিছুটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। এ-সবই অবশ্য অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন আর তা এতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যে তাতে আপনার আন্তরিকতাই প্রমাণ হচ্ছে। ভালো কথা। কিন্তু ধরুন, একটা ব্যাপারের কথা আমরা আগেই শুনেছি অথচ মনে হল যেন সেটার উল্লেখ না-করে আপনি নিঃশব্দে এড়িয়ে গেলেন -- অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি আপনার রক্ষণাধীন ছেলেদের মধ্যে একধরনের, যাকে বলে, প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা হয়েছে এখানে: যে সবচেয়ে বেশি কাজ করবে সে প্রশংসা পাবে আর যে সবচেয়ে কম করবে তাকে দুয়ো দেয়া হবে। আপনাদের জমিচাষের সময়ে এই ধরনের একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাই নয় কি? কিন্তু আপনি এ-সম্বন্ধে কিছুই বললেন না, বোধহয় অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা বাদ দিয়ে গেলেন। এখন, আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে প্রতিযোগিতাকে আমরা যে অত্যন্ত স্থূল বুর্জোয়া একটা পদ্ধতি বলে গণ্য করি কেননা এটা নানা ব্যাপার সম্পর্কে মানুষের প্রত্যক্ষ মনোভঙ্গির পরিবর্তে অপ্রত্যক্ষ মনোভঙ্গির যোগান দেয় -- এই কথাটা কি আপনার জানা আছে? এটা গেল এক কথা। এছাড়া, রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের আপনি পকেটখরচা দিয়ে থাকেন -- অবশ্য উৎসবের দিনগুলোতেই -- এবং এই পকেটখরচাও সকলে সমানভাবে পায় না। প্রত্যেকের, যাকে বলে যোগ্যতা, সেই অনুসারে এরও তারতম্য ঘটে থাকে। আচ্ছা, এটা কি আপনার মনে হয় না যে ছেলেমেয়েদের আন্তর প্রেরণাকে উদ্দীপিত করে না-তুলে তার পরিবর্তে আপনি বাহ্য এবং অত্যন্ত স্থূল একটা বৈষয়িক লোভের ফাঁদে ফেলছেন তাদের? আরও কথা আছে: যেমন ধরুন,

আপনি যাকে শাস্তিদান বলে থাকেন তার কথা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে শাস্তিদান মানুষকে ক্রীতদাস করে তোলে, অথচ আমরা যা চাই তা হল স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ — যে-ব্যক্তির আচরণকে বেত খাওয়া বা অন্য কোনো দণ্ডভোগের ভয় নিয়ন্ত্রণ করবে না, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে আন্তর উদ্দীপনা এবং রাজনৈতিক চেতনা...'

এইসব এবং এবম্বিধ আরও নানা কথা বলে গেল চাইকিন লোকটি। ওর লেকচার শুনতে-শুনতে আমার মনে পড়ে গেল চেখভের গল্পের সেই মানুষটির কথা, যে নাকি বিরক্তি-উৎপাদক একটি মেয়েকে কাগজচাপা ছুড়ে মেরেছিল। তারপর আমার মনে হল যে চাইকিনকে খুন করার কোনো দরকার নেই -- ওর পক্ষে যা বিশেষ দরকার তা হল খুব কষে ঘাকতক বেতের বাড়ি, বার্চের ডাল কিংবা চাবুকের মতো পুরনো রাজত্বের আমলের শুদ্ধিকরণের কোনো হাতিয়ারের সাহায্যে নয়, বরং শ্রমিকের ট্রাউজার্স কোমরে আঁটো করে রাখে যা সেই রকম সাধারণ একটা বেল্‌ট্‌ দিয়ে। মতাদর্শের বিচারে ওইটিই ছিল ওর পক্ষে সঠিক প্রতিষেধক।

হঠাৎ চাইকিনের কথায় বাধা দিয়ে ব্রেগেল আমায় জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী হল, আপনি হাসছেন যে বড়? কমরেড চাইকিন যা বলছেন তাতে হাসির কী পেলেন?'

বললুম, 'না-না, কী যে বলেন! ওতে হাসির কিছুই নেই...'

'তাহলে? দুঃখের কিছু আছে?' ব্রেগেল বললেন। এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি ফুটতে দেখলুম।

'না-না! মোটেই না! ওতে দুঃখেরও কিছু নেই। ওঁর বক্তব্য নেহাতই মামুলি, এইমাত্র।'

আমার দিকে একদৃষ্টে অল্পক্ষণ তাকিয়ে নিশ্বাস ফেললেন ব্রেগেল।

রসিকতা করে বললেন, 'আমরা এসে ঝামেলা পাকাচ্ছি, তাই না?'

'কিছু না, কিছু না -- লোকের ঝামেলা পাকানোতে আমি অভ্যস্ত। অনেকে এর চেয়েও বেশি ঝঞ্ঝাট করে থাকে।'

হঠাৎ ব্রেগেল হাসির দমকে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলেন।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু সারাক্ষণই ঠাট্টা করছেন, কমরেড মাকারেঙ্কো। আচ্ছা, সের্গেই ভাসিলিয়েভিচকে কি আপনি কোনো উত্তরই দিতে পারেন না?'

ব্রেগেলের দিকে সানির্বন্ধ মিনতিভরা চোখে তাকিয়ে বললুম:

'আমার মনে হয় শিক্ষা-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কমিটিও এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয়। ওখানে সব কাজই সঠিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, তাই না? এ-সব ছেড়েছুড়ে আসুন আমরা বরং দুপুরের খানা খেয়ে নিই!'

'ঠিক আছে,' একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে ব্রেগেল বললেন। 'ও, হ্যাঁ, ভালো কথা। আচ্ছা, আপনাদের ছাত্র অপ্রিশ্‌কোকে কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'মাত্‌লামির জন্যে তাকে কলোনি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।'

'সে এখন আছে কোথায়? রাস্তায় নিশ্চয়ই?'

'না, খুব কাছেই থাকে সে। এক কুলাকের পরিবারে থাকে।'

'আপনি কি বলতে চান প্রতিপাল্য হিসেবে তাকে ওখানে পাঠিয়েছেন?'

'কিছুটা সেই রকমই বটে,' হেসে বললুম।

'সে ওখানেই আছে তো? আপনি ঠিক জানেন?'

'হ্যাঁ, ঠিকই জানি। স্থানীয় এক কুলাক লুকাশেঙ্কোর পরিবারে এখন আছে সে। আরও দু'টি অনাথ ছেলেকেও এই মান্যবর ব্যক্তিটি 'প্রতিপাল্য' হিসেবে পুষছে।'

'ব্যাপারটা আমাদের খোঁজখবর করে দেখতে হয়।'

'তা, দেখুন।'

দুপুরের খানা খেতে গেলুম আমরা। খাবার পর ব্রেগেল আর চাইকিন নিজেদের চোখে কিছু-কিছু দেখতে চাইলেন। ওঁদের ছেড়ে দিয়ে এবার আমি লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌নাকে সেলাম ঠুকে বললুম:

'মিষ্টি, প্রিয়, প্রাণাধিক শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকামশারিয়েত! আমরা এখানে গাদাগাদি করে রয়ে গেছি এবং আমাদের যথাসাধ্য করেছি। তবে আর মাস ছয়েক এভাবে থাকলে আমরা সবাই স্নায়বিক রুগী হয়ে উঠব। অতএব, দয়া করে আমাদের বড় কিছু কাজ দিন, এমন কিছু ভারি কাজ যাতে মাথা ঘুরে যায়। আপনাদের তো নানারকমের কাজকর্ম আছে। শুধু নীতির কচকচিই আপনাদের একমাত্র সম্বল নয় নিশ্চয়!'

শুনে লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না হাসলেন। বললেন:

'আপনার মনের ভাব বেশ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে

বৈকি। আসুন, এ-নিয়ে কথা বলা যাক!.. কিন্তু, এক-মিনিট — আপনি কেবল ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু নিয়েই কথা বলেন নি! কেন বলুন দেখি এই পরিদর্শনের ব্যাপারটায় আপনি কি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন?'

'ওহ্, না, মোটেই না! এছাড়া আর কী হতে পারত?'

'আর ওই সিদ্ধান্তগুলো — চাইকিনের প্রশ্নগুলো কি আপনাকে চিন্তিত করে তোলে নি?'

'চিন্তিত করবে কেন? শিক্ষা-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কমিটি তো প্রশ্নগুলো নিয়ে যা করার করবে, তাই না? এতেই তাদের কবরের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে'খন!..'

ওই রাত্রে শুতে যাবার আগে ব্রেগেল তাঁর প্রতিক্রিয়া আমাকে জানালেন

'আপনার এই যৌথ সংস্থাটি চমৎকার। তবু বলব, আপনার পরিচালন-পদ্ধতি ভয়াবহ।'

ভেতরে-ভেতরে ভয়ানক খুশি হয়ে উঠলুম আমি — ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ড্রাম-বাজিয়েদের যে কীভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে অন্তত তা উনি জানতে পারেন নি!

'শুভরাত্রি,' ব্রেগেল বললেন। 'ওহ্, ভালো কথা — জানেন, চোবতের মৃত্যুর জন্যে কেউই আপনাকে দোষী করার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারছে না...'

গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নিচু হয়ে অভিবাদন জানালুম ওঁকে।

১৬

দ্নিপার-পারের নাইটবৃন্দ

আরও একবার গ্রীষ্ম এল ঘুরে। আর আরও একবার সূর্যের দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিশ্র বাহিনীতে ভাগ-ভাগ হয়ে আমরাও গেলুম আবাদে কাজ করতে। আরও একবার চতুর্থ মিশ্র বা লাল নিশান বাহিনীর ডাক পড়ল কাজে আর প্রতিবারের মতো সেবারও বুরুন রইল তার নেতৃত্বে।

জুনের মাঝামাঝি কলোনিতে এসে পৌঁছল 'রাবফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা। তারা সঙ্গে করে নিয়ে এল উঁচু ক্লাসে ওঠার গৌরবসহ আরও দু-জন নতুন

সদস্য — অক্সানা আর রাখিলকে। কলোনি-বাসিন্দা হিসেবে অক্সানা আর রাখিলের পক্ষে ছুটি উপলক্ষে কলোনিতে আসা ছাড়া অন্য কোনো গতি ছিল না। এছাড়া ওদের সঙ্গে এল চের্নিগভের মেয়েটিও — আশ্চর্যরকম কালো একজোড়া ভুরু আর চোখ নিয়ে। মেয়েটির নাম ছিল গালিয়া পদ্গোর্নায়া। কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভায় সেমিওন নিয়ে এল তাকে, সকলকে দেখাল আর বলল:

'শুর্কা কলোনিতে লিখেছিল যে আমি নাকি চের্নিগভের এই মেয়েরে দেখে মজেছি। এটা একদম বাজে কথা — আমি যা বলতেছি এই হল গিয়ে কম্সমোল-সদস্যের কথা, বাজে কথা না! ব্যাপারটা হল গিয়ে এই, ছুটিতে গালিয়ার যাবার মতন, তোরা যারে কইতে পারিস, ভূখণ্ড – তা ছিল না। তাইলে কমরেড কলোনি-বাসিন্দারা আমাদের বিচার কর্ দেখি — বল্ দেখি, কে ঠিক আর কে সম্ভবত বেঠিক।'

এই বলে সেমিওন মাটিতে আসন গেড়ে বসল। সভাটা হচ্ছিল খোলা বাগানে।

চের্নিগভের মেয়েটি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমাদের সদস্যদের দেখছিল — খালি পা, গায়ে হাতকাটা জামা, কিছুকিছু ছেলে তো কার্যত উলঙ্গই বলতে গেলে। ঠোঁট দু'টো কুঁচকে, চোখ সরু-সরু করে, মস্ত-মস্ত মসৃণ চোখের পাতাগুলো পিটপিট করতে-করতে লাপত খসখসে গলায় বলল:

'কমরেড চের্নিগভ্কা, দয়া করে আমাদের বল... ওই... যে... ওই...'

চের্নিগভ্কাসহ সারা সভার লোক এবার কী-না-কী আজগবি কথা শুনবে সেই ভরসায় কান খাড়া করে রইল।

'...ওই ...তুমি কি জানো 'আমাদের পিতা'র পাঠ?..'

শুনে চের্নিগভের মেয়েটি হাসল, কেমন যেন অস্থির-অস্থির ভাব করল একটু, লাল হয়ে উঠল, তারপর ইতস্তত করে উত্তর দিল:

'না, জানি না...'

'হায়, হায়! জানো না!' ঠোঁট দু'টো আরও ছুঁচলো করে আর ফের চোখ পিটপিট করে লাপত বলল। 'আচ্ছা, এটা জানো কি 'আমি বিশ্বাস করি যে'?'

'না, জানি না...'

'হ্ঃহ্ঃ বাবা! আচ্ছা, তুমি সাঁতরিয়ে দ্নিপার পার হতি পার?'

ঘাবড়ে গিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে চের্নিগভের মেয়েটি বলল:

'তা ঠিক বলতি পারি না। তবে আমি সাঁতার কাটতি পারি ভালোই, মনে হয় হয়তো পার হতি পারব...'

শুনে লাপত এমন মুখভঙ্গি করে সভার দিকে ফিরল যে মনে হল যেন একটা হাবাগবা ছেলে বিষম ভাবনায় পড়ে গেছে: ঠোঁট দুটো গোল-গোল করে ফুলিয়ে, চোখের পাতা পিটপিট করতে-করতে একটা আঙুল ওপর দিকে তুলে আর নাকটা উঁচু করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। আর এই পুরো ভঙ্গিটা কিছুক্ষণ ধরে বজায় রাখল সে মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও না-ফুটিয়ে।

তারপর বলল, 'তাইলে মোদ্দা কথাটুক দাঁড়াল এই রকম: 'আমাদের পিতা'র পাঠ মেয়েটি জানে না, 'আমি বিশ্বাস করি যে' কিসে তা জানে না। ও দ্নিপার সাঁতার দিয়ি পার হতি পারে। নাকি, তা বোধ করি পারে না?'

'পারে, পারে!' গোটা সভার লোক চেঁচিয়ে উঠল।

'ঠিক আছে। দ্নিপারে যদি ও সাঁতার দিতি না পারে, তাইলে অন্তত্পক্ষে কলমাকে তো সাঁতার দিতি পারে?'

'পারে, পারে!' হাসতে-হাসতে ফের চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।

'তাইলে এর অর্থ, মেয়েটি আমাদের 'দ্নিপার-পারের নাইটবৃন্দ' নামের কলোনির হয়ে কাজ করতি পারে?'

'করতি পারে!'

'কোন বাহিনীতে?'

'পঞ্চম!'

'তাইলে ওর মাথায় একমুঠো বালু দেয়া হোক আর ওরে ওর বাহিনীর কাছে নিয়ি যাওয়া হোক।'

'শোন্, বলি!' এবার কারাবানভ চেঁচিয়ে বলল। 'শুধু আতামানদের মাথাতেই তো বালু চাপানো হোত...'

'ওরে অ কসাক, আমারে ক' দেখি!' সেমিওনকে উদ্দেশ করে লাপত বলল। 'জীবনের কি বাড়বৃদ্ধি হয়, না না?'

'বাড়বৃদ্ধি অবিশ্যি হয়। কিন্তু তাতে হলটা কী?'

'হল এই যে আগেকার দিনে শুধু প্রধান আতামানদের মাথাতেই লোকে ফুল ছড়াত, আর এখন সক্কলের মাথায় বালু দেয়।'

'ওহো, তাই তো!' কারাবানভ বলল। 'ঠিক কথা!'

বাস উঠিয়ে জাপরোজিয়ে অঞ্চলে চলে যাওয়ার ধারণাটা আমাদের মাথায় আসে দ্জুরিনস্কায়ার কাছ থেকে একখানা চিঠি পাওয়ার পর। হর্তিতসা দ্বীপে শিশুদের নিয়ে প্রকান্ড বড় একটা উপনিবেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা একটা গুজবের কথা সেই চিঠিতে তিনি আমাদের জানান। চিঠিতে তিনি আরও লেখেন যে তিনি শুনেছেন শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েত চায় যে গোর্কি কলোনিই ওই নতুন কলোনির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করুক।

এই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ছকে ফেলার কাজ তখনও পর্যন্ত শুরু হয় নি। আমার জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে দ্জুরিনস্কায়া জানিয়েছিলেন যে এ-ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে এবং এর সবকিছুই নির্ভর করছে দ্নিপার নদী-প্রকল্পের পরিকল্পনা পেকে ওঠার ওপর।

খার্কভে এ-নিয়ে যে কতদূর কী কাজ চলছে সে-সম্পর্কে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তবে কলোনিতে এ-নিয়ে প্রচুর গুলতানি চলছিল। কিসের স্বপ্নে যে কলোনি-বাসিন্দারা মশগুল হয়েছিল তা এখন বলা শক্ত — সে কি দ্নিপার, না আমাদের স্বপ্নের দ্বীপটি, নাকি দিগন্তবিস্তার খেত কিংবা কোনো ফ্যাক্টরি তা কে জানে! অনেকেই জল্পনা করছিল যে এবার নিশ্চয়ই আমাদের নিজস্ব একখানা স্টিমার হবে। লাপত এই বলে মেয়েদের খেপিয়ে মারছিল যে প্রাচীন একটা লোকপ্রবাদ অনুযায়ী যেহেতু হর্তিতসা দ্বীপে মেয়েদের স্থান নেই সেই হেতু দ্নিপারের অপর পারে মেয়েদের থাকার আলাদা একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সান্ত্বনা দিয়েও বলত লাপত, 'তা সে যাই হোক, আমরা কিন্তু মাঝেমধ্যেই তোদের সাথে দেখা করতি যাব। আর যখন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে যাবে তখন দ্বীপে বসিই সে-কাজ সেরে ফেলব-নে। সেটা তোদের পক্ষি অনেক ভালো হবে, নয় কি?'

উত্তরাধিকার-সূত্রে দ্নিপারের দ্বীপটি আমাদের পাওয়া নিয়ে 'রাব্ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরাও এইসব হাসিঠাট্টা আর স্বপ্ন-দেখায় পুরোমাত্রায় যোগ দিত আর স্বেচ্ছায় মেতে উঠত মজার এই খেলায়। এ-ধরনের ছেলেমানুষি খেলার অভ্যাস তখনও পর্যন্ত তারা পুরোপুরি ছাড়তে পারে নি। কলোনির উঠোনে

সঙ্গের পর সঙ্গে আমাদের দ্নিপার-পারের সম্ভাব্য জীবনযাত্রার অনুকরণে ব্যঙ্গাভিনয় দেখে হাসতে-হাসতে গোটা কলোনির লোকের চোখে জল এসে যেত। এ-উপলক্ষে কলোনির অধিকাংশ ছেলে খুব ভালো করে 'তারাস বুল্বা'* বইখানা পড়ে ফেলেছিল। অন্যকে নকল করার ক্ষমতার তুলনা ছিল না ছেলেদের। কখনও হয়তো দেখা যেত মঞ্চের পর্দার কাপড় দিয়ে তৈরি ট্রাউজার্স পরে উঠোনে আবির্ভূত হয়েছে কারাবানভ আর কীভাবে এ-ধরনের ট্রাউজার্স বানাতে হয় তা-ই নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে — বলছে এর জন্যে নাকি এক শো-কুড়ি আর্শিন কাপড় দরকার। আবার কখনও দেখা যেত নিজ সম্প্রদায়ের কাছে চুরির দায়ে অপরাধী দ্নিপার-পারের জনেক কসাকের মারাত্মক দন্ডদানের অভিনয় চলছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক লোক-ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত ছেলেরা: ঐতিহ্য অনুসারে এই শাস্তি দেয়া হোত বেত মেরে, আর যে-লোক তার আগে প্রকান্ড বড় একমগ ভোদ্কা খেয়ে নিত একমাত্র তারই অধিকার জন্মাত বেত চালানোর। 'প্রকান্ড বড় একমগ ভোদ্কা'র বদলে আমাদের উঠোনে জল্লাদকে খেতে দেয়া হোত প্রকান্ড বড় একপাত্র জল, যা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন তৃষ্ণার্তের পক্ষেও গলাধঃকরণ করা সম্ভব ছিল না। আরেক সময় হয়তো দেখা যেত চতুর্থ মিশ্র দৈনন্দিন কাজে বেরনোর সময়ে কর্তৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ বুরুনের হাতে তুলে দিচ্ছে একখানা গদা আর একখানা 'বুন্চুক'**। কুমড়োজাতীয় একটা ফলকে বানানো হোত গদা আর 'বুন্চুক' বানানো হোত লাইম-গাছের বাকল দিয়ে। তবু বুরুনকে এই সম্মান-প্রদর্শন সশ্রদ্ধভাবে মেনে নিতে হোত আর ঘুরে-ঘুরে কম্পাসের সব ক'টি দিকবিন্দু-বরাবর হেঁট হয়ে অভিবাদন জানাতে হোত।

এইভাবে কেটে গেল গোটা গ্রীষ্মকালটা। দ্নিপার-প্রকল্প তখনও পর্যন্ত পরিকল্পনার স্তরেই থেকে গিয়েছিল, এমন কি ছেলেরাও তা নিয়ে মজা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অগস্ট মাসে 'রাব্ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা চলে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল নতুন আরেক দল ছাত্রছাত্রীকে। এবার আরও পাঁচজন

* 'তারাস বুল্বা' — জাপরোজিয়ে কসাকদের জীবন-অবলম্বনে লেখা গোগলের উপন্যাস। — অনুঃ

** বুন্চুক — লোমসুদ্ধ ঘোড়ার চামড়ায় মোড়া ছোট বেটন। কসাক দলপতির হাতে এই লাঠি তাঁর পদমর্যাদার প্রতীক। — অনুঃ

দলপতি ছেড়ে গেল আমাদের, কিন্তু দ্বিতীয় বাহিনীর দলপতি, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও গোর্কি কলোনির আদিতম সদস্যদের একজন, আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো পেছনে স্মৃতির যে অপূরণীয় প্রকাণ্ড ক্ষত রেখে গেল তেমনটি আর কেউ রেখে গেল না। যাই হোক, শেষপর্যন্ত ব্রাত্‌চেঙ্কোও চলে গেল 'রাব্‌ফাক'-এ পড়াশুনো করতে। এমন কি অসাদ্‌চি — যার জন্যে এককালে আমাকে বড় কম ভুগতে হয় নি — সে-ও গেল চলে। একদিন সে ছিল সবচেয়ে পাকাপোক্ত দস্যু, আর এখন সে যখন চলেছিল খার্‌কভের প্রযুক্তিবিদ্যার ইন্‌স্টিটিউটে পড়াশুনো করতে তখন সে পাতলা-ছিপছিপে সুদর্শন যুবা, লম্বা, বলিষ্ঠ, সংযতবাক্‌, নিজস্ব এক ধরনের পৌরুষ ও প্রাণপ্রাবল্যে পূর্ণ। বিশেষ করে ওর সম্পর্কেই কভাল বলেছিল:

'এই হল গিয়ে আপনার, যাকে বলে, সত্যিকার কম্‌সমোল-সদস্য! এই অসাদ্‌চি! দুঃখের কথা যে এমন একজন কম্‌সমোল-সদস্যকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।'

কথাটা ছিল খুবই খাঁটি। এর আগের দু'বছর ধরে ময়দা-কল বাহিনীর দলপতির জটিল নানা দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করে চলেছিল অসাদ্‌চি — আর এই কাজটা ছিল অসংখ্য ভাবনাচিন্তায় ভরা আর হরেক গ্রামবাসী ও গরিব কৃষকদের সমিতির সঙ্গে অনবরত বোঝাপড়ায় আসার দায়িত্ব দিয়ে ঠাসা।

এমন কি গেওর্গিয়েভ্‌স্কি — ইর্‌কুত্‌স্কের শাসনকর্তার সেই ছেলেটি, সরকারি কাগজপত্রে যার নামের পাশে 'পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত' এই কথা ক'টি লেখা থাকা সত্ত্বেও যে তার উপরোক্ত বংশ-পরিচয়ের কলঙ্ক নামের পাশ থেকে কোনোদিনই মুছে ফেলতে সমর্থ হয় নি — সে-ও আমাদের ছেড়ে যাচ্ছিল।

আর ছেড়ে যাচ্ছিল স্বনামধন্য অষ্টম বাহিনীর দলপতি শনাইদের আর পঞ্চম বাহিনীর দলনেত্রী মারুসিয়া লেভ্‌চেঙ্কো — দু-জনেই।

'রাব্‌ফাক'-এর নতুন-পুরনো ছাত্রছাত্রীদের বিদায় দেয়ার পরমুহূর্তটিতেই আমরা লক্ষ্য করলুম আমাদের গোর্কিপন্থী সমাজ নিছক বাচ্চা ছেলেমেয়েতে কিলবিল করছে। এমন কি খোদ দলপতি-পরিষদেও এমন সব ছেলে স্থান পেয়েছে যারা এর অল্প কয়েকদিন আগেও ছিল কাচ্চাবাচ্চাদের গ্রুপে। যেমন, দ্বিতীয় বাহিনীর দলপতি নির্বাচিত হয়েছিল ভিত্‌কা বগয়াভ্‌লেন্‌স্কি,

আপ্রেশ্‌কোর বদলে তৃতীয় বাহিনীর দলপতি হয়েছিল কোস্তিয়া শারোভ্‌স্কি পঞ্চম বাহিনীর দলনেত্রী নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কো আর নবম বাহিনীর মিত্‌কা জেভেলি। আর বিপুলদেহী ফেদরেঙ্কো অবশেষে অর্জন করেছিল অষ্টম বাহিনীর দলপতির পদ। এছাড়া তিন বছর ধরে অবাধে একটানা নেতৃত্ব বজায় রাখার পর গেওর্গিয়েভ্‌স্কি কাচ্চাবাচ্চাদের বাহিনীর ভার সমর্পণ করে গেল তোস্‌কা সলভিয়েভের হাতে।

ফের একবার বীট আর আলু সংরক্ষণের জন্যে ট্রেঞ্চ খুঁড়লুম আমরা. আস্তাবলে খড় বিছলুম, বসন্তে বোনার উপযোগী বীজের বাছাই আর সংরক্ষণের কাজ সারলুম; আরও একবার জমিতে লাঙল দেয়ার কাজে লেগে গেল প্রথম আর দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনী, তবে সে-বছরে প্রতিযোগিতা ছাড়াই। আর এ-সব কাজের পরে খারক্‌ভের শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের কাছ থেকে আমরা একখানা সরকারি ছাড়পত্র পেলুম দ্‌নিপার-পারের পপোভ-তালুকটি পর্যবেক্ষণ করে দেখার।

আমার কাছ থেকে খবরটা শোনার পর এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের হুকুমনামার কাগজখানা হাত থেকে হাতে ফেরার পর তবেই কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভা অনুভব করল যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বটে। কারণ, উপরোক্ত ওই কাগজখানার সঙ্গে আরও একখানা কাগজ আমাদের দখলে এসেছিল যাতে শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েত জাপরোজিয়ের আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে এইমর্মে অনুরোধ জানিয়েছিল যে পপোভ-তালুকটিকে যেন কলোনির হেফাজতে ছেড়ে দেয়া হয়।

ওই সময়ে আমাদের মনে হয়েছিল যে এইসব সরকারি কাগজপত্র বুঝি সংশ্লিষ্ট সমস্যাটির চরম সমাধানের নিদর্শন। ভেবেছিলুম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর বুঝি আমাদের কিছুই করতে হবে না, নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করা হয় নি এমন সমস্ত পরিত্যক্ত তালুকমুলুক, অসফল কলোনি, সন্ন্যাসীদের মৃতপ্রায় মঠ আর অভিজাত পরিবারগুলোর বাগান-বাড়ি নিয়ে অনবরত মাথা-ঘামানোর ঝুটঝামেলা বুঝি এবার ভুলে থাকতে পারব আমরা, হর্‌তিত্‌সা দ্বীপের উপকথার বৃত্তান্ত ভুলে এবার বোধহয় মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে সোজা রওনা হয়ে যেতে পারব।

কলোনির সাধারণ সভা থেকে মিত্‌কা জেভেলি নির্বাচিত হল আমার

সঙ্গে গিয়ে সরেজমিনে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখা আর পপোভ-তালুকের দখল নেয়ার জন্যে। মিত্‌কার বয়স হয়েছিল পনেরো বছর। লম্বায় অনেকদিন থেকেই তার সমবয়স্ক বাচ্চাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল সে, ইতিমধ্যেই মিশ্র বাহিনীর দলপতিগিরি করার জটিল কায়দাকানুন আয়ত্ত করে ফেলেছিল, এক বছরেরও বেশি আগে থেকে ছিল সে কম্‌সমোলের সদস্য এবং এ-ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে নবম (বা ময়দা-কল পরিচালক) বাহিনীর দলপতির দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য বলে সকলের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছিল। মিত্‌কা ছিল গোর্কিপন্থীদের একেবারে নতুন ধাঁচের একজন প্রতিনিধি। পনেরো বছর বয়সের মধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা, সুস্থিত চালচলন এবং সংগঠনের ক্ষমতা, আবার ওই একই সঙ্গে আত্মস্থ করেছিল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, লড়াই-পটু এক পুরুষের অনেক কিছু ধরনধারণ। কলোনিতে আসার পর প্রথম দিনটি থেকেই মিত্‌কা বনে গিয়েছিল কারাবানভের চেলা। মনে হোত কারাবানভের কাছ থেকেই যেন সে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিল ঝকঝকে কালো চোখ আর সুন্দর প্রাণচঞ্চল ভাবভঙ্গি। তবে মিত্‌কা আর সেমিওনের মধ্যে প্রকান্ড একটা তফাত ছিল এই যে পনেরো বছর বয়সে মিত্‌কা পড়ছিল মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে।

নভেম্বরের শেষে একটা পরিষ্কার, অত্যন্ত ঠান্ডা কিন্তু তুষারমুক্ত দিনে মিত্‌কা আর আমি যাত্রা করলুম, আর চব্বিশ ঘণ্টা পরে গিয়ে পেঁছিলুম জাপরোজিয়েতে। এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার বশে আমরা ভেবেছিলুম যে গোর্কি কলোনির নতুন সুখের দিন বুঝি শুরু হতে যাচ্ছে খানিকটা এই ধরনে: আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ভদ্রলোকের মুখখানি হবে মিষ্টি আর বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় পূর্ণ, আর তিনি আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন, ভারি খুশি হবেন আমাদের দেখে। ভাবলুম, দেখা হতেই তিনি নিশ্চয় বলে উঠবেন, 'কী, পপোভ-তালুক? গোর্কি কলোনির জন্যি? নিচ্চয়, নিচ্চয়, সে আর বলতি · সব কথাই জানি আমি! নেন, নেন, এখুনি নিয়ি নেন ক্যানে! তালুকের জন্যি এই হল্য গিয়ি আপনের হুকুমনামা, সোজা চল্যে গিয়ি দখল নেন এবার!'

আর তারপর আমাদের যা করতে হবে তা হল কেবল তালুকে পেঁছনোর পথটুকু জেনে নেয়া, তারপর একদৌড়ে কলোনিতে ফিরে গিয়ে সকলকে বলা

দ্রুত তৈরি হয়ে নিতে আর যত তাড়াতাড়ি পারে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে নিতে।

তাছাড়া এটা আমাদের কখনই খেয়াল হয় নি যে পপোভ-তালুক আমাদের পছন্দ না-ও হতে পারে। এমন কি মিত্‌কা আর আমি খার্‌কভে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের কড়া আত্মসংযমী ব্রেগেল পর্যন্ত বললেন:

'পপোভ-তালুক? মাকারেঙ্কো যেমনটি চান তালুকটা ঠিক সেই রকম। পপোভ লোকটার বোধহয় মাথায় একটু ছিট ছিল, তবে লোকটা কিছু দালান বানিয়েছে বটে জায়গাটায়! ওখানে গেলে নিজের চোখেই দেখতে পারেন সব। চমৎকার তালুকটা, আপনাদের দিব্যি পছন্দ হবে!'

দ্‌জুরিন্‌স্কায়াও অনেকটা ওই রকমই রায় দিলেন। বললেন:

'জায়গাটা ভারি চমৎকার! এত সমৃদ্ধ আর সুন্দর যে কী বলি! যেন ওটা বাচ্চাদের কলোনি গড়ার জন্যেই তৈরি হয়েছিল!'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌নাও সায় দিলেন:

'ভারি মনোরম তালুকটা! সত্যি!'

সকলেই যে এই তালুকটা চেনে এটা আমাদের কাছে তাৎপর্যবহ মনে হল। কাজেই, জায়গাটা অবধারিত ভাবেই বিশেষ করে আমাদের বা গোর্কিপন্থীদের জন্যে তৈরি হয়েছে ভাগ্যের এই বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে মিত্‌কা আর আমি অবশেষে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলুম।

কিন্তু দেখা গেল আমাদের অনেকগুলো প্রত্যাশার মধ্যে মাত্র একটিই পূর্ণ হল। আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যানের মুখখানা সত্যিই প্রীতিপ্রদ বৈপ্লবিক ধাঁচের বলে ঠেকল। তবে এছাড়া, আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম কয়েকটি কথা থেকেই বোঝা গেল ব্যাপারস্যাপার সবকিছু একেবারে অন্যরকম ভাবে ঘটছে।

শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের দেয়া ছাড়পত্রখানা পড়ার পর চেয়ারম্যান-সাহেব বললেন:

'কিন্তু ওখানে তো চাষীদের একটা কমিউন পত্তন হয়েছে! আর, তাছাড়া, এই গোর্কি কলোনি ব্যাপারটা কী?'

বলে সরাসরি মিত্‌কা আর আমার দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তবে বোঝা গেল মিত্‌কাকেই তাঁর পছন্দ হয়েছে বেশি, কারণ ওর সতর্ক কালো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হেসে তিনি শুধোলেন:

'এমনি সব ছেলেপিলেই ওখানে সবকিছু চালাবে বুঝি?'

শুনে মিত্‌কা লাল হয়ে উঠল। তারপর বলে বসল দুমদাম করে:

'তা, আমাদের ছেলেরা কী দোষটা করল? আপনের মুজিকদের থেকে আমাদের ছেলেরা কাজকম্মো খারাপ চালাবে না নিশ্চয়!'

কথাগুলো বলতে-বলতে আরও লাল হয়ে উঠল মিত্‌কা, ওদিকে চেয়ারম্যানের মুখের হাসিটাও কান ছুঁই-ছুঁই করতে লাগল।

তিনি বললেন, 'অ! আমাদের চাষীদের তোমরা ওই নাম দিয়েছ বুঝি ·· ওই 'মুজিক'?' তারপর গোপন কথা বলার মতো করে বলতে লাগলেন, 'তা যা বলেছ, কথাটা সত্যি। কাজকর্ম ওরা সত্যিই খারাপভাবে চালাচ্ছে। তবে কী জানো, ওখানে জমি আছে দেড় হাজার হেক্টর, তাই ব্যাপারটার ফয়সলা করা আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির এক্তিয়ারের বাইরে। এর ফয়সলা করতে হবে তোমাদের কৃষি-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের সঙ্গে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চোখ কুঁচকে চেয়ারম্যানের দিকে তাকাল মিত্‌কা। বলল:

'কী বললেন? আপনের... কী যেন কথাটা — এক্তিয়ারের — বাইরে? তার মানে?'

'দেখেছ, তুমি আমার কথা যত না বুঝছ, তার থেকে তোমার কথা আমি বুঝেছি বেশি! ঠিক আছে, এক্তিয়ার বলতে কী বোঝায় তোমার ডিরেক্টরই তা বুঝিয়ে দেবেন'খন। এখন, তোমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি তা-ই বল। তা, তোমাদের একখান মোটরগাড়ি দেব না-হয়, তোমরা গিয়ে ঘুরেঘেরে নিজের চক্ষে সবকিছু দেখে এস একবার। ইচ্ছে করলে সরেজমিনে কমিউনের সাথে কথাবার্তাও কইতে পার, বলা তো যায় না হয়তো ওদের সাথে কোনো বোঝাপড়ায় আসলেও আসতে পার। তবে কিনা ব্যাপারটার চরম নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে খার্‌কভে গিয়ে, কৃষি-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের দপ্তরে।'

হাসতে-হাসতে চেয়ারম্যান-সাহেব মিত্‌কার সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর আমায় বললেন:

'আপনার সব ছোঁড়ারা যদি এর মতন হয়, তাহলে আমি আপনাদের পক্ষে আছি।'

অতঃপর মিত্কা আর আমি গিয়ে পপোভ-তালুক দেখলুম। তালুকটার সৌন্দর্যে যেন নেশা ধরে গেল আমাদের।

প্রসিদ্ধ 'বিপুল তৃণভূমি'র একপ্রান্তে, মনে হয় এককালে যেখানে তারাস বুল্‌বার কুঁড়েঘরখানি ছিল যেন ঠিক সেই জায়গাটিতেই, দ্‌নিপার আর কারা-চেক্‌রাক নদীর সঙ্গমের একটি বাঁকের মুখে স্তেপভূমি থেকে আচমকা উঠে গিয়েছিল লম্বা একসারি পাহাড়। আর কিছুটা দূরে, তাদেরই মধ্যে থেকে তীরের মতো সোজা পথে দৌড়ে নেমে এসেছিল কারা-চেক্‌রাক নদী -- নদী তো নয় যেন খাল। নদীটা তীরের মতো সোজা নেমে এসেছিল দ্‌নিপারের সঙ্গে যুক্ত হতে। আর ওই নদীর খাড়াই পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সেই অলৌকিক ব্যাপারটা। গোলাগুলি ছোড়ার উপযোগী ফোকরওয়ালা উঁচু প্রাকারটার ওধারে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলো প্রাসাদ আর তাদের ছাদের চুড়ো আর গম্বুজগুলো অবিশ্বাস্য এক জটলা পাকিয়ে ছিল গায়ে-গায়ে জড়াজড়ি করে। কিছু-কিছু মিনারের ওপর তখনও পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল বাতাসের গতি-নির্দেশক লোহার ফলা, তবু মুরজাতির (নাকি ওই স্থাপত্যকলা ছিল আরবী? কে জানে!) অবিশ্বাস্য সুন্দর সৃষ্টিকল্পনার সুশোভন বিন্যাসের মর্মন্তুদ বৈপরীত্য হিসেবেই যেন প্রাকারের অন্ধকার ফোকর বা জানলাগুলো তাকিয়ে ছিল কঠিন শূন্যদৃষ্টিতে।

দু-থাক ফোকরওয়ালা হাল্‌কা একটা বুরুজের নিচেকার দেউড়ির মধ্যে দিয়ে আমরা এসে ঢুকলুম প্রকাণ্ড একটা চত্বরে। চত্বরটা বাঁধানো ছিল সারি-সারি চৌকোনা টালি দিয়ে, আর সেই সব টালির ফাঁকে-ফাঁকে গজিয়ে উঠেছিল তুষারে-মজা মোটা-মোটা ইউক্রেনীয় ঘাস। বিষণ্ণ একটা স্পর্ধার ভঙ্গিতে মাথা জাগিয়ে ছিল তারা। গোরু, শুয়োর আর ছাগল চরার স্পষ্ট ছাপ রয়ে গিয়েছিল ঘাসের ওপর। সামনেই যে প্রাসাদটা পেলুম তার মধ্যে ঢুকলুম আমরা। কেবল ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া আর চুনের দুর্গন্ধ ছাড়া বাড়িটাতে আর কিছুই ছিল না, কেবল সদর হলঘরটার মেঝের ওপর শুধু হাত দুটোই নয় পা-বিহীন অবস্থাতেও পড়ে ছিল একটি প্লাস্টারে-তৈরি মিলো-র ভেনাস-মূর্তি। অন্যান্য প্রাসাদগুলোও ছিল একই রকম উঁচু আর সৌষ্ঠবপূর্ণ, আর একই রকম বিপ্লবের ভাঙনের গন্ধে ভরা। বিশেষজ্ঞের কায়দায় এই সবকিছুর ওপর চোখ বুলোতে-বুলোতে আমি মনে-মনে হিসেব কষতে লাগলুম প্রয়োজনীয় মেরামতে খরচ পড়বে কত। সত্যি কথা বলতে কী, দেখলুম আমাদের অবস্থা

হল যাকে বলে 'সাগরে পেতেছি শয্যা গোষ্পদে কী ভয়' — তা-ই। কারণ, দেখা গেল বাড়িগুলোর সব ক'টা দরজা-জানলা তৈরি করা দরকার, মেরামত করা দরকার সব ক'টা মেঝের নকশা-কাটা কাঠের পাটাতন আর দরকার সর্বত্রই দেয়ালে প্লাস্টার লাগানো। আর যাতে আমাদের হাত দেয়ার দরকার নেই তা হল মিলো-র ভাঙা ভেনাস-মূর্তিটি, আর যতসব সিঁড়ি, ঘরের ছাদ আর চুল্লী। কারণ, এই শেষোক্ত বস্তুগুলোই একমাত্র আভাঙা অবস্থায় ছিল।

মিত্‌কা অবশ্য আমার মতো অত গদ্যময় ছিল না। কোনোরকম ভাঙাচোরা বা জীর্ণদশাই ওর নন্দনতাত্ত্বিক উদ্দীপনার উপশম ঘটাতে পারছিল না। যতসব হলঘর, আর দেউড়িতে ঢুকে আর মিনারে উঠে-নেমে, বড়-ছোট যতসব চত্বরে ঘুরতে-ঘুরতে বিহ্বল হয়ে ও বারে বারে বলছিল:

'আ মরি-মরি! দেখেন, একবারটি দেখেন! ভারি চমৎকার কিন্তু, মাইরি! কী অপরূপ জায়গা, আন্তন সেমিওনভিচ! ছোঁড়ারা দেখলি কী খুশিই না হবে! সত্যি, ভারি চমৎকার! আচ্ছা, এখেনে কত ছেলেমেয়ে আঁটতি পারে বলে আপনের ধারণা? এক হাজার?'

আমার হিসেব অনুযায়ী ওখানে আঁটতে পারত আট শো-র মতো ছেলেমেয়ে।

'কিন্তু আমরা কি এত ছেলেমেয়ে সামলাতি পারব? আ — ট শো! তাছাড়া তাদের বেশির ভাগই তো হবে রাস্তা থেকে ধরি আনা ছেলেমেয়ে। এদিকে আমাদের সব কয়টা দলপতি বলে এখন 'রাব্‌ফাক'-এ চলি গেছে...'

অত ছেলেমেয়ে আমরা সত্যিই সামলাতে পারব কিনা তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামানোর সময় ছিল না তখন। সবকিছু দেখতে-দেখতে আমরা এগিয়ে চললুম। প্রাসাদগুলোর পেছনের চত্বরটা ছিল কৃষক-কমিউনের দখলে। দেখলুম তারা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে শোচনীয় রকমে বেসামাল করে তুলেছে। বিশাল আস্তাবলটা দেখা গেল স্তূপাকার ঘোড়ার নাদে ভরা, আর সেই নাদের জঞ্জালের মধ্যেই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বাজে জাতের ঘোড়া। তারা যেমন অবহেলিত তেমনই তাদের না আছে কোনো শোবার বিছানা। ঘোড়াগুলোর হাড়-পাঁজরা বের করা, পাছায় নোংরা মাখামাখি, অনেকগুলোরই গায়ের রোঁয়া খাবলা-খাবলা গেছে উঠে। এছাড়া প্রকান্ড শুয়োরের খোঁয়াড়টার মেঝে আর দেয়াল দেখলুম গর্তে-গর্তে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে আছে, খোঁয়াড়ে শুয়োরের সংখ্যাও খুব কম আর শুয়োরগুলোও নিকৃষ্ট

জাতের। এছাড়া ঠান্ডায়-জমা উঠোনের ঢিবিগুলোর ওপর অবহেলিত ও চরম এলোমেলো অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল যতসব ঘোড়ার গাড়ি, বীজবোনা যন্ত্র, চাকা আর বেশ কিছু বাড়তি যন্ত্রাংশ। আর এই সবকিছুর ওপর যেন চেপে বসে ছিল একপুরু আদিম অনড় নির্জনতা। একমাত্র শুয়োরের খোঁয়াড়েই আমরা একটিমাত্র মানুষের দেখা পেলুম — গাঁট-পাকানো চেহারার ছুঁচলো দাড়িওয়ালা এক বুড়োর। বুড়ো বললে:

'আপনেরা কি আপিসের খোঁজ করতিছেন? তাইলি সামনের ওই কুঁড়েয় চলি যান।'

'আপনেদের শুয়োরগুলা রেখেছেন কোথায়?' মিত্‌কা শুধোল।

'কী বললে?.. ও.. শুয়র কনে?'

পা বদলে, মোমের মতো স্বচ্ছ আঙুলে গোঁফ চুমরে নিয়ে বুড়ো একবার শুয়োরের ফাঁকা খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল। স্পষ্ট বোঝা গেল মিত্‌কার প্রশ্নে বুড়ো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। তবু ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এইভাবে তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে বললে:

'ওহ্... বদমাশগুলান অদেরে খায়্যে ফেলেছে, বেজম্মাগুলান বেবাক খায়ে সেরেছে অদেরে।'

'কারা?'

'কারা আবার? আমাদের নিজিদের লোকজন... এই এখেনকার কমিউন.

'তা, ঠাকুন্দা, আপনে কি কমিউনের মধ্যে নাই?'

'হে-হে, বাপু রে, আমি কমিউনে আছি 'হংসমাধ্যি বকো যথা' হয়ে, বোঝলে! গলা ফাঁড়্যে চিল্লুতে পারে যারা তারাই এখন গণ্যিমান্যি, বোঝলে! আর অরা বুড়া মান্‌ষিরে কোনো জবর পদে বহাল করে না, বেজম্মাগুলান কোনো পদই দেয় না বুড়াদেরে! তা, তমরা কে বট বাপু?'

'আমরা বিশেষ একটা কাজে এসেছি।'

'অ, তাই কও! কাজে এস্যেছ!.. তা, কাজে এস্যেছ যখন তখন সোজা কুঁড়্যের ভিত্‌রি চলি যাও। অরা ওখেনে এট্টা মিটিন করত্যেছে... মিটিন, বোঝলে কিনা... অরা সব্বদাই মিটিন করে, কুত্তির বাচ্চাগুলান... তারপর, বোঝলে কিনা...'

মনে হল বুড়ো এতক্ষণে প্রাণ খুলে খানিক আলাপ করতে চায়। কিন্তু ওর কথা শোনার মতো সময় ছিল না আমাদের।

বুড়ো যেমন বলেছিল ঠিক তাই -- ভিড়ে-ঠাসা অফিস-ঘরে প্রাক্তন জমিদারের দ্রুত-ধসে-যাওয়া চেয়ারগুলোয় গদিয়ান হয়ে কমিউনের সদস্যরা মিটিঙ করছিল তখন। ঘরে যে কতজন লোক ছিল জমাট তামাকের দলার ধোঁয়ায় তা ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছিল না, তবে গোলমাল যা হচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল জনা বিশেকের কম লোক হবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কোনোদিনই জানতে পারি নি সেদিন ওদের আলোচ্য বিষয় কী ছিল, কারণ আমরা ঘরে ঢোকামাত্র কালো দাড়ি আর গোল-গোল, মেয়েদের মতো ভাবাবেগে-ভরা চোখ নিয়ে কোঁকড়া-চুলো একজন লোক জিজ্ঞাসা করল আমরা কী চাই।

অতঃপর শুরু হল কথাবার্তা -- আর কখনও তা হয়ে উঠতে লাগল মাপাজোখা আনুষ্ঠানিক ধাঁচের আবার কখনও-বা বিদ্বেষে ভরা, প্রবল শত্রুভাবাপন্ন। অবশেষে প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে আলোচনাটা নিছক কাজের কথায় পর্যবসিত হল।

দেখলুম, আমার ধারণা ছিল ভুল। কমিউনটা ছিল সাংঘাতিক অসুস্থ, মরো-মরো, অথচ কিছুতেই পটল তুলতে রাজি নয়। ফলে তাদের কবর খোঁড়ার অনাহূত লোক বলে আমাদের চিনতে পেরে মারাত্মক চটে উঠল তারা আর ক্ষীয়মাণ শক্তি প্রাণপণে সংহত করে প্রবল জীবন-তৃষ্ণা প্রকাশ করে বসল।

একটা ব্যাপার ছিল পরিষ্কার: দেড় হাজার হেক্টর কৃষিজমি কমিউনটির পক্ষে ছিল অতিরিক্ত। আর এই বাড়তি ঐশ্বর্যই হয়ে উঠেছিল কমিউনের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কাজেই জমিটা ভাগাভাগি করে নেয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বোঝাপড়ায় আসতে আমাদের কোনোই অসুবিধে হল না। মিলো-র ভেনাস-মূর্তিসহ প্রাসাদগুলো, খুপরি-কাটা প্রাকার আর বুরুজগুলো আমাদের দিয়ে দিতে কমিউন ছিল আরও বেশি রাজি -- যাকে বলে একপায়ে খাড়া। কিন্তু যখন গোলাবাড়ির উঠোন নিয়ে প্রশ্ন উঠল তখন কমিউনের সদস্য আর আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য প্রবল হয়ে উঠল। মিত্‌কা তখন যুক্তিতর্কের রাস্তা ধরে চলতে না-পেরে এমন কি ব্যক্তিগত আক্রমণ পর্যন্ত শুরু করে দিল। বলল:

'আপনেদের বীট-ফসল এখনও পর্যন্ত মাঠে পড়ে আছে কেন?'

তাতে চেয়ারম্যান জবাব দিলেন:

'আমার বীট নিয়ি প্রেশ্ন করার অধিকার তমার মতন বাচ্চারে কে দিল?'

অবশেষে অনেক রাত্রে গোলাবাড়ির উঠোন নিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হল।

'কী জন্যি মিথ্যে-মিথ্যে মোটামাথার মতন তক্ক করতেছি আমরা?' মিত্কা বলল। 'গোলাবাড়ির উঠান তো দেয়াল দিয়ি ভাগ করে নিলিই চলে।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার ইতি টানলুম আমরা ওইখানেই।

কেমনভাবে যে গোর্কি কলোনিতে ফিরেছিলুম সেদিন তা আমার মনে নেই, তবে মনে হয়েছিল যেন একজোড়া পাখায় ভর দিয়েই ফিরেছিলুম। কলোনির সাধারণ সভায় আমাদের এ-সম্পর্কিত বর্ণনা সকলে তুমুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে শুনল। তারপর মিত্কা আর আমাকে নিয়ে লোফালুফি চলল কিছুক্ষণ, ফলে আমার চশমা-জোড়া প্রায় ভাঙতে-ভাঙতে বেঁচে গেল আর মিত্কার নাক না কপাল কী যেন গেল থেঁতলে।

কলোনির পক্ষে সত্যিকার সুখের সময় শুরু হল যেন। পাক্কা তিনটে মাস কলোনি-বাসিন্দারা খালি পরিকল্পনা ভেঁজেই কাটিয়ে দিল। ব্রেগেল ওই সময়ে আবার একবার কলোনিতে এসেছিলেন। ব্যাপারস্যাপার দেখে তিনি তো একদিন আমায় তিরস্কারই করে বসলেন। বললেন:

'কী ধরনের মানুষ আপনি তৈরি করছেন মাকারেংকো, বলুন তো? যত সব স্বপ্নবিলাসী?'

কিন্তু ছেলেমেয়েরা যদি স্বপ্নবিলাসী হয়েই থাকে তো কী করা যায়? 'স্বপ্ন' কথাটা যে আমার খুব প্রিয় শব্দ তা নয়। শব্দটায় কেমন যেন মেয়েলি হৃদয়তাপের ভাপের ছোঁয়া পাওয়া যায়, কিংবা হয়তো তার চেয়েও খারাপ কিছুর। কিন্তু তবু, স্বপ্ন তো নানারকমেরই হতে পারে। তাছাড়া শাদা ঘোড়ায়-চড়া নাইটের স্বপ্ন এক জিনিস, আর শিশু-কলোনিতে আট শো ছেলেমেয়ে মানুষ করার স্বপ্ন আরেক জিনিস। ব্যারাকবাড়িতে গাদাগাদি করে থাকার সময় আমরা কি উঁচু ছাদওয়ালা, আলো-হাওয়ায়-ভরা ঘরে থাকার স্বপ্ন দেখি নি? পায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়িয়ে থাকার সময়ে আমরাই তো স্বপ্ন দেখেছি সত্যিকার জুতো পায়ে দেয়ার। আমরা স্বপ্ন দেখেছি 'রাবফাক'-এ ছাত্র পাঠানোর, কম্সমোল সংগঠন গড়ার, মন্দা ঘোড়া 'মলদিয়েত্স'কে পাবার, সিমেন্থাল গোরুর একটা পাল পোষবার। আমি যখন ব্রিটিশ জাতের একজোড়া শুয়োরছানাকে একদিন বস্তাবন্দী করে নিয়ে এসেছিলুম, তখন এমনই একজন

স্বপ্নবিলাসী, আলুথালু চুলে-ভরা মাথা ভান্‌কা শেলাপুতিন হাইবেঞ্চের ওপর নিজের দুই হাতের ভর দিয়ে বসে আর পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে বলেছিল:

'এখন আমাদের মাত্তর দুইডা শুয়রছ্যানা। কিন্তু শিগ্‌গিরি আরও অনেকগুলান বাড়ব্যে-নে। আর তা থেক্যে বাড়ব্যে আরও অনেক... আর পাঁচ বছরির মধ্যি আমাদের হবে-নে এক শতডা শুয়র। হো-হো! হা-হা! এই তোস্‌কা, শুন্‌লি কথাডা? — এক শতডা শুয়র, বুঝলি!'

আর আমার অফিস-ঘরে বসে সে-সময়ে যে কাজের কথা চলছিল তা ডুবে গিয়েছিল এই স্বপ্নবিলাসীটির আর তোস্‌কার মিলিত হাসির আচমকা আওয়াজে। আর পরে আমাদের পোষা শুয়োরের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তিন শো-রও ওপরে, কিন্তু তখন কেউ শেলাপুতিনের ওই স্বপ্নের কথা মনে রাখে নি।

সম্ভবত আমাদের আর বুর্জোয়াদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য ঠিক এই ব্যাপারটিতেই নিহিত যে আমাদের সমাজে শিশুদের যৌথ জীবনচর্যা বিকশিত হতে আর ক্রমশ উন্নতি লাভ করতে বাধ্য, তা বাধ্য অপেক্ষাকৃত সুখী ভবিষ্যতের কল্পনা করতে, আনন্দময় সমবেত প্রয়াস আর প্রাণোচ্ছল অবিচল স্বপ্নদেখার মধ্যে দিয়ে তার প্রতি অভিলাষী হয়ে উঠতে। হয়তো এরই মধ্যে নিহিত সত্যিকার শিক্ষা-বিজ্ঞানগত দ্বান্দ্বিকতা।

কাজেই কলোনি-বাসিন্দাদের স্বপ্নদেখা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টাই করলুম না আমি, বরং ওদের সঙ্গে কিংবা হয়তো ওদের চেয়ে আরও একটু উঁচু আকাশে ডানায় ভর দিলুম। তবু ওই দিনগুলো ছিল কলোনির পক্ষে বড়ই সুখকর, আমার সব বন্ধু এখনও পর্যন্ত সানন্দে ওই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে থাকে। আলেক্সেই মাক্সিমভিচকে যখন আমাদের ব্যাপারস্যাপারের কথা সবিস্তারে লিখে জানালুম তখন স্বয়ং তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলে স্বপ্নদেখা শুরু করে দিলেন।

কলোনিতে খুব অল্প কিছু লোক ছিল তখন যারা এই সম্ভাবনায় খুশি হয় নি ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নি। কালিনা ইভানভিচ ছিল এদের একজন। ওর মনটা ছিল কচি, কিন্তু বোঝা গেল স্বপ্ন দেখার পক্ষে শুধু মনটাই যথেষ্ট নয়। নিজের কথা বলতে গিয়ে কালিনা ইভানভিচ মন্তব্য করল:

'ভালোজাতের ঘোড়া মোটরগাড়ি দ্যাখলে কেমনধারা ডরায়, দ্যাখছ নি?

এয়ার কারণ, অপদাখ্খটা বাঁইচবার চায়, বোঝলা-নি! কিন্তু বাউত্যা ঘোড়া কিছুতিই ডরায় না, মোটরগাড়িরে তো নয়ই, এমন কি খোদ শয়তানরেও না। কারণ রুশীগো ভাষায়, অপদাখ্খটা মকাইদানা পাউক আর ময়দাই পাউক তাইতে তার কিছু আইসে-যায় না...'

আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে কালিনা ইভানভিচকে রাজি করাতে প্রয়াস পেলুম আমি। ছেলেরাও অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু সে অটল হয়ে রইল। বলল:

'আমি যে আর কোনো কিছুরি ডরাই তা না, তয় আমার মতন একটা অপদাখ্খরে সাথে লইয়া তোমাগো কামটা কী? তোমাগো সাথে আমি যে কিছুটা পথ গেছি এই তো যথেষ্ট। এখন আমারে ছাড়ান দ্যাও। আমি এখন পেন্সন লইয়া ঘরে গিয়া বসুম। সোভিয়েত সরকার আমাগো মতন বুড়ামানুষির প্রেতি বড়ই সদয়।'

ওসিপভ-পরিবারও জোর গলায় জানিয়ে দিলেন যে কলোনির পিছু-পিছু তাঁরা আর যাচ্ছেন না। জানিয়ে দিলেন যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তাঁদের, ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ভাগ আর তাঁরা নিতে চান না।

নাতালিয়া মার্কভ্না বললেন, 'আমরা হলাম গিয়ে সাধারণ ছা-পোষা মানুষ। আমরা বুঝি না, আট শো লোক নিয়ে আপনি কী করতে চান। সত্যি, আন্তন সেমিওনভিচ, এই কঠিন কাজ হাতে নিলে আপনাকে পস্তাতে হবে কিন্তু।'

জবাবে এই ছত্রটি আউড়ে দিলুম আমি: 'বীরের যে-পাগ্‌লামি তারই গান গাই!'

উদ্ধৃতিটি যে গোর্কি'র রচনা থেকে তা চিনতে পেরে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ছেলেরা। কিন্তু ওসিপভরা অত সহজে অপ্রস্তুত হবার পাত্র ছিলেন না।

সিলান্তি অবশ্য সান্ত্বনা দিয়ে আমায় বললে:

'অরা পিছনে পড়ো থাকুক ক্যানে! সক্কলেরে তুমি, যারে কয়, ঘোড়দৌড়ের রথে জুত্‌তি চাও, আন্তন সেমিওনভিচ। গোরুরে রথে জুত্‌লি কাম চলব্যে না, তবু তারে জুত্‌তি চাও। ব্যাপারডা হল্য গে এই।'

'কিন্তু তুমি যাবে তো, সিলান্তি সেমিওনভিচ?'

'আমি? কী করব্য?'

'ঘোড়দৌড়ের রথে তুমি তো যাবে, না কী?'

'আমারে তুমি যেখেনে খুশি চালাতি পার। আমারে জিন পরায়্যে বুদিয়োনিরে চাপাতি পার পিঠের পরে। বোঝলে, ওই শোরগুলান আমারে — যারে কয় — ভারবওয়া জন্তু বানায়্যে ছাড়্যেল। অরা — শোরগুলান বোঝাতি পারে নাই যে আমি রীতিমতন এট্টা লড়ুয়্যে ঘোড়া।'

মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে মাটিতে পা ঠুকল সিলান্তি, তারপর কিছুটা টেনে-টেনে বলল:

'ব্যাপারডা হল্য গে এই, বোঝলে!'

প্রায় সব ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সেই সঙ্গে সিলান্তি, কোজির, এলিসভ, কামার গদানভিচ ও সব ক'জন ধোপানী, রাঁধুনি, এমন কি ময়দা-কলের শ্রমিকরা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হওয়ায় ঠাঁইনড়া হওয়ার এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে বিশেষ করে অত নিরাপদ ও শাদাসিধে বলে ঠেকছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ওদিকে — খার্‌কভে ব্যাপারস্যাপার খুবই খারাপভাবে এগোচ্ছিল। প্রায়ই আমাকে যেতে হচ্ছিল সেখানে। শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের প্রতিটি লোক অবশ্য আমাদের সমর্থন করছিলেন। এমন কি ব্রেগেল পর্যন্ত আমাদের স্বপ্নবিলাসীদের দলে ভিড়ে গেলেন, যদিও তখনও তিনি আমাকে 'জাপরোজিয়ের ডন কিয়োটে' বলে ডাকতে কসুর করছিলেন না।

কৃষি-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের লোকজন যদিও আমাদের দেখলে ঠোঁট কোঁচকাচ্ছিল আর অবজ্ঞাভরে এমন ভান করছিল যেন আমাদের নামই মনে থাকছে না তাদের (যেমন, তারা কখনও আমাদের ডাকত গোর্কি কলোনি বলে, কখনও করলেঙ্কো কলোনি বলে, আবার কখনও-বা শেভচেঙ্কো কলোনি নাম ধরে), তবু শেষপর্যন্ত তারাও হার স্বীকার করলে এই বলে যে: 'ঠিক আছে, যদি চান তাইলি আট শো দেসিয়াতিনা কৃষিজমি আর পপোভ-তালুক নিতি পারেন — কেবল আমাদেরে শান্তিতে থাকতি দ্যান দেখি।'

কিন্তু এরপর শিগ্‌গিরই বোঝা গেল যে আমাদের আসল শত্রুরা লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের মুখোমুখি নেই, তারা আছে পথের ধারে ঝোপে-ঝাড়ে ওত পেতে বসে। আর আমি কিনা বোকার মতো হেল্‌মেট ছাড়াই খালি মাথায় তাদের মোকাবিলা করতে গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম এটা হতে যাচ্ছে আমাদের চরম বিজয়ের মোক্ষম আঘাত — কামারের এক-ঘা — যার পরেই

আমরা কিনা জয়সূচক বিউগ্‌ল বাজিয়ে দিতে পারব। কিন্তু যখন খাটো কুর্তা-পরনে বেঁটেখাটো একজন লোক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমার আক্রমণের মোকাবিলা করতে এসে অল্প কয়েকটা মাত্র কথা বলল, তখন পুরো পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হল আমাকে। তখন অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে পতাকা ফেলে দিয়ে, জয়গর্বে অগ্রসর কলোনি-বাসিন্দাদের সারবন্দী গোটা বাহিনীকে পেছনে ঠেলে হটিয়ে দিতে হল আমায়।

লোকটির কথাগুলো ছিল এইরকম:

'একটা প্রাসাদ যা কেউ চায় না তার মেরামতির জন্যে আপনাকে তিরিশ হাজার রুব্‌ল বরাদ্দ করার মতো এমন একটা বড় রকমের ঝুঁকি অর্থ-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েত নিতে পারে না। জানেন, আপনাদের নিজেদের শিশু-সদনগুলোই এখন ভেঙে পড়ছে।'

'কিন্তু এই টাকাটা তো শুধু মেরামতের জন্যে নয়। এই হিসেবের মধ্যে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির দাম আর জায়গা-বদল বাবদ খরচ-খরচাও ধরা হয়েছে যে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওসব আমাদের ভালোই জানা আছে! আট শো দেসিয়াতিনা জমি, আট শো বেওয়ারিস ছেলেপিলে, আট শো গোরু, এই তো? তবে কী জানেন, এ-ধরনের জুয়োখেলার দিন চলে গেছে। শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের কাজে আমরা এ-পর্যন্ত লক্ষ-লক্ষ রুব্‌ল মঞ্জুর করে আসছি, কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয় নি। ছেলেপিলেরা সবকিছু চুরি করেছে, ভাঙচুর করেছে সবকিছু, আর তারপর সব ছেড়েছুড়ে পালিয়েছে।'

এই বলে আমাদের বাঁচার সুন্দর স্বপ্নকে অপ্রত্যাশিতভাবে মাটিতে আছড়ে ফেলে দু'পায়ে দলে চলে গেল সেই ছোটখাট চেহারার লোকটি। না চোখের জল, না এই আশ্বাস যে এটা স্বয়ং গোর্কিরও স্বপ্ন, কোনোকিছুই কোনো কাজে এল না। এইভাবে মৃত্যু ঘটল স্বপ্নের।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে কথাটা মনে পড়ায় শিউরে উঠেছিলুম যে আমাদের ইশ্‌কুলের পাঠসূচিতে 'জাপরোজিয়ে অঞ্চলে আমাদের কৃষিখামার' বিষয়টা ইতিমধ্যেই জুড়ে দেয়া হয়েছিল। শেরে তার আগে বার দুই পপোভ-তালুক ঘুরে এসেছিলেন। আর ঘুরে আসার পর আমাদের কৃষি-সংক্রান্ত যে-ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছকে ফেলেছিলেন তা কলোনি-বাসিন্দাদের তিনি

জানিয়েও দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল চুনিপান্না আর হীরে দিয়ে গাঁথা — ট্রাক্টরবহর, গোরুর পাল, ভেড়ার পাল, লক্ষ-লক্ষ হাঁস-মুরগি, ইংলণ্ডে মাখন আর ডিমের চালান পাঠানো, ডিম-ফোটানোর যন্ত্র, দুধ থেকে মাখন তোলার যন্ত্র আর ফলবাগানসমেত তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল ঝকঝকে ঝলমলে, উজ্জ্বল দ্যুতিময়।

মনে পড়ছিল মাত্র এক সপ্তাহ আগে খার্কভ থেকে ফেরার পথে রাস্তায় একদিন আমাকে ছেঁকে ধরেছিল উত্তেজিত কাচ্চাবাচ্চা কলোনি-বাসিন্দারা। তারপর গাড়ি থেকে আমাকে প্রায় জোর করে টেনে নামিয়ে চিৎকার করে বলেছিল:

'আন্তন সেমিওনভিচ! আন্তন সেমিওনভিচ! আমাদের 'প্রভাতী' বাচ্চা দিয়েছে। দেখে যান! দেখে যান! এখুনি আসেন-না একবার!..'

তারা আমাকে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়েছিল আস্তাবলে আর সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সোনালিরঙের নবজাত ঘোড়ার বাচ্চাটার চারপাশে। তখনও পর্যন্ত ভিজে-ভিজে বাচ্চাটা শিউরে-শিউরে উঠছিল, আর তাই দেখে নিঃশব্দে হাসছিল ওরা আর তারই মধ্যে কে যেন আবেগভরে গুনগুনিয়ে বলে উঠেছিল:

'আমরা এটার নাম দিয়েছি 'জাপরোজিয়েত্স'...'

হায়রে, অবোধ বাচ্চারা! 'বিপুল তৃণভূমি'র ওপর লাঙলের পিছুপিছু ধাওয়া করা, পরীর প্রাসাদে বাস করা, মুর-স্থাপত্যের নিদর্শন মিনারগুলোর ওপরে উঠে বিউগ্ল বাজানো — এ-সব আর তোদের কপালে জুটল না! বৃথাই তোরা সোনালি বাচ্চাঘোড়াটার নাম দিয়েছিলি 'জাপরোজিয়েত্স'!

১৭

দর-যাচাইয়ের পালা

অর্থ-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের লোকটি যে খাঁড়ার ঘা দিয়েছিল তাতেই আমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলুম। এতে কলোনি-বাসিন্দারা দারুণ আঘাত পেল মনে, আমাদের শত্রুরা অবজ্ঞাভরে অট্টহাসি হাসতে লাগল এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি গুরুতর রকম বিচলিত হয়ে পড়লুম। তবু আমাদের মধ্যে কেউই কলমাকের ধারে রয়ে যাওয়ার কথাটা এরপর আর চিন্তাই করতে

পারছিল না। এমন কি শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতও কেমন করে যেন আমাদের এই অনমনীয় সিদ্ধান্তের কথা টের পেয়ে গিয়েছিল, আর ভালোমানুষের মতো সমস্যাটার মীমাংসার চেষ্টা করছিল কেবল একটামাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই — তা হল, আমাদের এছাড়া আর কোন জায়গায় পাঠানো যায়!

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি আর মার্চ এই মাস দুটোয় সময়টা অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। জাপরোজিয়ে-সংক্রান্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টা উল্লসিত আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ স্ফুলিঙ্গ নিবিয়ে দিলেও আমাদের যৌথ সমাজ আশার কিছুটা ভাঙাচোরা টুকরোটাকরা তখনও পর্যন্ত একগুঁয়ের মতো আঁকড়ে ছিল। এমন একটা সপ্তাহও যায় নি তখন যখন কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভায় স্থানান্তরণের কোনো-না-কোনো প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা না হয়েছে। ইউক্রেনের উদার, খোলামেলা স্তেপভূমিতে তখনও পর্যন্ত এমন বহু এলাকা ছিল যেখানে অঢেল জমি জায়গা আবাদ না-করা অবস্থায় পড়ে ছিল কিংবা আবাদের কাজ খারাপভাবে চলছিল। ওই সব জমির কোনো একটার দখল নেয়ার জন্যে আমাদের পরামর্শ দিচ্ছিলেন একের-পর-এক শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েত ও কম্‌সমোলের নানা সংগঠনভুক্ত আমাদের বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দারা আর কৃষি-সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত আমাদের স্বল্প-পরিচিত শুভার্থীরা। ওই সময়টায় শেরে, ছেলেরা আর আমি বহু পথ, বহু বড়রাস্তাই দৌড়োদৌড়ি করে বেড়িয়েছি হয় ট্রেনে, নয় মোটরে আর নয়তো 'মলাদিয়েত্‌স' আর স্থানীয় নানা ধরনের তেজী বা মরকুটে ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে চেপে।

কিন্তু আমাদের জমি-সন্ধানীরা একরাশ ক্লান্তি ছাড়া আর যে বিশেষ কিছুর সন্ধান নিয়ে ফিরে আসছিল তা নয়। সাধারণ সভাগুলোতে কলোনি-বাসিন্দারা সন্ধানী-দলের বক্তব্য শুনত নিরাসক্ত, কেজো লোকের মতো মুখ করে, তারপর সভা ভাঙলে চলে যেত যে-যার কাজে। কেবল সভা ভাঙার আগে বক্তার উদ্দেশে ছুড়ে মারত প্রথম যে-গোলমেলে প্রশ্নটি মাথায় আসত সেইটিই। যেমন:

'ওখেনে কতজনের মতন জায়গা হতি পারে? এক শো বিশ? উঁহু, ওতে চলবে না!'

কিংবা, 'কোন শহর বললেন? পিরিয়াতিন? খ্যাপা নাকি!'

আর তাদের বক্তব্যের এই প্রতিক্রিয়া দেখে বক্তারা নিজেরাই উঠত খুশি

হয়ে। কারণ, পাছে তাদের প্রস্তাব সাধারণ সভা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে সেই ভয়ে তারা যতটা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত এমন আর কিছুতে হোত না।

এইভাবে একের-পর-এক আমাদের চোখের সামনে লোভানি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ভাল্‌কির স্বারিত্‌স্কি তালুক, পিরিয়াতিনের মঠ, লুব্‌নি মঠ, দিকান্‌কায় কচুবেই-বংশীয় রাজকুমারদের প্রাসাদ এবং একেবারেই কোনো কাজের নয় অন্যান্য এমন সব জায়গা।

এছাড়া আরও কত জায়গার কথা যে আমাদের বলা হল আর অনুসন্ধান করে দেখারও অযোগ্য বিবেচনা করে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নাকচ করে দিলুম তার ইয়ত্তা নেই। এইরকম একটা জায়গা ছিল কুরিয়াজ। খার্‌কভের কাছে ওই জায়গাটায় ছিল একটা বাচ্চাদের কলোনি। শোনা গেল, কলোনিটার বাসিন্দা চার শো ছেলেমেয়ে নাকি সাংঘাতিক রকম দুর্নীতিপরায়ণ। দুর্নীতিপরায়ণ বাচ্চাদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবতেই আমাদের এমন গায়ে জ্বর এল যে কুরিয়াজ-সম্পর্কিত চিন্তা আমাদের মনে অল্প দু-একটা ছোট্ট ঠুনকো বুজকুড়ি তুলল মাত্র, তাও আবার ভুড়ভুড় করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গেল ফেটে।

একবার খার্‌কভে আমার গত্‌বাঁধা দর্শনদানের একটা সময়ে শিশু-সহায়তা কমিটির একটা সভায় হঠাৎই যোগ দিতে হল আমায়। ওই সভায় কমিটির কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কুরিয়াজ কলোনির অবস্থা নিয়ে আলোচনা উঠল। জনশিক্ষা-দপ্তরের এক ইন্‌স্পেক্টর ইউরিয়েভ সেদিন কলোনিটির অবস্থা সম্পর্কে চাপা একটা তিক্ততা নিয়ে রিপোর্ট পেশ করছিলেন। তাঁর ভাষা ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত ও সংযত ধরনই ফাঁস করে দিচ্ছিল যে কলোনিটার অবস্থা কতখানি এলোমেলো, গোলমেলে আর ভীতিপ্রদ। শ্রোতাদের কাছে চল্লিশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আর শ-চারেক রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েসহ কুরিয়াজ কলোনির কাহিনী ঠেকছিল যেন নোংরা-মন এক দুর্বৃত্ত, মানবদ্বেষী ও বিশ্বনিন্দকের বানানো সন্দেহজনক গালগল্পের তালগোল-পাকানো একটা পিণ্ডের মতো।

গল্পটা শুনতে-শুনতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল টেবিলে ঘুসি মেরে চিৎকার করে বলি:

'এ হতেই পারে না! এটা নিছকই বানানো গালগপ্পো!'

অথচ ইউরিয়েভকে রীতিমতো নির্ভরযোগ্য লোক বলেই মনে হচ্ছিল, আর

তাঁর পরিশীলিত গাম্ভীর্যের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছিল শিক্ষা-বিজ্ঞানীর মনের গভীরে প্রোথিত বিষণ্ণতা, যে-বিষণ্ণতা আমার খুব ভালো করেই জানা। সভায় আমার উপস্থিতি দেখে ইউরিয়েভ সম্ভবত লজ্জা পাচ্ছিলেন, থেকে-থেকে এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন তিনি যে মনে হচ্ছিল তাঁর নিজের পোশাক পরায় কোনো একটা খুঁত ঘটেছে বলে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে। সভার শেষে আমার কাছে এসে তিনি খোলাখুলি বললেন:

'সত্যি, এই জঘন্য ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সামনে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। লোকে বলে, আপনার ওখানে খাবার সময় কোনো কলোনি-বাসিন্দা মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি করে এলেও তাকে নাকি আপনি গ্রেপ্তার করে সারাদিন শুধু রুটি আর জলপথ্যের ব্যবস্থা করেন, আর শাস্তি পেয়ে সে নাকি হেসে বলে 'ঠিক হ্যয়!''

'ব্যাপারটা ঠিক অতটা ওরকম নয়। আমি যদি সত্যিই অমন একটা সফল পদ্ধতি প্রয়োগ করতুম তাহলে দেখা যেত আজ আপনি যে-কায়দায় রিপোর্ট দিচ্ছিলেন সেই একই কায়দায় তখন গোর্কি কলোনি সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করছেন।'

ইউরিয়েভ আর আমি সেদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আর তর্কে মেতে উঠলুম। উনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন একসঙ্গে খাওয়ার, আর খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ একসময়ে বললেন:

'বুঝলেন? আপনিই কুরিয়াজ কলোনির ভার নিন না কেন?'

'কিসের জন্যে? তাছাড়া কলোনিটা তো এমনিতেই ছেলেমেয়েতে ভর্তি।'

'ভর্তি, তাই কী? আপনাদের জন্যে এক শো বিশটা সিট আমরা অনায়াসেই খালাস করিয়ে দিতে পারি।'

'কিন্তু প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। বড্ড নোংরা কাজ! তাছাড়া দেখা যাবে আপনারাই আমায় কাজ করতে দিচ্ছেন না...'

'নিশ্চয়ই কাজ করতে দেব আপনাকে! আমাদের আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনাকে ফাঁকা চেক সই করে দেব, তাহলে হবে তো? আপনার যা খুশি করবেন। কুরিয়াজ এখন জঘন্য অবস্থায় আছে। রাজধানীর ঠিক পাশেই এরকম একটা ডাকাতের আস্তানা পোষা কী ভয়াবহ ব্যাপার চিন্তা করুন একবার! আমার রিপোর্ট তো আপনি শুনেইছেন। বড়রাস্তায় রাহাজানি করছে

ছেলেপিলেরা। চার মাসে আঠারো হাজার রুবল দামের সম্পত্তি কলোনি থেকেই উধাও হয়ে গেছে!'

'কিন্তু আমায় ভার নিতে হলে গোটা শিক্ষক-পরিচালক দলকে বরখাস্ত করতে হবে!'

'না-না, কী বলছেন — ওঁদের মধ্যে কিছু চমৎকার মানুষ আছেন ওখানে।'

'এ-সমস্ত ক্ষেত্রে আমি কিন্তু সাধারণত আগাগোড়া নির্বীজনের সুপারিশ করে থাকি।'

'ঠিক আছে — তাহলে সবাইকে বরখাস্ত করব! বরখাস্তই করব!..'

'না-না! আমরা কুরিয়াজে যেতে চাই না।'

'কিন্তু আপনি তো জায়গাটা এখনও চোখেই দেখেন নি? দেখেছেন কি?'

'না, দেখি নি।'

'শুনুন, বলি! আসচে কাল পর্যন্ত এখানে থেকে যান আপনি। খালাবুদাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন কাল একবার জায়গাটা দেখেই আসি।'

রাজি হলুম। পরদিন আমরা তিনজনে মোটরে করে কুরিয়াজ গেলুম। আমি যে আমার কলোনির জন্যে একটা কবরখানা বাছতে চলেছি ওখানে যাওয়ার সময়ে এ-সম্পর্কে মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও উদ্রেক হয় নি।

শিশু-সহায়তা কমিটির চেয়ারম্যান সিদর কার্পভিচ খালাবুদা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। বিবেকের অনুশাসন মেনেই নিজের দপ্তর চালাচ্ছিলেন তিনি। ওই সময়ে তাঁর এই দপ্তরের অধীন ছিল শোচনীয় অবস্থায় উপনীত আধা-ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু শিশু-সদন আর বাচ্চাদের কলোনি, তাছাড়া কিছু খাবারের দোকান, সিনেমা-হল, বেতের আসবাবের দোকান, প্রমোদ-উদ্যান, লটারি খেলার আর হিসাব-রক্ষকের অফিস। সিদর কার্পভিচ আসলে থিকথিক করছিলেন যতসব নোংরা পোকামাকড়ে আবৃত হয়ে — ব্যাবসাদার, এজেন্ট, জুয়োর টেবিলে পয়সা-সংগ্রাহক, ভণ্ড, দুর্বৃত্ত, জুয়াচোর আর তহবিল তছরুপকারীতে পরিবৃত হয়ে। আর সর্বান্তঃকরণে আমার ইচ্ছে করছিল তাঁকে বেশ বড় দেখে এক-বোতল পোকামারার ওষুধ উপহার দিই। মনে হয় চারিদিক-থেকে-পাওয়া নানারকম পরামর্শ — অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত, মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সবরকম বিচার-বিবেচনার কথা — হাজারো বার শুনতে-শুনতে অনেকদিন থেকেই তাঁর কানে আর নতুন কিছু ঢুকছিল না, এবং কেন যে তাঁর দপ্তরের অধীন কলোনিগুলোতে দারিদ্র্য, পাইকারি হারে

পালানো, চুরি আর গুণ্ডামি লেগেই ছিল তা বুঝে ওঠার সকল আশা যেন তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। যে-সময়ের কথা বলছি ততদিনে তিনি বাস্তবের কাছে নতিস্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন যে প্রতিটি গৃহহারা অনাথ শিশু সাতটি মারাত্মক পাপের সব কটির যোগফলের প্রতিমূর্তিবিশেষ। এবং তাঁর প্রাক্তন আশাবাদের ছিটেফোঁটা ভগ্নাংশ যেটুকু অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল তা হল, অপেক্ষাকৃত সুখী ভবিষ্যৎ আর জোয়ার বীজের সর্বদোষহর গুণাবলী সম্বন্ধে একটা অন্ধ বিশ্বাস।

খালাবুদার এই শেষোক্ত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যটি আমি অবশ্য আবিষ্কার করেছিলুম পরে। কিন্তু সেদিন কুরিয়াজ যাওয়ার পথে মোটরে বসে আমি যখন তাঁর সুভাষিতাবলী শুনছিলুম তখন এ-সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও উদ্রেক হয় নি। তিনি বলছিলেন:

'মানুষির জোয়ার পাওয়া দরকার। যে-পর্যন্ত লোকের কাছি জোয়ার আছে সে-পর্যন্ত তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই। এট্টা বাচ্চার যদি পেটে খাওয়ার রুটি না থাকে তাইলি তারে খামোকা গোগল পড়াতি শিখায়্যে লাভ কী, বলেন? পেরথমে তারে জোয়ার খাতি দ্যান, তারপর তার হাতে একখান বই ধরায়্যে দ্যান-না ক্যানে... এখেনকার এই ডাকাতগুলান, অরা চুরি করতি পারে, কিন্তু জমিনে জোয়ার বুনতি পারে না।'

'খুব খারাপ বুঝি?'

'কে? অরা? একবার অদেরে দেখা উচিত আপনের! সব্বদাই অদের কেউ-না-কেউ আমার কাছে আসতিছে আর বলতিছে: 'সিদর কার্পিভিচ, দয়া করো আমারে পাঁচ রুব্ল দ্যান — বিড়ি ফোঁকার জন্যি পেরানডা আমার বার হয়ি যাতিছে!' তা, পাঁচ রুব্ল দেলাম। অমা, দেখি কি এক হপ্তা বাদে ছোঁড়া ফের এসি হাজির: 'সিদর কার্পিভিচ, পাঁচ রুব্ল দ্যান।' বললাম, 'তা, তরে যে সেদিন পাঁচ রুব্ল দিয়েলাম'। শুন্যে ছোঁড়া বলে কি: 'সে তো সিগ্রেটের জন্যি। এবার ভোদ্কার জন্যি দ্যান ক্যানে...'।'

একঘেয়ে বেলেমাটির রাস্তা ধরে ছ-কিলোমিটারটাক পথ যাবার পর একটা নিচুমতো পাহাড়ে উঠলুম আমরা। তারপর একটা মঠের ভাঙাচোরা, পড়ো-পড়ো একটা গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। দেখা গেল, সদরের গোল উঠোনটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন, অথচ তা সত্ত্বেও কুৎসিতদর্শন, একটা গির্জার বেঢপ একটা স্তূপ। গির্জার পেছনদিকে রয়েছে তিনতলা

শাদামাটা একটা দালান, আর দালানটাকে ঘিরে রয়েছে টানা লম্বা নিচু-নিচু সব বার-বাড়ি। মনে হচ্ছিল, এই শেষের ঘরগুলোর সামনেকার জরাজীর্ণ বারান্দাগুলো যেন ঘরগুলোকে ধসে পড়ার হাত থেকে কোনোরকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। এদের একদিকে অল্প একটু দূরে পাশের খাদের খাড়াই পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল আধাখেঁচড়া-করে-তৈরি দোতলা একটা কাঠের সরাইখানা। এছাড়া উঠোনটার নানা কোণে আর ঘুপচিতে ছড়িয়ে ছিল ছোট-ছোট সব দালান, গুদামঘর, রান্নাঘর আর আজেবাজে, কোনোরকমে ঠেকনো-দেয়া নানারকম কুঠুরি। তার আগের শ-তিনেক বছর ধরে সৃষ্টিছাড়া নানা উপাদানে তৈরি এই সব ঘরদোরের জঞ্জাল জমে উঠেছিল একটু-একটু করে। প্রথমেই যে-জিনিসটা আমার মনোযোগ কাড়ল তা হল সারা কলোনি-জোড়া একটা দুর্গন্ধের অস্তিত্ব। গন্ধটা ছিল যতসব খাটা পায়খানা, বাঁধাকপির স্যুপ, ঘোড়ার নাদ আর... ধূপের একটা জটিল মিশ্র গন্ধ। আমরা যখন পৌঁছলুম তখন গির্জাটা থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছিল, আর গির্জার সিঁড়িতে বসে ছিল কয়েকটি বেখাপ্পা চেহারার শুকিয়ে-যাওয়া বুড়ি। যে-কালে ভিক্ষে দেয়ার মতো কারো-না-কারো দেখা পাওয়া যেত সেই সুদিনের কথা ভেবে ওরা যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তখনও পর্যন্ত কোনো কলোনি-বাসিন্দার টিকিটিরও দেখা মিলছিল না।

নিষ্প্রভ চেহারার জীর্ণ পোশাক-পরা ডিরেক্টর ভদ্রলোকটি কেমন-যেন চিন্তিতভাবে আমাদের 'ফিয়াট' গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন, মাডগার্ডে বার কয়েক চাপড় দিলেন, তারপর কলোনি ঘুরিয়ে দেখাতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। স্পষ্ট বোঝা গেল কলোনির বাহার দেখাতে তিনি যত-না অভ্যস্ত ছিলেন তার চেয়ে বেশি অভ্যস্ত ছিলেন কলোনি নিয়ে সমালোচনা শুনতে। আর তাঁর 'ক্রুশকাঠে চড়ার পথ'ও দেখা গেল ভালোরকমই তৈরি।

কোনো এককালে যেখানে দরজা ছিল কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে ছিল নিছক একটা ফাঁক (এমন কি চৌকাঠের বাজু পর্যন্ত উধাও হয়ে গিয়েছিল) এমন একটা জায়গার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে ডিরেক্টর বললেন, 'এটা হল পয়লা নম্বর যৌথের এজমালি ঘর'। এরপর একই রকম বিনা বাধায় দ্বিতীয় আরেকটা দরজার ফোকর দিয়ে ঢুকে আমরা বাঁয়ের বারান্দায় মোড় নিলুম। বিশ্রী একটা গুমোট ভাব সত্ত্বেও দেখলুম বারান্দাটা বাড়ির বাইরের

মতোই সমান ঠান্ডা। এর প্রমাণ মিলল বারান্দার দেয়াল বরাবর গ‍ুঁড়ো বরফ জমে থাকতে দেখে, আর দেখা গেল বরফের এই গ‍ুঁড়োর ওপর বেশ কিছ‍ুদিন ধরে ধীরেসুস্থে এক পরত ধ‍ুলোও জমেছে।

জিজ্ঞাসা করল‍ুম, 'কোথাওই কোনো দরজা নেই নাকি?..'

হাসতে যে তিনি একেবারে ভুলে যান নি আমার এ-কথায় ডিরেক্টর ভদ্রলোক প্রাণপণে তা প্রমাণ করার চেষ্টা পেলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে চললেন এগিয়ে। ইউরিয়েভ এবার জোরে-জোরে বলে উঠলেন:

'দরজাগ‍ুলো অনেক আগেই প‍ুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এ তো কিছ‍ুই না! মেঝের তক্তাগ‍ুলোকে ভেঙে উপড়ে এখন পোড়ানো চলছে। এছাড়া ছেলেরা মাটির নিচের যতসব ভাঁড়ারের দরজা, এমন কি কিছ‍ু-কিছ‍ু ঘোড়ার গাড়িও, প‍ুড়িয়ে ফেলেছে।'

'কেন? ওরা জ্বালানি কাঠ পায় না?'

'জ্বালানি কাঠ কেন যে পায় না তা ঈশ্বর জানেন! কাঠ কেনার জন্যে এদের টাকা দেয়া হয়।'

নাক ঝেড়ে এবার খালাব‍ুদা বললেন, 'খ‍ুব সম্ভব এরা কাঠ কেনেও। তবে করাত দিয়ি কাঠ চিরতি আর কুড়াল দিয়ি কাটার কণ্ট করতি রাজি হয় না. এদিকে এর্জান্য লোক খাটানোর মতন পয়সাও নাই এয়াদের। কাঠ আছে বৈকি এয়াদের, শোরের বাচ্চাগ‍ুলানের!.. এইসব কলোনির বাচ্চাদেরকে আপনে তো চিনেনই — অরা খোদ ডাকাত, আর কিছ‍ু না!'

অবশেষে আমরা একটা এজমালি শোবার ঘরের সত্যিকার, বন্ধ দরজার ম‍ুখে এসে পেঁৗছল‍ুম। খালাব‍ুদা সজোরে একটা লাথি কষালেন দরজাটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে খ‍ুলে গিয়ে দরজাটা নিচের কব্জায় ভর দিয়ে এমন বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়ল যে একেবারে আমাদের মাথায় পড়ার যোগাড়। হাত দিয়ে দরজাখানা মাথার ওপর ধরে রেখে খালাব‍ুদা হেসে বললেন:

'না-না, অমন কাজ করা চলব্যে না, ব‍ুড়া বজ্জাত! তর রকমসকম আমার জানা আছে!..'

শোবার ঘরখানায় অবশেষে ঢুকল‍ুম আমরা। নোংরা, ভাঙাচোরা খাটে জড়-করা স্তূপাকার এলোমেলো কাটা-কাপড়ের ওপর বসে ছিল নিরাশ্রয় ছেলেপিলেরা — একেবারে খাঁটি রাস্তার নিরাশ্রয় ছেলেপিলে তাদের প‍ূর্ণ মহিমায় বিভূষিত হয়ে। উত্তাপ পাওয়ার আশায় একই ধরনের আরও

কতকগুলো কাটা-কাপড়ের নিচে তারা বসে ছিল গুটিসুটি মেরে। ধসে পড়-পড় একটা চুল্লীর পাশে দুটো ছেলে একখানা তক্তা চেলা করছিল। বোঝা যাচ্ছিল তক্তাখানায় সম্প্রতি হলদে রঙ লাগানো হয়েছিল। ঘরখানার কোণে-কোণে, এমন কি খাটগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে মেঝের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আবর্জনা। বাইরের উঠোনে যেমন ঘরের ভেতরও তেমনই ছেয়ে ছিল একই রকম দুর্গন্ধ, কেবল ঘরে ধুপের গন্ধটা ছিল না এই যা তফাত।

আমাদের গতিবিধি ছেলেরা সবাই চোখ দিয়ে অনুসরণ করছিল, কিন্তু কেউই মাথা ঘোরাচ্ছিল না। লক্ষ্য করে দেখলুম, ছেলেদের সকলেরই বয়স ষোল বছরের ওপর।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'এরাই কি বড় ছেলেরা?'

'হ্যাঁ। এটাই হল এক নম্বর যৌথ — বড় ছেলেদের,' বিনীতভাবে জবাব দিলেন ডিরেক্টর সায়েব।

হঠাৎ ঘরের দূরের একটা কোণ থেকে গম্ভীর একটা গলা ভেসে এল:

'অরা যা কয় মোটেও তা বিশ্বাস করবেন না! বিলকুল ভাঁওতাবাজ অরা সক্কলে!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর একটা কোণ থেকে শ্বাসাঘাতের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না-রেখে নিজের খুশিমতো উচ্চারণে কে একজন বলে উঠল:

'লোকেরে দেখাতি এন্যেছে! মরি-মরি, দেখানোর কী আছেডা এখেনে? অরা যে-সমস্ত চোরাই মাল হাতায়্যেছে সে-সকল আপনেরে দেখায় না ক্যানে?'

এই সব কথাবার্তার দিকে আমরা কিছুমাত্র কান না-দেয়ার চেষ্টা করছিলুম। কেবল ইউরিয়েভ লাল হয়ে উঠে থেকে-থেকে চোরাচোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন।

ফের বারান্দায় বেরিয়ে এলুম আমরা।

'এই দালানে এরকম ছ'টা এজমালি ঘর আছে,' ডিরেক্টর বললেন। 'সেগুলো দেখতে চান?'

বললুম, 'আমাকে বরং ওয়ার্কশপগুলো দেখান একটু।'

হঠাৎ খালাবুদা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন। তারপর কয়েকখানা লেদমেশিন যে কী কৌশলে কিনেছেন তিনি তারই দীর্ঘ বর্ণনার মুখর হয়ে উঠলেন।

ফেব একবার উঠোনে বেরিয়ে এলুম আমরা। হঠাৎ দেখলুম একটি বাচ্চা ছেলে খাটো কোটখানা বুকের ওপর প্রাণপণে চেপে ধরে মাটির একটা ঢিবি

থেকে আরেকটা ঢিবিতে ডিঙি মেরে-মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। জুতো-ছাড়া কালিঝুলি-মাখা খালি পা দুটো যাতে উঠোনের মাটিতে বরফের ওপর না-পড়ে তারই জন্যে ওর এই প্রয়াস। অন্যদের থেকে অল্প একটু পিছিয়ে পড়ে ছেলেটিকে থামালুম। বললুম:

'কোথায় গিয়েছিলে, বাচ্চা?'

দাঁড়িয়ে পড়ে মুখখানা তুলল ছেলেটি। বলল:

'আমাদেরে আর কনে পাঠাত্যেছে কিনা তাই জানতি গিয়েলাম।'

'কোথায় পাঠাবে?'

'সক্কলে বলত্যেছে আমাদেরে অন্য কোনো জায়গায় নাকি পাঠানো হবে।'

'কেন, এ-জায়গাটা তোমাদের ভালো লাগে না?'

কোটের একটা কোনা দিয়ে নিজের কানটা মুছতে-মুছতে বাচ্চাটা নরম গলায় করুণভাবে বললে, 'আমরা এখেনে আর থাকতি পারত্যেছি না। ঠাণ্ডায় জমি মর্যে যাব কোন্‌দিন... তা বাদে, অরা আমাদেরে মারে...'

'কে মারে?'

'সক্কলেই।'

বাচ্চা ছেলেটিকে বেশ বুদ্ধিমান বলেই ঠেকছিল। তাছাড়া ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া অভিজ্ঞ ছেলে বলেও মনে হচ্ছিল না। ছেলেটির ছিল বড়-বড় নীল চোখ। রাস্তার ছেলেদের কাছ থেকে বিকট ভঙ্গি না-শেখায় চোখ দুটো তখনও পর্যন্ত কুৎসিত হয়েও ওঠে নি। ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিলে ছেলেটি দিব্যি ফুটফুটে হয়ে উঠতে পারত।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন? মারে কেন?'

'এমনেই, শুধা-শুধা। অরা যা চায় তা যদি না দিই তাইলি। কিংবা এমনেতেই আমাদের খাবার কাড়্যে নিয়ি যায়। আমাদের দোস্তরা অনেকদিন ধরিই প্যাট পুরি খাতি পায় না। অনেক সময় অরা আমাদের রুটি পের্যন্ত কাড়্যে নিয়ি যায়... কিংবা ধরেন, অরা চুরি করতি বললি আমরা যদি চুরি না-করি তাইলিও... আচ্ছা, বলতি পারেন আমাদেরে আর কনে পাঠানো হবে কিনা?'

'তা তো জানি না, বাবা।'

'সক্কলে বলত্যেছে শিঘ্রি নাকি গ্রীষ্মিকাল আসতিছে

'গ্রীষ্মকাল দিয়ে কী হবে তোমার?'

'তখন আমি পলায়ে যাব-নে...'

ওয়ার্কশপের কাছ থেকে অন্যেরা তখন আমায় ডাকাডাকি করছিল। বাচ্চাটাকে কোনোরকম সাহায্য না-দিয়ে ছেড়ে যেতে একেবারেই মন চাইছিল না আমার, কিন্তু ছেলেটা ততক্ষণে ফের ডিঙি মেরে ঢিবি থেকে ঢিবিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে এজমালি ঘরমুখো রওনা হয়ে গিয়েছিল -- বাইরে থেকে ঘরের ভেতর তবু কিছুটা বেশি গরম হবে এই আশায় হয়তো।

অবশ্য ওয়ার্কশপগুলো ঘুরে দেখা শেষপর্যন্ত আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না — কারণ, জানা গেল কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছে নাকি সব ক'টা ওয়ার্কশপের চাবি মজুত আছে। অথচ ঠিক কার কাছে যে তা আছে অনেক খোঁজখবর করেও ডিরেক্টর সায়েব সে-রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারলেন না। অতএব জানলাগুলো দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মেরেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল। বাইরে থেকে ঘরগুলোয় কেবল গোটা কয়েক পাঞ্চ করার মেশিন, কাঠ-মিস্ত্রির কাজের টেবিল আর দুটো লেদমেশিন, এইরকম গোটা বারো যন্ত্র নজরে পড়ল। শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যসিদ্ধ দুটো সংশ্লিষ্ট কারখানা -- জুতো তৈরির আর দর্জির কারখানা — অন্য-অন্য দালানে অবস্থিত বলে শোনা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ কোনো ছুটির দিন নাকি?'

ডিরেক্টর কথাটার কোনো জবাব দিলেন না। ফলে ইউরিয়েভ ফের একবার জবাবদিহির কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বললেন:

'আপনার কথা শুনে অবাক হচ্ছি, আন্তন সেমিওনভিচ! ইতিমধ্যে আপনার সবকিছু বুঝে ফেলা উচিত, তা-ই নয় কি? এখানে কেউই কোনো কাজ করে না, এই হল গিয়ে অবস্থা। তাছাড়া যন্ত্রপাতি সবই চুরি হয়ে গেছে, আর না-আছে কাজের উপযোগী কাঁচামাল, না-বিজলিবাতি, না-খদ্দেরের অর্ডার, না কিছু! তদুপরি, কীভাবে কাজ করতে হয় তা এখানে কেউই জানে না।'

খালাবুদা যা নিয়ে আগে অত বারফট্টাই করছিলেন কলোনির সেই বিজলি সরবরাহের কারখানাটিও দেখা গেল একেবারে কাজ করছে না -- সেখানেও কিছু-একটা অচল হয়ে গেছে।

'আর ইশ্‌কুল? তার কী অবস্থা?'

ডিরেক্টর স্বয়ং এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

বললেন, 'ইশ্‌কুল একটা আছে বটে... তবে আমাদের অন্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে...'

মাঠে যাওয়ার জন্যে বারে বারে আমাদের তাগিদ দিচ্ছিলেন খালাবুদা। মঠঘেরা বেশ কয়েক ফুট চওড়া মোটা দেয়ালটার বৃত্তের বাইরে পা দিতে প্রথমেই আমাদের নজর পড়ল টিলার নিচে মাটিতে একটা বড় গর্তের দিকে। বোঝা গেল গর্তটা এক সময়ে নিশ্চয়ই একটা পুকুর ছিল। পুকুরের ওপারে ছিল ছোপ-ছোপ, পাতলা তুষারের জাজিমে-মোড়া টানা মাঠ — একেবারে দূরের বন পর্যন্ত। সম্রাট নাপলেয়ঁর ভঙ্গিতে হাতখানা সেইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে খালাবুদা এবার জয়গর্বে বলে উঠলেন:

'এক শত বিশ দেসিয়াতিনা জমি। বোঝলেন? ঐশ্বর্য একবারে!'

'শীত-ফসলের বীজ বোনা হয়েছে কী?' অসতর্কভাবে আমি জিজ্ঞাসা করে বসলুম।

আর যায় কোথায়! আনন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন খালাবুদা, 'শীত-ফসল? তিরিশ দেসিয়াতিনা জমিনে জোয়ার বোনা হয়্যেছে। তা ধরেন ক্যানে, দেসিয়াতিনা প্রেতি এক শত পুদ ফলব্যে। তাইলি জোয়ার পাওয়া যাবে-নে মোট তিন হাজার পুদ! ছেল্যাপেল্যাদেরে তাইলি রুটি না-খায়্যে থাকতি লাগব্যে না। আর জোয়ার বল্যে জোয়ার! মান্‌ষে যদি শুধা জোয়ারই বুন্যে চলে, তাইলি তাদের তো আর কিছুর দরকার হয় না। এয়ার কাছি গম লাগে নাকি? জোয়ারী রুটি বল্যে কথা — জার্মানরা এয়া খাতি পারে না, এমন কি ফরাসিরাও পারে না কিন্তু আমাদের লোকজনা দিব্যি পারে। বলে যতক্ষণ জোয়ারী রুটি আছে...'

ততক্ষণে মোটরগাড়ির কাছে ফিরে এসেছিলুম আমরা। কিন্তু জোয়ার নিয়ে বক্তৃতা তখনও চালিয়ে যাচ্ছিলেন খালাবুদা। প্রথম-প্রথম এতে আমাদের বিরক্তি ধরছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠল — মনে হল, শোনাই যাক-না জোয়ার সম্বন্ধে ওঁর আর কী-কী বলার থাকতে পারে!

গাড়িতে উঠলুম আমরা। গাড়ি ছেড়ে দিল। নিঃসঙ্গ, মনমরা ডিরেক্টর সায়েব আমাদের বিদায় দিয়ে গেলেন। খলোদ্‌নায়া পাহাড়ে পেঁছনো পর্যন্ত চুপচাপ রইলুম সকলে। অতঃপর যখন গ্রামের বাজারখোলা পার হচ্ছি তখন ইউরিয়েভ রাস্তার একদল ছেলের দিকে ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললেন:

'এরা হল কুরিয়াজ কলোনির ছেলে... তা, কী বলেন — হাতে নেবেন কলোনিটা?'

'না, নেব না।'

'আপনার ভয়টা কিসের? গোর্কি কলোনিও তো কিশোর অপরাধীদের আশ্রম, তাই নয় কি? আর সারা ইউক্রেন কমিশন তো সারাক্ষণই নানারকম আন্দেভেজাল আপনাদের কাছে পাঠিয়ে চলেছে। এখানে তার তুলনায় আমরা বরং আপনাদের স্বাভাবিক ছেলেপিলেই দেব।'

একথা শুনে গাড়ির ঝাঁকুনি সত্ত্বেও এমন কি খালাবুদা পর্যন্ত না-হেসে পারলেন না। বললেন:

'স্বাভাবিক! আর কত শুনব্য!..'

ইউরিয়েভ কিন্তু তাঁর চিন্তার সূত্র ধরে বলেই চললেন:

'চলুন, সোজা দ্‌জুরিন্‌স্কায়ার কাছে যাই। গিয়ে এ-বিষয়ে কথা বলি। শিশু-সহায়তা কমিটি কলোনিটা শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের হাতে তুলে দেবে। আপনাদের কলোনিতে কিশোর-অপরাধী পাঠানো খার্‌কভ পছন্দ করে না, তাছাড়া ওদের নিজস্ব বাচ্চাদের কলোনিও নেই। তাহলে এই কলোনিটা তখন আমাদের হবে। আর ভাবুন, কী একখানা কলোনি! চার শো ছেলেমেয়ে। বলবার-কইবার মতো ব্যাপার একটা! এ-কলোনির ওয়ার্কশপগুলোও মন্দ নয়... আচ্ছা, সিদর কার্‌পভিচ, কলোনিটা আপনি দেবেন তো?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন খালাবুদা।

তারপর বললেন, 'তিরিশ দেসিয়াতিনা জমিনের জোয়ার ফসল। তার অথ, দুই শত চল্লিশ পুদ দানা-ফসল। আর কাজের মজুরি? তাও আপনেরা দিবেন তো? তা, কলোনিডা আমরা ছাড়্যে দিব না ক্যানে? নিচ্চয় ছাড়ব্য!'

'তাহলে চলুন দ্‌জুরিন্‌স্কায়ার কাছে যাই,' ইউরিয়েভ ফের তাগিদ দিলেন। 'কলোনি থেকে এক শো বিশ জন ছোট বাচ্চাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাব, আপনাদের জন্যে রেখে দেব দু'শো আশিজন বড় ছেলেমেয়ে। এই সব ছেলেমেয়ে সরকারিভাবে অপরাধী বলে গণ্য না হলেও কুরিয়াজ কলোনিতে শিক্ষা নেয়ার পর তারা অপরাধীর চেয়ে আরও বদমায়েশ যদি কিছু থাকে তো তাই হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু আমি কেন এই নরকে পচতে যাব?' ইউরিয়েভকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম। 'তাছাড়া, জায়গাটা ভালোরকম সাফ করা দরকার। এর জন্যে বিশ হাজার রুবলের কম খরচ হবে না।'

'সিদর কারপভিচ ও-টাকাটা আপনাদের দেবেন।'

শুনে খালাবুদা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন বলে মনে হল।

'বিশ হাজার রুবল? কিসির জন্যি?'

'অপরাধের দাম! রক্তের মূল্য পরিশোধ!' বললেন ইউরিয়েভ।

'কিন্তু তাই বল্যে বিশ হাজার কিসির জন্যি?' আবার অবাক হলেন খালাবুদা।

'বাড়ি মেরামত, দরজা বসানো, যন্ত্রপাতি, বিছানা, জামাকাপড় কেনা — সবকিছুর জন্যে।'

অসন্তুষ্টভাবে ঠোঁট ওলটালেন খালাবুদা।

বললেন, 'বি — শ হাজার! বিশ হাজার রুবল পেলি তো নিজিরাই আমরা সবকিছু করতি পারি।'

দজুরিনস্কায়ার অফিসে পেঁছেও ইউরিয়েভ তাঁর প্রচার-অভিযান চালিয়ে চললেন। লিউবোভ সাভেলিয়েভনা মুখে হাসি টেনে ওঁর কথা শুনতে লাগলেন আর মাঝে-মাঝে কৌতূহলভরে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে।

পরে বললেন, 'কিন্তু এটা করতে গেলে এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে। গোর্কি কলোনিকে এতখানি বিপদের মুখে ফেলতে পারি না আমরা। যা আমাদের করতে হবে তা হল কুরিয়াজ কলোনি বন্ধ করে দিয়ে ছেলেমেয়েদের অন্যান্য কলোনির মধ্যে ভাগ করে দেয়া। তাছাড়া কমরেড মাকারেঙ্কোও কুরিয়াজে যেতে রাজি নন।'

সায় দিয়ে বললুম, 'না, রাজি নই।'

'তাহলে এটাই আপনার শেষ কথা?' ইউরিয়েভ শুধোলেন।

'আমাকে আগে কলোনি-বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে আমি নিশ্চিত যে তারা রাজি হবে না।'

চোখ পিটপিট করে উঠল খালাবুদার। জিজ্ঞাসা করলেন:

'কেডা রাজি হব্যে না?'

'কলোনি-বাসিন্দারা।'

'তার মানে আপনে বলতি চান — আপনের রক্ষণাধীন ছেল্যাপেল্যারা?'

'হ্যাঁ, তাই!'

'তা, তারা এ-ব্যাপারের কতটুক জানে?'

দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া এবার খালাবুদার কোটের হাতায় হাত রাখলেন।

বললেন, 'সিদর-খুড়ো, তারা এ-সব ব্যাপারে আপনার-আমার চেয়ে ঢের বেশি জানে। আপনার কুরিয়াজ চোখে দেখার পর তাদের মুখের অবস্থা কী রকম দাঁড়ায় তা দেখার আমার ভারি ইচ্ছে।'

এবার চটে উঠলেন খালাবুদা। বললেন:

'সক্কলে মিলি খালি 'আপনের কুরিয়াজ', 'আপনের কুরিয়াজ' কন ক্যানে বলেন দেখি? এয়া আমার হল্য কী প্রেকারে? আমি আপনেদেরে পঞ্চাশ হাজার রুব্‌ল দিয়েলাম। একখান বিজলিবাতির ইঞ্জিন দিয়েলাম। বারোখান যন্তর দিয়েলাম। আর ম্যাস্টররা তো সবই আপনেদের.. তারা যদি নিজিদির কাজ না জানে তা আমি তার কী করতি পারি?..'

সামাজিক শিক্ষাকর্মীদের পারিবারিক ঝগড়া তাঁদের নিজেদের মধ্যে আপসে মেটানোর সুযোগ দিয়ে ট্রেন ধরতে আমি দৌড়ি লাগালুম। আমাকে বিদায় দিতে কারাবানভ আর জাদোরভ খার্‌কভ স্টেশনে এসেছিল। কুরিয়াজ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বিবরণ আমার মুখে শুনে রেলগাড়ির চাকায় তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দু-জনে চিন্তায় ডুবে গেল। অবশেষে কারাবানভ বলল:

'খাটা পায়খানা পরিষ্কার করা গোর্কিপন্থীদের পক্ষে মস্ত একটা সম্মান না। কিন্তু শেষকথাই-বা কে বলতে পারে? ব্যাপারটা ভাল করি ভেবে দেখা দরকার...'

হাসিতে দন্ত বিকশিত করে জাদোরভ বলল, 'তবে তখন আমরা কাছে থাকব — সাহায্য করতে পারব আমরা। বুঝলি সেমিওন.. চল্‌-না, কাল গিয়ে জায়গাটা একবার দেখে আসি!'

ওই সময়কার আমাদের অন্যান্য সভার মতো কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভাও সতর্ক, সংযত ও চিন্তিতভাবে আমার বক্তব্য শুনল। রিপোর্ট পেশ করার সময় আমি যে কেবল সকৌতূহলে সভার হৃদ্‌স্পন্দনই শুনছিলুম তা নয়, নিজের বুকের ধুকধুকও শুনছিলুম। হঠাৎ কেন যেন আমার ইচ্ছে হল করুণভাবে হাসতে। মনে হল, মাস চারেক আগে আমি কি বাচ্চা ছেলের সামিল ছিলুম, যখন বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দাদের সঙ্গে জাপরোজিয়ে নিয়ে আকাশকুসুম

কল্পনার তুরীয় আনন্দে আমিও টগবগ করে ফুটে উঠেছিলুম? তাহলে এই চার মাসে কি আমি সাবালক হয়েছি, নাকি নিছক নিস্তেজ হয়ে পড়েছি? অনবরত মনে হচ্ছিল যেন আমার কথাবার্তায়, আমার গলার আওয়াজে, আমার মুখের ভাবভঙ্গিতে আস্থার শোচনীয় অভাব প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। এর আগের গোটা একটা বছর ধরে আমরা উদার বিস্তারে, আলোয় আলোময় শূন্যে মাথা তোলবার প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে আসছিলুম; আমাদের সেই স্বপ্নের পরিণতি নিশ্চয়ই কুরিয়াজের মতো অমন একটা অকল্পনীয় নোংরা নরকে পতনের মধ্যে ঘটবে না! ভেবেই পাচ্ছিলুম না এটা কী করে সম্ভব হল যে আমি স্বেচ্ছায় অমন একটা অসহনীয় ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা পর্যন্ত করতে পিছপা হচ্ছি না? আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাবার মতো আছে কী কুরিয়াজে? কোন সুযোগসুবিধার আশায় আমরা ছেড়ে যেতে চাইছি আমাদের এই সব ফুলের কেয়ারি, আমাদের কলমাক, আমাদের কাঠের পাটাতনের মেঝে, যাকে আমরা নবজীবন দান করেছি আমাদের সেই ত্রেপ্‌কে তালুককে?

তবু মুখে-মুখে এমন একটি বিবরণ রচনা করে চলেছিলুম, যা ছিল চাঁচাছোলা বাহুল্যবর্জিত আর আন্তরিকতায় পূর্ণ, যাতে একটিও আনন্দোচ্ছল শব্দ ব্যবহারের অবকাশমাত্র ছিল না, অথচ আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে শুনছিলুম তারই মধ্যে বাজছে উগ্র, উন্নত একটা চ্যালেঞ্জের সুর আর কোথায় কতদূরে যেন টিপটিপ করছে ভীরু আশার জোনাকিরা।

থেকে-থেকেই হেসে উঠে কলোনি-বাসিন্দারা আমার কথায় বাধা দিচ্ছিল। ওরা হেসে উঠছিল ঠিক সেই সব কথাতেই, যে-কথাগুলো বলে আমি ওদের ভয় পাইয়ে দেব ভাবছিলুম। তারপর হাসি সামলে ওরা আমার দিকে প্রশ্নের-পর-প্রশ্নের গোলাগুলি ছুড়তে লাগল, আর আমার জবাব শুনে ফেটে পড়তে লাগল আরও জোর হাসিতে। তবে সে হাসি আশার বা আনন্দের ছিল না, ছিল বিদ্রুপের।

'আর চল্লিশ জনা মাস্টারমশাইয়ের কামটা কী?'

'তা বলতে পারব না।'

ফের হাসির ধুম পড়ে গেল।

'আন্তন সেমিওনভিচ! আপনে ওখেনে কারও থুতনিতে ঘুসো কষান নাই? আমি হলি তো কিছুতেই ঘুসো মারার লোভ সামলাতি পারতাম না!'

আবার হাসির হুল্লোড় উঠল।

'ওখেনে কি খাবার ঘর আছে?'

'তা আছে। কিন্তু ছেলেপিলেরা সবাই ওখানে খালিপায়ে ঘোরে, তাই স্যুপের ডেকচিগুলো এজমালি ঘরে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে খায় তারা...'

আবার হাসি।

'ডেকচিগুলান কারা বয়ে নিয়ি আসে?'

'তা দেখি নি। তবে ছেলেরাই সম্ভবত...'

'পালা করে — না কীভাবে?'

'মনে হয়, পালা করেই।'

'ওহ্, তাইলে তো ওরা সংগঠনও গড়তি পারে!'

ফের হাসি।

'কম্‌সমোল সংগঠন আছে নাকি ওখেনে?'

এবার আমার উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকেই হাসির বন্যা বইল।

কিন্তু তবু, আমার রিপোর্ট পেশ করা শেষ হলে পর সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকল গভীর উদ্বেগ নিয়ে।

কে যেন একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তা এ-ব্যাপারে আপনের মত কী?'

'তোমরা যা ঠিক করবে আমারও তা-ই মত...'

লাপত নিবিষ্টভাবে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু মনে হল আমার মুখ দেখে সে কিছু ঠাহর করতে পারছে না। সে বলল:

'আরে, বলেই ফেলেন না!.. কী?.. কথা কতিছেন না যে বড়?.. আরে, চুপ মেরে থেকে ফায়দাটা কী, কন তো?'

হঠাৎ দেনিস কুদ্‌লাতি হাত তুলল। দেখে লাপত বলল:

'আহা, দেনিস! তা, তোর আবার এ-বিষয়ে কী বলার আছে!'

প্রথমেই দেনিস মাথার পেছনটা চুলকোতে গেল। কিন্তু তার এই মুদ্রাদোষ নিয়ে যে কলোনি-বাসিন্দারা সর্বদাই হাসাহাসি করে এটা মনে পড়ে যাওয়ায় অবাঞ্ছিত হাতখানা ফের নেমে এল।

কিন্তু তার এই প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া ছেলেদের নজরে পড়ে গিয়েছিল। তারা হেসে উঠল।

কুদ্‌লাতি শুরু করল, 'সত্য কথা বলতে কী, আমার বিশেষ কিছুই বলার নাই। তবে, জায়গাটা খার্‌কভের কাছাকাছি, সেটা সত্য... কিন্তু এই ধরনের একটা কাজ হাতে নেয়া... তা করার মতন লোক কই আমাদের? কাজের লোক সকলেই তো 'রাব্‌ফাক'-এ চলি গেছে...'

কথাটা বলে এমনভাবে মাথা নাড়ল কুদ্‌লাতি যেন মুখে মাছি গেছে তার।

ফের বলল, 'সত্য কথা বলতে কী, কুরিয়াজ নিয়ি আলোচনা করার মোটেই কোনো প্রয়জন আছে কিনা সন্দেহ। ওখেনে আমরা মাথা গলাতি চেত্যেছি ক্যানে? তা বাদে মনে থাকে যেন — ওখেনে ওরা আছে দুই শত আশিজনা আর আমরা সংখ্যায় এক শত বিশজনা, আর আমাদের মধ্যি নূতন ছেলেপিলে বহুত্‌ আর বড় ছেলেরাও নাই। তোস্‌কা এখন দলপতি, নাতাশাও দলপতি, আর পেরেপেলিয়াত্‌চেঙ্কো, সুখোইভান আর গালাতেঙ্কো...'

'গালাতেঙ্কোরে নিয়ি আবার টানাটানি ক্যানে?' একটা ঘুমঘুম, বিরক্ত গলা শোনা গেল। 'যেখানি যত দোষ, সব নন্দঘোষ 'গালাতেঙ্কো'।'

'তুই চুপ যা দেখি!' লাপত বলে উঠল।

'ক্যানে, চুপ যাব্য ক্যানে? ওখেনকার লোকগুন কেমন তা আন্তন সেমিওনভিচ আমাদেরে বল্যেছেন। আর আমি? আমি কাম করি না, নাকি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' দেনিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'আমি মাফ চাই -- কিন্তু দেখিস, ওখেনে গেলি ওরা মেরে আমাদের থোপনা ভোঁতা করে দেবে-নে।'

মিত্‌কা জেভেলি মাথা তুলল এইবার। বলল:

'থাক, থাক, 'থোপনা' অত শস্তা না!'

'তা, দিলি কী করবিটা তুই?'

'কী করি তা দেখিস তখন!'

বসে পড়ল কুদ্‌লাতি। এবার উঠলেন ইভান ইভানভিচ।

'কমরেড কলোনি-বাসিন্দারা, আমি আর কোথাও যেতে চাই না, কাজেই বলা যেতে পারে যে আমি বাইরে থেকে সবকিছু দেখতে পারছি এখন, অর্থাৎ আরও স্বচ্ছভাবে দেখতে পারছি। আমি বলি, তোমরা কুরিয়াজ যাবে কেন? ওরা আমাদের ঘাড়ে তিন শো গুঁচা ছেলেকে চাপিয়ে দিতে চাইছে আর তাও আবার খার্‌কভের ছেলেছোকরা তারা...'

'কিন্তু ওরা এখেনেও খার্‌কভের ছেলে পাঠায় না কি?' লাপত শুধোল।

'পাঠায়। কিন্তু ভাবো একবার — ওখানে আছে তিন শো ছেলে! আর আন্তন সেমিওনভিচ যা বললেন তাতে বোঝা গেল বেশ বড়-বড় ছেলেই আছে ওখানে। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার — তোমাদের যেতে হচ্ছে ওদের এলাকায় আর ওরা থাকছে নিজেদের ঘাঁটিতে। ওরা যদি শুধুমাত্র জামাকাপড়ই চুরি করে থাকে আঠারো হাজার রুব্‌ল দামের, তাহলে তোমাদের নিয়ে যে ওরা কী করবে তাই ভাবো একবার!'

কে যেন একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কাবাব বানাবে!'

'না, কাবাব বানানোর তর সইবে না — কাঁচা গিলি খাবে আমাদেরে!'

'তাছাড়া ওরা আমাদের বহু ছেলেকে চুরি করতেও শেখাবে,' ইভান ইভানভিচ বললেন। 'এমনধারা মতিগতির ছেলেছোকরা আমাদের মধ্যে তো আছেই, নাকি?'

'নেই আবার? বহুত্‌ আছে,' কুদ্‌লাতি জবাব দিল। 'আমাদের মধ্যি জনা চল্লিশেক চুরিবিদ্যের বাচ্চা সর্দার আছে। তারা চুরি করে না নেহাত ভয়ে।'

শুনে খুশি হয়ে ইভান ইভানভিচ বললেন, 'তাহলেই দেখছ! এখন হিসেব কর! মেয়ে আর একেবারে বাচ্চা নিয়ে তোমাদের দলে তাহলে থাকছে মাত্তর আশিজন, আর ওদের দলে তিন শো বিশজন... কিন্তু এটা করা হচ্ছে কিসের জন্যে? গোর্কি কলোনি ধ্বংস করে লাভ কী? আন্তন সেমিওনভিচ, আপনি কিন্তু নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চলেছেন!'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে বসে পড়লেন ইভান ইভানভিচ। কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। তবে মনে হল তাদের সমর্থনটা যেন খানিকটা নিমরাজি হওয়ার ধরনের, কারণ তাদের গুঞ্জনের আওয়াজে সিদ্ধান্তে আসার বিশেষ সুরটি বাজল না।

এরপর কালিনা ইভানভিচ উঠল বলতে। প্রাচীন গ্রেটকোট গায়ে, সর্বদাই যেমন তখনও তেমনি পরিষ্কার কামানো মুখ আর ফিটফাট চেহারা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ানোমাত্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুশির সাড়া পড়ে গেল। অবশেষে কলোনির সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে ভেবে কালিনা ইভানভিচ মনে-মনে কষ্ট পাচ্ছিল তখন। ওর নীল চোখ দুটোয় প্রবল এক মানবিক বিষাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলুম আমি, যা মিশে ছিল ওর বুড়ো বয়সের ঘোলাটে দৃষ্টির সঙ্গে।

ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করল কালিনা ইভানভিচ। বলল, 'ব্যাপারখান হইল গিয়া এইরকম। আমিও তোমাগো সাথে যাইতাছি না, কাজেই বলা চলে আমিও একজন বাইরের মানুষ। যদিও নিজেরে আমার তা মনে হয় না, এই তফাত। যাউগ্‌গা, ইচ্ছা কইর‍্যা কোথাও যাওয়া আর জেবনের চাহিদা মিটাইতে কোথাও যাওয়া — এ দুই হইল প্রেথক বস্তু। গত মাসে তোমরা বলতেছিলা: ইংরাজগো পাঠানোর মতন যথেষ্ট মাখন তৈয়ার করুম আমরা। এখন, আমারে — এই বুড়া মানুষটারে — কও, এ-জিনিস চইলতে দেয়া যায় কী প্রেকারে? আমি দ্যাখছিলাম তোমরা সক্কলে কী সাংঘাতিক চেইত্যা উঠছিলা — রব তুলছিলা 'চল যাই', 'চল যাই'! তা, সে-জাগায় যাইলে ফলটা কী হইত? তত্ত্বগতভাবে কইতে গ্যালে তোমরা অবশ্যই জাপরোজিয়েতে থাইকতে, কিন্তু আসলে কামটা কী কইরতে, না শুধা গোরু পালতে, এই পর্যন্ত। ইংরাজগো মাখন পাঠাইবার আগে তার লেগ্যে তোমাগো কত ঘাম ঝরাইতে হইত — তার হিসাব রাখ তোমরা? ভালো মাখন পাইতে গ্যালে কত যত্নে গোরুরে ঘাস খাওয়াইতে, গোরুর রাশিরাশি গোবর সাফ কইরতে আর তার গা ধোওয়াইতে লাগত! এ-সকল কোনো কিছুই ভাবো নাই তোমরা, আহাম্মক কোথাকার! তোমরা খালি চিচ্‌কার দিবার জানো: 'চল যাই', 'চল যাই'! আর কিছু না। তোমাগো যে যাওয়া হয় নাই, এয়া খুবই ভালো হইছে। আর এখন কুরিয়াজ যাওনের প্রস্তাব আসছে, আর তোমরা বইস্যা-বইস্যা চিন্তা করতাছ তো করতাছই। কিন্তু এত চিন্তা করনের আছেটা কী? তোমরা প্রেত্যেকে একেক জন প্রগতিশীল মানুষ, আর দ্যাখো — তোমাগো তিন শত ভাইবেরাদার একবারে গোল্লায় যাইতাছে, যেমন তোমরা তেমনই তিন শত মাক্সিম গোর্কি অরাও। আন্তন সেমিওনভিচ অগো কথা তোমাগো কাছে বলামাত্রই তোমরা হো-হো কইর‍্যা হাইস্যা ওঠলা, কিন্তু জিগাই — এয়াতে হাসনের আছেটা কী? রাজধানীর — খারকভের — বুকের উপরি খোদ গ্রিগোরি ইভানভিচের* একবারে নাকের ডগায় চার শত ডাকাইত বাইড়া ওঠতাছে — এয়া সোভিয়েত সরকার মাইন্যা লয় কী প্রেকারে? তা, সোভিয়েত সরকার এখন তোমাগো কইত্যাছে যে যাও গিয়া কাজ কর অগো মধ্যিখানে,

* গ্রিগোরি ইভানভিচ পেত্রোভ্‌স্কি —১৯১৯-১৯৩৯ সালের মধ্যে সর্বইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি। — অনুঃ

ভদ্রলোক হইয়া ওঠতে সাহায্য কর অগো — ভাবো একবার, সোজা কথা না, তিন-তিন শত মানুষ বইল্যা কথা! আর তোমাগো কার্যকলাপ লক্ষ্য করব রাস্তার আজেবাজে লোক না, লুকা সেমিওর্নভিচের মতন মানষে না, লক্ষ্য করব গোটা খারকভের প্রোলেতারিয়েত! এমন কাজে তোমরা কিনা নারাজ হইতাছ! তোমাগো সাধের গোলাপবাগিচা ছাইড়্যা যাইতে মন ওঠতাছে না, আর তোমরা ডরাইতাছ — আমরা মাত্তর এই কয়জনা আর অরা, অপদাত্থগুলা, সংখ্যায় কত — তো বেশি। কিন্তু আন্তন সেমিওর্নভিচ আর আমি, আমরা মাত্তর এই দুইজনায় — এই কলোনিটারে কেমনভাবে শুরু কইরাছিলাম বইল্যা মনে কর? ভাবো কী — সাধারণ সভা ডাইক্যা বক্তিতা দিছিলাম? ভোলখভ, তারানেত্স আর গুত বলুক দেখি, অগো দেইখ্যা — অপদাত্থগুলারে দেইখ্যা আমাগো ডর লাগছিল কিনা! তাছাড়া এয়া তো রাষ্ট্রের লেগ্যে কাজ, সোভিয়েত সরকারের প্রেয়জনে লাগে এমনধারা কাজ। তাই আমি তোমাগো কইতাছি — চইল্যা যাও, ভাবনাচিন্তা করনের কিছু নাই! কথাটা শুইনলে মাক্সিম গোর্কি বলবেন — আমার গোর্কিপন্থীগো দ্যাখো একবার, কথা নাই বার্তা নাই অরা, অপদাত্থরা, সিধা চইল্যা গেল! ডরে পিছপা হইল না পর্যন্ত!'

যত বেশিক্ষণ ধরে বলতে লাগল কালিনা ইভানভিচ তত তার ফ্যাকাশে গাল দুটো লাল হয়ে উঠতে লাগল আর তত বেশি করে চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল কলোনি-বাসিন্দাদের। মেঝের ওপর বসে ছিল যে-সব ছেলেপিলে তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে ঘেঁষে এল আর কেউ-কেউ তাদের পাশের বন্ধুর কাঁধে থুতনি রেখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল — কালিনা ইভানভিচের মুখের দিকে নয়, দূরের কোনো একদিকে, তাদের ভবিষ্যৎ অভিযানের কল্পনার দিকে হয়তো-বা। আর যখন কালিনা ইভানভিচ মাক্সিম গোর্কির নাম উল্লেখ করল তখন কলোনি-বাসিন্দাদের জ্বলন্ত চোখগুলো থেকে যেন আগুন ছুটবে বলে মনে হতে লাগল: ছেলেরা চেঁচাতে লাগল, গর্জন করতে লাগল, হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল, তারপর ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে। কিন্তু প্রাণের সুখে আনন্দ প্রকাশের সময় ছিল না তখন। মেঝেয় যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে থেকে মিত্কা জেভেলি দাঁড়িয়ে উঠে পেছনের সারির ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'আমরা যাব, অপদাত্থ স্যাঙাত্রা যতই যাই বল্ — আমরা যাবই!'

সম্ভবত সে আশা করেছিল ওই সারিগুলো থেকে বাধা আসবে। কিন্তু দেখা গেল পেছনের সারিগুলো থেকে ছেলেরাও মুখে অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্পের ভাব ফুটিয়ে তুলে মিত্‌কার দিকে নানারকম কথার গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে কালিনা ইভানভিচকে ঘিরে ধরেছিল একপাল ছেলে। তারা শুধুই ঠেলাঠেলি করছিল আর ওই মুহূর্তে খালি চেঁচিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিল না। মিত্‌কা এবার কালিনা ইভানভিচকে লক্ষ্য করে বললে:

'কালিনা ইভানভিচ, ব্যাপারটা যখন এই রকমই দাঁড়াল তখন আপনে কি আমাদের সাথে আসবেন না?'

পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে কোনো কথা না-বলে কালিনা ইভানভিচ শুধু করুণভাবে হাসল। এবার বক্তৃতা দিতে উঠল লাপত। শুরু করল এই বলে:

'ওখেনে কী লেখা আছে — পড়্ সবাই!'

অমনি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সকলে:

'নাকী কান্না চলবে না!'

'ফের একবার — আবার পড়্ সবাই!'

মুঠিবাঁধা হাতখানা নিচের দিকে ছুড়ে দিল লাপত। অমনি সবাই কঠিন গমগমে গলায় ফের চেঁচিয়ে উঠল:

'নাকী কান্না চলবে না!'

'অথচ তোরা কিনা নাকে কাঁদতেছিলি। ভারি আমার সব গণিত-বিশারদ হয়েছেন? একদলে আশি আর অপর দলে তিন শো বিশজন। সংখ্যা ওইভাবে গুনতি করতি হয় নাকি? আমরা যখন চল্লিশ-জন খার্‌কভের বাচ্চারে কলোনিতি ভর্‌তি করে নিয়েছিলাম, তখন কি সংখ্যা গুনতি করেছিলাম? তা, কোথায় তারা এখন?'

'আমরা এইখেনে, আমরা এইখেনে!' চেঁচিয়ে উঠল কচিকাঁচারা।

'তাইলে কী হল?'

কচিকাঁচারা ফের চেঁচিয়ে উঠল:

'চমৎকার হল্য!'

'তাইলে? মাথা গুনতি করে কী হবে ছাই? আমি যদি ইভান ইভানভিচ হতাম তাইলে আমি গুনতি করতাম এইভাবে — আমাদের একটাও ছারপোকা

নাই আর ওদের আছে দশ হাজার — কাজেই যেখেনে আছ সেইখেনেই থেকে যাও!'

হাসিতে উদ্বেল হয়ে সভা এবার ফিরে তাকাল ইভান ইভানভিচের দিকে। লজ্জায় লাল হয়ে তিনি তখন মুখ লুকোতে পারলে বাঁচেন।

'ব্যাপারটা তাইলে এইরকম,' লাপত বলল। 'আমাদের পক্ষে আছে গোর্কি কলোনি, আর ওদের পক্ষে কে আছে? কেউ নাই!'

লাপতের বক্তৃতা শেষ হল। কলোনি-বাসিন্দারা এবার চেঁচিয়ে বলল:

'ঠিক-ঠিক! আমরা যাব, এই হল গিয়ে কথা! আন্তন সেমিওনভিচ এইটা শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতরে লিখে জানায়ে দ্যান!'

'ঠিক কথা!' কুদ্‌লাতি বলল। 'তাইলে আমরা যেতেছি! কিন্তু যাতি হলে মাথা খাটাতি হবে আমাদের। আসচে কাল হল পয়লা মার্চ, কাজেই এক মিনিট নষ্ট করার মতন সময় নাই। চিঠি লেখলি চলবে না, আমাদেরে তার করতি হবে। তা না হলি এ-মরশুমে সব্জি-বাগান করতি পারব না। আরেকটা কথা — টাকা ছাড়া যেতি পারব না আমরা। বিশ হাজার রুব্‌ল কিংবা যাই হোক, টাকা আমাদের হাতে পাওয়া চাই।'

এবার লাপত আমার পরামর্শ চাইল। শুধোল, 'প্রস্তাবটা ভোটে দিব নাকি?'

জনতার মধ্যে থেকে চিৎকার উঠল, 'এ-সম্বন্ধে আন্তন সেমিওনভিচের মত কী বলেন শুনি।'

'বুঝতি পারছিস না?' লাপত বলল। 'তবু নিয়ম বজায় রাখার জন্যি ওনার মত নেয়া দরকার। এবার আন্তন সেমিওনভিচ কিছু বলবেন।'

সভার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে আমি শুধু সংক্ষেপে বললুম:

'গোর্কি কলোনির নামে তিনবার জয়ধ্বনি দাও!..'

সেই সময়কার প্রধান কোচোয়ান ও দ্বিতীয় বাহিনীর দলপতি-পদে সদ্য-উন্নীত মিত্‌কা বগয়াভ্‌লেন্‌স্কি এর আধঘণ্টা পরে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল শহরমুখো।

কেন ও তার টুপিখান
সাপটে — যেন নিজের জান?

কেননা ওর ওই টুপির মধ্যে ছিল নিচের টেলিগ্রামখানা:

'খার্কভের শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতে দ্জ্রিন্স্কায়াকে। আপনাকে একান্ত অনুরোধ যত শীঘ্র সম্ভব কুরিয়াজ আমাদের হাতে দিন যাতে যথাসময়ে বীজ বোনা সম্ভব হয় খরচের হিসাব পরে পাঠাচ্ছি। কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভা।

মাকারেংকো'

১৮

আগ-বাড়ানো টহল

পরের দিনই টেলিগ্রাম মারফত দ্জ্রিন্স্কায়া আমাকে ডেকে পাঠালেন। সরলবিশ্বাসী কলোনি-বাসিন্দারা মনে করল এই টেলিগ্রামখানার তাৎপর্য অপরিসীম। বলল:

'দেখতেছিস কেমনভাবে কাজ চলতিছে: টরে-টক্কা-টরে-টক্কা - এক টেলিগ্রামের পিছুপিছু আরেক টেলিগ্রাম...'

কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই এরকম তৎপরতার সঙ্গে পেকে উঠল না। শহরগুলির, আশপাশের গাঁয়ের আর ছোটখাট বসতির গৃহস্থদের তরফ থেকে অনবরত এইমর্মে সকাতর অনুরোধ যে দয়া করে এই 'চোরের আস্তানাটা' উঠিয়ে দিন - নিছক এই কথাটা শুনতে-শুনতেই হয়তো সর্বত্র কর্তৃস্থানীয়দের প্রায় সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে কুরিয়াজ কলোনিকে আর সহ্য করা চলে না। তবু কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমন কিছু লোক থেকে গিয়েছিল, যারা সব সত্ত্বেও কলোনিটাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছিল। সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র দ্জ্রিন্স্কায়া আর ইউরিয়েভ ছাড়া আর কেউই আমাদের কলোনিকে কুরিয়াজে বিনা শর্তে স্থানান্তরিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এই প্রস্তাবিত স্থানান্তরণের উপযোগিতা সম্পর্কে সত্যি-সত্যিই দৃঢ়নিশ্চিত বলতে ছিলেন একমাত্র ইউরিয়েভই। দ্জ্রিনস্কায়া এতে রাজি হয়েছিলেন একমাত্র আমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই। একান্তে কথাবার্তার সময় তিনি বললেন:

'তবু সব সত্ত্বেও বড্ড ভয় করছে আমার, আন্তন সেমিওনভিচ! কেন যেন কিছুতেই ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারছি না!..'

ব্রেগেলও আমাদের কলোনি স্থানান্তরণের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তিনি এ-ব্যাপারে যে-সব পূর্বশর্ত আরোপ করছিলেন তা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি চাইছিলেন, স্থানান্তরণের গোটা ব্যাপারটা তত্ত্বাবধান করার জন্যে তিনজনের একটা বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হোক, নতুন যৌথ সংস্থায় গোর্কি কলোনির ঐতিহ্য তাড়াহুড়ো না-করে সময় নিয়ে ক্রমে-ক্রমে চালু করা হোক এবং খারকভ থেকে পঞ্চাশজন কমসমোল-সদস্যকে মাসখানেকের জন্যে কুরিয়াজে পাঠানো হোক আমাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।

ওদিকে শয়তান প্রকৃতির কর্তৃস্থানীয় যে-সব লোক সর্বদা ঘিরে থাকত খালাবুদাকে তাদের কারো-কারো সলাপরামর্শে আমাদের জন্যে বিশ হাজার রুবলের অনুদানের কথাটা তিনি কানেই তুলতে চাইলেন না। বারে বারে খালি একটা কথাই বলতে লাগলেন:

'বিশ হাজার রুব্‌ল দিয়ি তো আমরা নিজিরাই কলোনিডারে চালাতি পারি।'

ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষ থেকেও অপ্রত্যাশিত শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। বিশেষ করে বিষ ঢালতে লাগল খ্‌লিয়ামের নামে খ্যাপাটে কালোচুলো একটি লোক। সে আবার নিজেকে 'জনগণের বন্ধু' বলে খুব জাহির করত। এখনও পর্যন্ত আমি জানি না গোর্কি কলোনি নামটা শুনলেই সে অত উত্তেজিত হয়ে উঠত কেন, তবে দেখতুম যখনই লোকটি গোর্কি কলোনির নাম করত তখনই তার মুখখানা রাগে বিকৃত হয়ে উঠত আর থুথু ফেলে টেবিলের ওপর দড়াম করে ঘুসি মেরে চেঁচিয়ে বলত:

'সর্বত্রই আজকাল বড্ড বেশি সংস্কারকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে! কিন্তু জিজ্ঞেস করি এই মাকারেঙ্কোটি কে? কে একজন মাকারেঙ্কো না কী, তার জন্যে কেন আমাদের আইন ভাঙতে হবে আর শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বলি দিতে হবে? তাছাড়া গোর্কি কলোনি সম্বন্ধেই-বা আমরা কতটুক জানি? কলোনিটা দেখেছেই-বা কে? দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া নাকি দেখেছেন — তা, তাতে হলটা কী? দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া কি সবকিছুই বোঝেন নাকি?'

আমার নিচের এই দাবিগুলোই খ্‌লিয়ামেরকে অত বেশি চটিয়ে দিয়েছিল। দাবিগুলো হল:

১। কোনোরকম আলোচনা না-করে কুরিয়াজের গোটা শিক্ষক ও পরিচালন কর্মীদলকে বরখাস্ত করতে হবে;

২। গোর্কি কলোনিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার মোট সংখ্যা হবে পনেরো (চল্লিশ জনই ছিল প্রচলিত রীতি);

৩। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক বেতন হবে চল্লিশ নয় আশি রুবল; এবং

৪। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন কর্মীদল নির্বাচন করব আমি নিজে, তবে ট্রেড ইউনিয়নের আপত্তি জানানোর অধিকার থাকবে।

এই সামান্য ক'টা দাবি শুনে বিরক্তিতে খুলিয়ামেরের চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। সে বলেছিল:

'এই উদ্ধত চরমপত্রখানা নিয়ে আলোচনা করতে সাহস করে কে সেটা আমি একবার দেখতে চাই! এর প্রতিটি শব্দ হচ্ছে সোভিয়েত আইনের প্রতি মুখ-ভ্যাঙচানো ছাড়া কিছু নয়। লোকটা চায় পনেরো জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, কাজেই বাকি পঁচিশ জনকে আমাদের বিসর্জন দিতে হবে। লোকটা তার মাস্টারদের ক্রীতদাস কয়েদির মতো খাটাতে চায়, কাজেই চল্লিশ জন তো তার পথের কাঁটা হবেই...'

খুলিয়ামেরের মতলবখানা যে ঠিক কী, কী যে তার উদ্দেশ্য তা ধরতে না-পারায় আমি তার সঙ্গে কোনোদিন তর্কে প্রবৃত্ত হই নি।

মোটের ওপর এই সব আলোচনা আর তর্কবিতর্ক থেকে বাইরে থাকতেই চেষ্টা করছিলুম আমি, কারণ মনে-মনে নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিজেই আমি নিশ্চিত হতে পারছিলুম না। তাই কারও কাছে ব্যাপারটা অযৌক্তিক ঠেকলে তাকে যে তৎসত্ত্বেও ঝুঁকি নিতে বাধ্য করব, এমনটা ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, পেশ করার মতো আমার একটিই যুক্তি ছিল — তা হল আমার গোর্কি কলোনি। কিন্তু মুশকিল এই যে বেশি লোক সে-কলোনিতে যায় নি আর আমার নিজের পক্ষেও তা নিয়ে কথা বলা ভালো দেখাত না।

কলোনি স্থানান্তরণের প্রশ্নটি নিয়ে এত বেশি ব্যক্তি, ব্যক্তিগত আবেগ আর ব্যক্তিক সম্পর্ক জড়িত হয়ে পড়েছিল যে খুব শিগগিরই আমি খেই হারিয়ে ফেললুম। খারকভে আমি যে কখনও একসঙ্গে একদিনের বেশি থাকতুম

না এবং কখনও সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে উঠতে পারতুম না — এই ব্যাপারটার ফলে সবকিছুর মীমাংসা করা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে একটা ব্যাপারে আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে প্রতিপক্ষদের আন্তরিকতায় কেন যেন আমার বিশ্বাস ছিল না, আর এটা সন্দেহ না-করে পারছিলুম না যে তাদের জাঁক-দেখানো যুক্তিতর্কের আড়ালে সম্পূর্ণ অন্য সব মতলব লুকনো ছিল।

শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতে কেবলমাত্র একটি লোকের মধ্যেই আমি সত্যিকার, আবেগপূর্ণ, মানবিক প্রত্যয়ের দেখা পেয়েছিলুম আর খোলাখুলি তার তারিফও করতুম আমি। এই ব্যক্তিটি ছিলেন একজন মহিলা। অবশ্য পোশাক দিয়ে বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হোত, কারণ অন্য সব দিক থেকে বিচার করলে মহিলাটি স্ত্রীলোক না পুরুষ তা বোঝার উপায় ছিল না। তাঁর চেহারাটি ছিল ছোটখাট, মুখখানা ঘোড়ার মতো, বুক ছিল অপুষ্ট চ্যাপটা আর পা দুটো প্রকাণ্ড আর জেবড়াজোবড়া। সব সময়েই দেখা যেত লালচে হাত দুখানা তিনি হয় নাড়ছেন নয়তো দোলাচ্ছেন — হয় কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গি করে আর নয় তো তাঁর মোটা-মোটা, সোজা-সোজা, শণের রঙের চুলগুলো ঠিক করার জন্যে। সকলেই তাঁকে ডাকত কমরেড জোইয়া বলে। ব্রেগেলের অফিসে তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল কিছুটা।

দেখামাত্রই কমরেড জোইয়ার আমাকে অপছন্দ হয়ে গেল। আর তিনি সেটা লুকোবার চেষ্টাও করলেন না, আমার প্রতি অত্যন্ত জোরালো উগ্র শব্দ প্রয়োগ করতেও আপত্তি হল না তাঁর। বললেন:

'আপনি শিক্ষা-বিজ্ঞানী নন মাকারেঙ্কো, ফৌজী ড্রিল-মাস্টার আপনি! শুনেছি আপনি নাকি একজন প্রাক্তন কর্নেল, তা দেখেশুনে মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়। আপনাকে নিয়ে এখানকার লোকজন কেন যে এত হৈ-চৈ করে আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না! আমি হলে তো আপনাকে বাচ্চাদের ধারেকাছে ঘেঁষতেই দিতুম না।'

কমরেড জোইয়ার কাচস্বচ্ছ আন্তরিকতা আর সহজবোধ্য আবেগ ভালো লেগে গেল আমার। তাঁর কথার জবাবে আমিও মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করলুম না। বললুম:

'কমরেড জোইয়া, যতই দেখছি ততই বেশি-বেশি আপনাকে তারিফ

করতে ইচ্ছে যাচ্ছে আমার। কেবল একটা কথা। আমি কিন্তু কোনোদিনই কর্নেল ছিলুম না।'

কলোনি স্থানান্তরণের পরিণতিতে যে বিপর্যয় ঘটবে, এ-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন কমরেড জোইয়া। ব্রেগেলের টেবিলে ঘুসি মেরে প্রায় গর্জন করে বলে উঠলেন তিনি:

'তোমরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে! তোমাদের সবার ওপর কী যে জাদুমন্ত্র ছড়িয়েছে এই...' বলেই আমার দিকে তাকালেন তিনি।

গম্ভীরভাবে, যেন কথা যুগিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে, আমি বললুম, '...কর্নেল।'

'হ্যাঁ, কর্নেল!.. এর শেষ পরিণতি যে কোথায় দাঁড়াবে তা আমি বলতে পারি -- তা হল বড় রকমের একটা খুনখারাপিতে! উনি ওঁর এক শো বিশজন চেলাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরই একটা খুনখারাপির কাণ্ড ঘটবে! এ-সম্বন্ধে আপনার কী বলার আছে, কমরেড মাকারেঙ্কো?'

'আপনার যুক্তিজাল আমাকে অভিভূত করছে। কিন্তু আমি জানতে চাই, কারা কাদের সদলবলে খুন করবে বলে আপনি মনে করেন?'

ব্রেগেল আমাদের ঝগড়া থামানোর প্রয়াস পেলেন। বললেন:

'জোইয়া, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! ছি-ছি, খুনখারাপি হতে যাবে কেন?.. আর আপনি, আন্তন সেমিওনভিচ, যে-কোনো ব্যাপারেই আপনার ঠাট্টা-ইয়ার্কির শেষ নেই।'

আমাদের এইসব ঝগড়াঝাঁটি আর তর্কবিতর্কের খবর সর্বোচ্চ পার্টি-মহলেও পৌঁছতে শুরু করেছিল। আমি এতে খুশিই হচ্ছিলুম। এমন কি এ-খবর শুনেও আমি খুশি হচ্ছিলুম যে কুরিয়াজে ইতিমধ্যে পচন নাকি আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল, ভয়াবহ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল জায়গাটা, এবং সে-সম্পর্কে বড় রকমের একটা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের জরুরি দরকার হয়ে পড়েছিল। কুরিয়াজ নিজেই এ-সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ দিচ্ছিল যেন, যদিও ওখানকার শিক্ষকরা সোরগোল তুলে বলছিল যে আমাদের কলোনি ওদের ওখানে স্থানান্তরণ নিয়ে এই সব কথাবার্তার ফলে কুরিয়াজের কলোনি-বাসিন্দাদের মনোবল নাকি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

আবার ওই একই শিক্ষকরা (কথাটা খুব গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়ে) লোককে বলে বেড়াচ্ছিল যে কুরিয়াজওয়ালারা নাকি গোর্কিওয়ালাদের আসার

অপেক্ষায় ছুরি শানিয়ে বসে আছে। শুনে রাগের চোটে মুখে গাঁজলা তুলে কমরেড জোইয়া আমাকে বলতে লাগলেন:

'দেখছেন তো! দেখছেন তো!'

বললুম, 'দেখছি বৈকি। তাহলে এতক্ষণে জানা গেল — ওরাই আমাদের গলায় কোপ দিতে চাইছে, আমরা নয়।'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে জানা গেল... খেয়াল রেখো ভার্‌ভারা! সবকিছুর জন্যে তুমিই কিন্তু শেষপর্যন্ত দায়ী হবে! এরকম কথা জীবনে কখনও শুনেছ? একদল অনাথ ছেলেকে আরেক দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা?'

অবশেষে উচ্চতর এক সংগঠনের অফিসে ডেকে পাঠানো হল আমায়। পরিষ্কার-কামানো এক ব্যক্তি আমায় দেখে কাগজপত্র থেকে মাথা তুললেন। বললেন:

'বসুন, কমরেড মাকারেঙ্কো।'

দেখলুম, দ্‌জুরিন্‌স্কায়া ও খ্‌লিয়ামেরও সেখানে উপস্থিত।

বসলুম।

'আপনি আর আপনার রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েরা যে কুরিয়াজের পচন বন্ধ করতে পারবেনই সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিত কী?' পরিষ্কার-কামানো মানুষটি শান্তভাবে শুধোলেন।

প্রশ্নকর্তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসে উত্থাপন করা একটা প্রশ্নের জবাবে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমার মুখখানা তখন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তবু জবাব দিলুম:

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।'

পরিষ্কার-কামানো লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর বললেন:

'এবার আপনাকে একটা বিশুদ্ধ টেক্‌নিক্যাল প্রশ্ন করার আছে — কমরেড খ্‌লিয়ামের, মনে রাখবেন এটা নীতির প্রশ্ন নয়, নিছক টেক্‌নিক্যাল প্রশ্ন — আচ্ছা, যত সংক্ষেপে সম্ভব বলুন দেখি, কেন আপনি মাত্র পনেরো জন শিক্ষক-শিক্ষিকা চান, চল্লিশ জন নয়, আর তাঁদের চল্লিশ রুব্‌ল করে মাস-মাইনে দেয়াতেই-বা আপনার আপত্তি কিসের?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জবাব দিলুম:

'ঠিক আছে, আপনি যখন চান তখন যত সংক্ষেপে সম্ভব আমি বলছি।

চল্লিশ-রুবল মাস-মাইনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেবল যে ঘরছাড়া বাচ্চাদের একটা যৌথের মনোবল নষ্ট করে দিতে সমর্থ তা-ই নয়, দুনিয়ার যে-কোনো যৌথ সংস্থার মনোবলই ভেঙে দিতে পারে তারা।'

পরিষ্কার-কামানো লোকটি আমার কথা শুনে হাসতে-হাসতে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর খুলিয়ামেরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দম-আটকানো গলায় বললেন:

'এমন কি খুলিয়ামেরের মতো লোকজনকে নিয়ে তৈরি যৌথ সংস্থারও?'

গম্ভীরভাবে বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

মনে হল দমকা হাওয়ায় যেন তাঁর আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের মুখোশখানা উড়ে গেল। লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌নার দিকে হাতখানা ছড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন তিনি:

'কী? ঠিক এই কথাই বলি নি আপনাকে যে 'ওজনে যত ভারি হবে, মূল্যে ততই কমবে'?'

হঠাৎ পরিশ্রান্তভাবে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তারপর ফের সরকারি কর্মকর্তার সেই নির্বিকার ভঙ্গিটি মুখে ফিরিয়ে এনে দ্‌জুরিন্‌স্কায়াকে বললেন:

'কলোনিটা ওঁকে নিতে দিন! কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন!'

উঠতে-উঠতে আমি বললুম, 'কিন্তু... বিশ হাজার?'

'তাও পাবেন। কিন্তু টাকাটা কি একটু বেশি চাইছেন না?'

'না, বেশি নয়!'

'ঠিক আছে। বিদায়! আপনারা চলে যান ওখানে, তবে মনে রাখবেন — কলোনিটাকে পুরোপুরি সফল করে তুলতেই হবে।'

গোর্কি কলোনিতে ইতিমধ্যে উদ্দীপ্ত সংকল্পের প্রথম ধাক্কাটা ক্রমশ পরিণত হয়েছিল ধীরেসুস্থে ফৌজী কায়দায় যাত্রার প্রস্তুতিতে। এই সময়ে লাপতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কলোনির সত্যিকার শাসক, আর বিশেষ-বিশেষ সংকট-মুহূর্তে তাকে সাহায্য করার জন্যে পাশে-পাশে থাকছিল কভাল। তবে এ-সময়ে কলোনিকে চালানো কঠিন ছিল না। এর আগে কলোনিতে আর কখনও মৈত্রীপূর্ণ সংহতির অমন একটা আবহাওয়া, যৌথ দায়িত্ববোধের অমন একটা গভীর চেতনা গড়ে ওঠে নি। সামান্যতম আইনভঙ্গের ব্যাপার ঘটলেও তখন

ভারি অবাক হোত সবাই আর শাসনের ছলে কেউ-না-কেউ ছোট্ট, তাৎপর্যপূর্ণ এই কথা ক'টি বলত:

'আর তুই কিনা কুরিয়াজ যেতি চাস!'

আমাদের সামনেকার সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কলোনিতে কারও মনেই আর কোনোরকম সন্দেহপোষণের অবকাশ ছিল না। কলোনি-বাসিন্দারা যতটা না সচেতনভাবে বুঝছিল তার চেয়ে বেশি করে তারা অনুভব করছিল যৌথ সংস্থার প্রয়োজনের কাছে তাদের অন্যান্য সবকিছুকে দাবিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তাটা। অথচ এজন্যে তাদের মনে যে 'ত্যাগস্বীকার করছি' এই অহংভাব জেগে উঠছিল তা-ও নয়। পরস্পর-নির্ভরতার এই অনুভব, মানবিক সম্পর্কের শক্তি ও নমনীয়তা সম্পর্কে, যৌথ জীবনের নিজের শক্তির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আবহাওয়ায় সেই জীবনের শান্ত, বিশাল, পরিব্যাপ্ত শক্তি সম্পর্কে শিহরিত এই বোধটুকু — এই-ই তো আনন্দ, সম্ভবত দুনিয়ার কাছে আমাদের পাওনা গভীরতম আনন্দই এটা। এই সবই সেদিন ঠাহর করা যাচ্ছিল কলোনি-বাসিন্দাদের চোখের চাউনিতে, তাদের চলাফেরায়, তাদের কথাবার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে, কাজকর্মে। সকলেই তাকিয়ে ছিল সেদিন উত্তরের দিকে -- যেখানে দারিদ্র্য, নৈরাজ্য আর অবোধ একগুঁয়েমির বশে জটলা পাকিয়ে ছিল অজস্র একপাল ছেলে আর চওড়া পাঁচিলের ওধারে হিংস্রভাবে দাঁত খিঁচিয়ে ওত পেতে ছিল আমাদের আসার অপেক্ষায়।

সেদিন আমি ঠাহর করে দেখেছিলুম, কলোনি-বাসিন্দাদের ভাবেভঙ্গিতে অহঙ্কারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। বরং প্রত্যেকের মনের কন্দরে কোথায় যেন দানা বেঁধে ছিল একটা গোপন ভয় আর অনিশ্চয়তার বোধ। শত্রুকে তখনও পর্যন্ত কেউ চোখে দেখে নি বলে সম্ভবত এই বোধটা কিছুটা স্বাভাবিকই ছিল।

শহর থেকে প্রতিবার আমার ফেরার সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত সবাই। কলোনি-বাসিন্দারা চৌকি বসিয়ে রাখত রাস্তায় আর গাছের মাথায়, এমন কি নজর রাখত বাড়িগুলোর ছাদের ওপর থেকেও। যেই আমি গাড়িতে চেপে কলোনির উঠোনে ঢুকতুম অমনি আমার অনুমতির অপেক্ষা না-রেখেই বিউগ্‌ল-বাদক সাধারণ সভার সংকেতসূচক বাজনা বাজিয়ে দিত। ঝামেলা না-বাড়িয়ে সুড়সুড় করে মিটিঙে যেতুম আমি। যেন আমি জন-অভিনেতা এইভাবে হাততালি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো ওই

সময়ে রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই হর্ষধ্বনি অবশ্যই আমার প্রতি ততটা উদ্দিষ্ট ছিল না যতটা ছিল আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্যের প্রতি।

অবশেষে মে মাসের গোড়ার দিকে সই-করা একখানা চুক্তিপত্র হাতে নিয়ে এইরকম একটা সাধারণ সভায় এসে ঢুকলুম আমি।

ওই চুক্তিতে এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের এক বিশেষ নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল যে মাক্সিম গোর্কি কলোনিকে তার সমস্ত সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন কর্মীবৃন্দ, অস্থাবর সম্পত্তি, গবাদি পশু ও সঞ্চয়ভাণ্ডারসহ কুরিয়াজে স্থানান্তরিত করা হল; কুরিয়াজ কলোনিকে বন্ধ করে দেয়া হল বলে ঘোষণা করা হল; ওই কলোনির দু-শো আশিজন কলোনি-বাসিন্দা ও কলোনির সকল সম্পত্তি গোর্কি কলোনির হেফাজতে ও তার তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া হল; গোর্কি কলোনির ডিরেক্টর কুরিয়াজের পরিচালন-ভার স্বহস্তে নেয়ার মুহূর্তটি থেকে কয়েক জন কর্মীকে বাদ দিয়ে কুরিয়াজ কলোনির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন কর্মীদের গোটা দলটিকে বরখাস্ত করা হল বলে ঘোষণা করা হল।

কুরিয়াজের পরিচালন-ভার আমাকে নিতে বলা হল মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকে। আর বলা হল পনেরোই মে'র মধ্যে কলোনি স্থানান্তরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে।

চুক্তিপত্র আর নির্দেশনামা পড়ে শোনানোর পর গোর্কিপন্থীরা এবার কিন্তু 'হুররে' বলে চেঁচিয়ে উঠল না, কাউকে শূন্যে ছুড়ে লোফালুফিও করল না এবার। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে খালি লাপত বললে:

'গোর্কিরে আমাদের এই ব্যাপারটা লিখে জানানো হোক। আর ছেলেরা মনে রাখিস কিন্তু -- নাকী কান্না চলবে না!'

'ঠিক হ্যয় -- নাকী কান্না চলব্যে না!' রিনরিনে গলায় সাড়া দিল পুঁচকে একটা বাচ্চা।

আর কালিনা ইভানভিচ বিদায়সূচক হাত নাড়ল। বলল:

'আউগ্গাইয়া যাও, পোলাপানেরা, ডরাইও না!'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

‘প্রগতি’ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

দ্‌মিত্রি ফুরমানভ ॥ চাপায়েভ। উপন্যাস।

‘চাপায়েভ’ উপন্যাসটি লিখেছেন সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত লেখক দ্‌মিত্রি ফুরমানভ (১৮৯১-১৯২৬)।

উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে গৃহযুদ্ধ ও তার অন্যতম সুবিখ্যাত গণ-সেনাপতি ভাসিলি চাপায়েভের বিষয়ে। গৃহযুদ্ধের শরিক ও লাল ফৌজের কমিশনার দ্‌মিত্রি ফুরমানভ লড়েছেন চাপায়েভের সঙ্গে, ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বইটির ভিত্তিতে রয়েছে বাস্তব ঘটনাবলি।

‘চাপায়েভ’ অনূদিত হয়েছে বহু বিদেশী ভাষায়। উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি চলচ্চিত্র সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্বের অনেকগুলি দেশে।

'প্রগতি' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

আমোসভ ন.॥ অন্বিষ্ট হৃদয়

অপচিত হৃৎপিণ্ড। উপন্যাস।

নিকোলাই আমোসভ — প্রখ্যাত সোভিয়েত শৈলচিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রতিভাধর গবেষক ও সমাজকর্মী। এই বইয়ের পাঠকের কাছে তিনি একজন প্রতিভাধর লেখকও।

আমোসভের বইটিতে আছে হৃদয় অপারেশনের কথা, বিভিন্ন লোকের ভাগ্যের কথা। লেখক এখানে বর্ণিত ঘটনাবলির নীরব দর্শক নন, তিনি নিজেই তাতে অংশগ্রহণ করছেন। বিশেষ করে এই জন্যেই বইটি পাঠকের মনে নাড়া দেয়। যেসব বিষয় নিয়ে লেখকের চিন্তাভাবনা তা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশের পথ এবং বিশ্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুনতম সাফল্যগুলিকে আধুনিক চিকিৎসায় প্রয়োগ।

বইটির অঙ্গসজ্জা রঙচঙে।

'প্রগতি' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

গোর্কি ম. ॥ পৃথিবীর পাঠশালায়। উপন্যাস।

'আজ আমাকে বলা হয়েছে সুখী লোক। সত্যিই তাই, আপনাদের সামনে সত্যিকারের সুখী লোক, যার জীবনে সফল হয়েছে তার সমস্ত সেরা স্বপ্ন, সেরা আশা।' এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত লেখক হয়তো স্মরণ করেছিলেন তাঁর জীবনের সেই সময়টি, যখন তিনি ১৮৮৪ সালে ষোলো বছর বয়সে পায়ে হেঁটে আসেন ভলগা অঞ্চলের বৃহৎ নগর কাজানে, – ইচ্ছে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন। কিন্তু এখানে তাঁর ভাগ্যে জোটে মিস্ত্রির সাকরেদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, শহরের বস্তিবাসী কাঙালের জীবন। জীবনের এই 'পাঠশালায়' তিনি পোক্ত হয়ে ওঠেন যতকিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামীর সংকল্পে, নিজের আর চারপাশের লোকেদের 'জীবনকে ঢেলে সাজার' একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসে।

মহান লেখকের আত্মজীবনীমূলক ত্রয়ীর শেষ খণ্ড 'পৃথিবীর পাঠশালায়' আছে তাঁর জীবনের এই পর্যায়ের কথা।